১৯৫০ : রক্তরঞ্জিত ঢাকা বরিশাল এবং

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

১৯৫০ : রক্তরঞ্জিত ঢাকা বরিশাল
এবং.....

১৯৫০ : রক্তরঞ্জিত ঢাকা বরিশাল এবং.....

সম্পাদনা
ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ

কোডেক্স
৮এ ট্যামার লেন, কলকাতা

উৎসর্গ

বাংলা ভাগের উত্তর ও পরবর্তী গণহত্যার
শিকার অগণিত নিরপরাধ হিন্দু নরনারী,
শিশুর অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশে—

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

১. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

২. পূর্ববঙ্গের কবিগান।

৩. পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা।

৪. প্রসঙ্গ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ (গ্রিফীথ মেমোরিয়াল প্রাইজ প্রাপ্ত)

৬. কবিয়াল : কবিগান।

৭. পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবিসঙ্গীত।

৮. নকুলেশ্বর গীতিমাল্য (সম্পাদনা)।

৯. রবীন্দ্রনাথ—শ্যামাপ্রসাদ পত্রালাপ : প্রসঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. শ্যামাপ্রসাদ : বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ।

১১. বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ।

১২. 1946 : The Great Calcutta Killing and Noakhali Genocide
– Ashoke Dasgupta & Dinesh Chandra Sinha

সূচিপত্র

ভূমিকা

(এক)

কবি বলেছেন, "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনপ্রাণ।" নগর রাজধানী লোপ পায়। অনেক জনগোষ্ঠী, ভাষাগোষ্ঠী এমন কি ধর্মগোষ্ঠীও ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণায় তার কিছু কিছু তথ্য শিক্ষিত সমাজের গোচরে আসে।

তবে সেসব প্রায়ই প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের কাহিনী। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে আমাদের চোখের সামনে, নাকের ডগায়, বলতে গেলে দোরগোড়ায় যে একটা ধর্মগোষ্ঠীকে পরিকল্পিত উপায়ে নিশ্চিহ্ন করার কাজ চলেছে গত ৬৫ বছর ধরে, আমরা তার কোনও খোঁজ রাখি কি? অথচ তারা আমাদেরেই ভাই-বোন, আমাদের কারো না কারো সঙ্গে তাদের রক্ত সম্পর্ক।

গান্ধীর "আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে দেশভাগ হবে" আর "জিন্নার আমি পোকা-কাটা পাকিস্তান চাইনা" ইত্যাদি বড় বুলিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীর মৃতদেহের উপর দিয়ে দেশভাগ হয়ে গেল, আর জিন্নাকেও পোকাকাটা পাকিস্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এবং এক বছরেরে মধ্যেই একজন পরলোকে গেলেন, আরেকজন এন্তেকাল করলেন। অনেকে দেশভাগের বিরোধিতা না করার জন্য গান্ধীকে দোষারোপ করে থাকে। দেশভাগ রুখতে তিনি কেন অনশন করলেন না বলে অনুযোগ করে। কিন্তু ১৯৪৬ এর ১৬ আগষ্ট কলকাতার বুকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বীভৎস রূপ দেখে, ১০ অক্টোবর থেকে নোয়াখালির হিন্দু মা-বোনের উপর পাশবিক অত্যাচারের ও বিহারের তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করে এবং সর্বশেষে পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখদের উপর মুসলিম গুণ্ডাদের পশুত্বকেও হারমানানো পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ শুনে গান্ধীজীর অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন টুটে গেছে।

আর জিন্না তো ভারতের দুই প্রান্তে দুটি বৃহৎ পাকিস্থান পেতে যাচ্ছিলেন মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনার দৌলতে। অখণ্ড ভারতের নামে দেশকে ক-খ-গ তিন ভাগে বিভক্ত করে দুই-ভাগ জিন্নাকে দেবার সুপারিশ ছিল। মুসলিম অধ্যুষিত ঐ দুই খণ্ডে হিন্দু-শিখদের জানমালের কোনও নিরাপত্তা ছিলনা। কারণ, আইন শৃঙ্খলার ভার ছিল প্রদেশগুলির হাতে। হিন্দু ও শিখদের বিপদের কালে ঠুঁটো কেন্দ্রিয় সরকারের কিছুই করণীয় ছিলনা। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকা কালেই হিন্দুদের উপর যে নারকীয় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, ব্রিটিশ শাসন অবসানে মুসলিম শাসনে সেসব প্রদেশের হিন্দুদের যে কি শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হবে, তার ভয়াবহ রূপ হিন্দু-শিখদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। হিন্দু-শিখ নেতাদের বৃহদংশ দেশভাগের দাবীতে সোচ্চার হল। যে ভিত্তিতে জিন্না দেশভাগ চাইছে, সেই ভিত্তিতে প্রদেশও ভাগ করতে হবে বলে তারা অটল পণ করে বসল। ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের এই দাবী অগ্রাহ্য করার কোনও যুক্তি খুঁজে পায়নি; জিন্নাও দিতে পারেনি। তাকে পোকাকাটা পাকিস্থান নিতেই হল।

অবশ্য পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো তাতে জিন্নার কোন লোকসান নেই। দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রবক্তা মুসলিম লীগ তথা জিন্না বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কোনও সংগ্রাম করল না;

লাঠি গুলি খেলনা; জেল জরিমানা ফাঁসী দ্বীপান্তরে গেল হিন্দুরা, আর বিনা যুদ্ধে মুসলমানরা একটি বিশাল রাজত্ব (এখন দু'টি) পেয়ে গেল।

কিন্তু পাকিস্তান পেয়েও মুসলিম লীগের রক্ত পিপসা মিটল না। ক্ষমতা হাতে পাওয়ার দিন থেকেই তারা পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু-শিখদের ধনসম্পত্তি ও নারীদের উপর যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল—যার তুলনা সভ্য জগতের ইতিহাস নেই। সে বর্বরতার কণামাত্র বিররণ মেলে ব্রিটিশ রাজপুরুষ লিওনার্ড মোজলের (Leonard Mosley) লিখিত 'The Last Days of the British Raj' (ব্রিটিশ শাসনের শেষ কয়েকদিন) নামক গ্রন্থে। "তাতে দেখতে পাই যে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকে নয় মাসের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ হিন্দু, শিখ ও মুসলমানকে দেশত্যাগ করতে এবং তাদের মধ্যে ছয় লক্ষ লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, মহিলাদের সতীত্ব নাশ করা হয়েছে, শিশুদের পা ধরে দেওয়ালে আছড়িয়ে মাথা ভেঙ্গে মেরেছে; শিশুরা বালিকা হলে তাদের উপরও বলাৎকার করে তাদের স্তন কেটে দেওয়া হয়েছে এবং গর্ভবর্তী স্ত্রীলোক হলে তাদের পেট চিরে দেওয়া হয়েছে। সেদিনের হত্যাকারী ঐ নরপশুদের বীভৎসতার কাছে পশুত্বও বোধ হয় ম্লান হয়ে গিয়েছিল।"

(পাক-ভারতের রূপরেখা - প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী)

পশ্চিম পাকিস্তানে হতাবশিষ্ট হিন্দু-শিখদের ঝাড়েবংশে বিতাড়িত করে এবার পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কুনজর পড়ল পূর্ববঙ্গ/পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তির উপর। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাঙালী হিন্দুর জীবনে এই স্বাধীনতা এসেছিল অভিশপ্ত রূপ নিয়ে। বাঙালী বড় বেশি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার জন্য। জেল জরিমানা দ্বীপান্তর, লাঠিগুলি ফাঁসি—কিছুকেই বাঙালী তোয়াক্কা করেনি। "হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী"—এই আনন্দেই মশগুল ছিল। দেশবাসীর হাততালি কুড়িয়েছিল। কিন্তু এই হাসি যে অচিরেই কান্নায় পর্যবসিত হবে সে খেয়াল ছিল না। স্বাধীনতা এলো বটে, কিন্তু তার বীভৎস রূপে বাঙালীর মুখের হাসি মুছে গেল চিরতরে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে জল প্লাবন ঘটে ফি বছর; কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে যে হিন্দুদের রক্ত-প্লাবনে অশ্রু-প্লাবনে দেশ প্লাবিত হবে, তা কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল।

কিন্তু কার্যত তা-ই ঘটেছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট—বাঙালী জীবনে যে স্বেদ অশ্রু ও রক্তপাতের শুরু, ঠিক ৩৬৫ দিন পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ করে এবং প্রায় দেড়কোটি বাঙালীকে ঘাতকের হাতে সঁপে দিয়ে তার সাময়িক বিরতি ঘটে। ১৯৪৫ সালে বিশ্ব-উদ্বাস্তু ইহুদী জাতি নিজের বাসভূমি ফিরে পেল, আর তার এক বছরের মধ্যেই বিশ্বে বৃহত্তম এক নতুন ইহুদী জাতির সৃষ্টি হল—তারা পূর্ববঙ্গ/পূর্বপাকিস্তানের বাঙালী হিন্দু। তারা পাকিস্তানে নিক্ষিপ্ত হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় দিন গুনতে লাগল।

বেশিদিন তাদের অপেক্ষা করতে হয়নি। আড়াই বছর না যেতেই তাদের সাতপুরুষের ভিটা মাটি থেকে উচ্ছেদের পাকাপাকি ব্যবস্থা হল। পূর্ব-পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশে) ১৯৫২সালে ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে গাওয়া হয় "আমার ভাইয়ের রক্তে

রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি।" কিন্তু তার দু'বছর আগে ১৯৫০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা ও বরিশাল সমেত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে যে হাজার হাজার নিরপরাধ হিন্দু নরনারী মুসলমান ঘাতকের ছোরা, হেঁসো, দা-কাটারি, বল্লম, ল্যাজা-টেঁটা, কোচের আঘাতে প্রাণ হারাল, তাদের কথা কিন্তু হিন্দুরা বেমালুম ভুলে গিয়ে ঐক্য সংহতি সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার জয়ঢাক বাজাচ্ছে। ভুলেও তারা স্মরণ করছে না— "আমার ভাইদের রক্তে রাঙানো দশ-ই ফেব্রুয়ারি, আমরা কি ভুলিতে পারি?

প্রগতিশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহনশীলতার দোহাই পেড়ে বাংলার সাহিত্যিককুল বাঙালী হিন্দুর এই জাতীয় বিপর্যয়কে প্রায় এড়িয়েই গেছে। উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা নিয়ে গল্প উপন্যাস নাটক সিনেমায় কিছু আহা, উ-হু করলেও, কেন উদ্বাস্তু হতে হল, সে বিষয়ে একেবারে নির্বাক। বরং দাঙ্গার জন্য মুসলমানদের দারিদ্র্যকেই তারা দায়ী করে মুসলমানদের পক্ষে সাফাই গায়, সওয়াল করে। অর্থাৎ যেহেতু মুসলমানরা গরীব, তাই ধনী হিন্দু প্রতিবেশীকে খুন করা, তার স্ত্রীর ইজ্জত নষ্ট করা, কন্যাকে ধর্ষণ ও অপহরণ করা, বাড়িঘর পোড়ান, বিষয়সম্পত্তি লুঠ করা এবং গোস্ত খাইয়ে ইসলাম ধর্মান্তরিত করার হক আছে মুসলমানদের!

কিন্তু দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ বিধান সভার কয়েকজন হিন্দুসদস্য, ঢাকায় অবস্থানরত সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ্‌দের স্মৃতিকথায় সেসব বীভৎস ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে। তার কিছুকিছু সংকলন করে এই গ্রন্থভুক্ত করা হল, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অজ্ঞতা দূরীকরণ ও মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তার আগাম সতর্কতা হিসাবে।

পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানাগত সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ নামাবলীধারী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ কেউ 'আপিলা চাপিলা' বা 'বাঙালনামা' লিখেছেন, কেউবা 'বিষাদবৃক্ষ' রচনা করেছেন; কিন্তু তাদের স্বজাতি স্বধর্মাবলম্বীরা যে এমন সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল, সে সম্পর্কে দু'লাইন লিখতে বিধাতা বোধ হয় তাদের কলমে কালি দেন নি!

(দুই)

জিন্না-গান্ধী-দেশভাগ ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু

মূল প্রসঙ্গ প্রবেশের পূর্বে আরো একটু উপক্রমণিকার প্রয়োজন আছে।

ভারতভাগের খলনায়ক মিঃ জিন্নার রাজনৈতিক চরিত্রের পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে সম্প্রতি দুজন বিজেপি নেতা দলকে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলেছিলেন। সেটা ঘটাই স্বাভাবিক। কোটি কোটি নিরপরাধ নরনারীর সুখ শান্তিময় জীবনে যিনি চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছেন, তার সপক্ষে সাফাই গাইলে ধর্ষিতা, অপহৃতা ও নিহতদের প্রেতাত্মা তাদের ক্ষমা করবে না। তবে সে সম্পর্কীয় আলোচনা সার্বিক ও তথ্যভিত্তিক হওয়া চাই। এখান থেকে ওখান থেকে কিছু শব্দ ও বাক্য সংগ্রহ ও সংযোজন করে জিন্নাকে মহাত্মা বানাবার অপচেষ্টা অবশ্যই নিন্দনীয়। বিশেষত তেষট্টি বছর পূর্বে দেশ ভাগ করে যারা মুসলিম সমস্যা চিরতরে

মিটিয়ে ফেলেছেন বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, সেই দল ও তার নেতাদের উত্তরসূরীরা যখন নির্বাচন জেতার ও গদী কায়েম রাখার তাগিদে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে খুঁচিয়ে তুলে ভাঙা দেশকে পুনরায় ভাঙনের মুখে এনে দাঁড় করেছেন, তখন দেশবিভাগকালীন রাজনীতি ও রাজনীতিকদের কীর্তিকলাপ অবশ্যই পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে।

মিঃ জিন্নার রাজনৈতিক জীবন মূলত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। যেমন—

১। শুরু থেকে অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলন পূর্ববর্তীকাল।

২। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে নেহরু রিপোর্ট ও ১৪ দফাকাল।

৩। রাজনীতি থেকে সরে বিলাত গিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদে ট্রেনিংকাল।

৪। বিলাত থেকে ফিরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আকণ্ঠ মগ্ন থেকে ভারতবর্ষকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিকাল।

৫। জাতীয়তাবাদী জিন্নায় প্রত্যাবর্তন প্রচেষ্টা কাল।

ভারতবর্ষের বুকে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক বিভেদের বীজবপন করে গিয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ। সেই বিষবৃক্ষে ফল ফলল ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বুকে মুসলিম লিগ দল প্রতিষ্ঠার মধ্যে। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুতে তার শূন্যস্থান পূরণ করেন আগা খাঁ। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদে তার অবদান সৈয়দ আহমদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়, বরং বেশিই বলা যায়। তার নেতৃত্বেই মুসলমান নেতারা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী নিয়ে লর্ড মিন্টোর কাছে দরবার করে সাফল্য লাভ করেন। জিন্না এই প্রতিনিধি দলে সামিল হননি এবং পৃথক নির্বাচন প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মুসলমানদের ক্ষতি করবে। তাতে গোঁসা করে আগা খাঁ লিখেছেন—

"A distinguished Muslim Barrister in Bomboy with a large and prosperous practice : Mr. Mohammed Ali Jinnah... We had always been on friendly terms, but at this juncture he came out in bitter hostility towards (us)"

অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০-৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লিগের যে প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়, জিন্না তার ছায়া মাড়াননি। তাই আগা খাঁর মন্তব্য—"আমাদের কঠোরতম বিরোধী" ছিলেন জিন্না—যিনি আমি এবং আমার বন্ধুরা যা কিছু করেছি এবং করার চেষ্টা করছিলাম, তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল। ... তিনি বলেছিলেন যে আমাদের পৃথক নির্বাচন প্রথার নীতি জাতিকে খণ্ডবিখণ্ড করছিল।" তিনি মনে করেছিলেন পৃথক নির্বাচন প্রথা কার্যকর হলে ভারত খণ্ডিত হবার পথ খুলে যাবে। তিনি বলেছেন— "আমি হলাম স্বদেশভক্ত জাতীয়তাবাদী প্রথম, স্বদেশভক্ত জাতীয়তাবাদী দ্বিতীয় এবং সর্বশেষে স্বদেশভক্ত জাতীয়তাবাদী।"

গান্ধীজির ভারতে আগমন ও কংগ্রেসের হাল ধরার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণির জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও মতাদর্শগত ঐক্য ও সংহতি ছিল। কিন্তু গান্ধীজির প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচি অর্থাৎ অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে তিনি মোটেই একমত হতে পারেননি। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জড়াবার তিনি ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। যুক্তিবাদকে পরিহার করে ব্যক্তিপূজায়ও ছিল তাঁর ভীষণ অনীহা। কিন্তু গান্ধীজির রাজনীতিতে এই দুটি অশুভ লক্ষণ দেখা গেল প্রবলভাবে। এর

ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে বেশি কথা বলার দরকার নেই। জিন্নার চৌদ্দ দফা ও নেহরু রিপোর্ট এর মধ্যে কোনো সমঝোতা না হওয়ায় আশাহত জিন্না ভারত ছেড়ে বিলাতে পাড়ি দিলেন।

বিলাতে গিয়ে জিন্নার আইন ব্যবসা যেমন ফুলে ফেঁপে উঠল, তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনাগ্রহও ক্রমে ক্রমে আগ্রহে পরিণত হতে থাকে। কবি ইকবাল জিন্নাকে দেশে ফিরে এসে মুসলিম রাজনীতির হাল ধরতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। ইকবাল-জিন্নার মিলন ভারতীয় রাজনীতিতে শনি-রাহুর মিলনের মতোই এক অশুভ গ্রহ সম্মিলন। মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা এবং তার 'পাকিস্তান' নামকরণের বীজ ইকবালই জিন্নার মস্তিষ্কে রোপণ করেন, যা পরবর্তীকালে 'লাহোর' প্রস্তাবরূপে আলাদা রাষ্ট্রের দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শুরু হল ঘোর জাতীয়তাবাদী জিন্নার ঘোর সাম্প্রদায়িকতার পথে পদচারণার পালা।

১৯৩৪ সালে ভারতে ফিরে এসে জাতীয়তার আলখাল্লা ত্যাগ করে জিন্না দ্বিজাতিত্ব ও সাম্প্রদায়িকতার জোব্বায় নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত করলেন। এক কথায় বলা যায়, জিন্নার জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের যবনিকাপাত হল। এবার দেখা যাবে হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত জিন্নার হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ভগ্নদূতের চেহারা।

আর ঐ ১৯৩৪ সালেই গান্ধীজি জহরলাল নেহরুকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছেড়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন (কিন্তু পেছন থেকে কলকাঠি নাড়া ছাড়লেন না।) ফলে মুসলিম লিগের মুখপাত্ররূপে জিন্নার নবরূপে আবির্ভাব এবং কংগ্রেসের মুখপাত্ররূপে নেহরুরও আত্মপ্রকাশ। শুরু হল জিন্না-নেহরু দ্বৈরথ।

জিন্না যখন দেশে ফিরলেন তখন তিনি সৈয়দ আহমদের দ্বিজাতিতত্ত্বে দীক্ষিত। মানসিকতায় ইকবালের ভাবশিষ্য; আগা খাঁর মন্ত্রশিষ্য, এবং ইংরেজের বিভেদনীতিতে সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত। তার মুখের মোহনবাঁশি নীরব হয়ে গেছে, সর্বক্ষণ বাজিয়ে চলেছেন কানে বিষঢালা বিষের বাঁশি। তার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল সারা দেশ। একদা মানবতাবাদী ও উদারনৈতিক জিন্নার খোলসবদল ও নবরূপধারণে দেশবাসী স্তম্ভিত। গান্ধীজি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিলেও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতায় নবদীক্ষিত জিন্নার বোলচালে বিস্মিত হয়ে জিন্নাকে লিখেছেন —

"In your speeches I miss the old nationalist. When in 1915 I returned from the self-imposed exile in South Africa, everybody spoke of you as one of the staunchest nationalists and the hope of both Hindus and Muslims. Are you still the same Mr. Jinnah? If you say you are, in spite of your speeches, I shall accept your word." (3.2.1938).

গান্ধীজির এই জিজ্ঞাসার জবাব জিন্না দিয়েছিলেন দেশভাগের দাবি সম্বলিত লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে।

অবশ্য তার আগেই কংগ্রেস-মুসলিম লিগ বা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য জিন্না যে সমস্ত শর্ত আরোপ করেছিলেন, তা কোনো মর্যাদাসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই গ্রহণ আত্মহত্যার সামিল। যেমন—

১। মুসলিম লিগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করতে হবে।

২। মুসলমানদের সঙ্গে কংগ্রেসের জনসম্পর্ক নীতি ত্যাগ করতে হবে।

৩। ব্রিটিশ সরকার আইনসভাসমূহে মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে প্রাপ্য আসনের চেয়েও যে বেশি আসন স্থির করে দিয়েছে, তা বজায় রাখতে হবে।

৪। চাকুরিক্ষেত্রে সর্বত্র মুসলমানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ রাখতে হবে।

৫। মুসলমান সদস্যদের অনুমোদন ছাড়া কোনো আইন পাশ করা যাবে না।

৬। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গাওয়া চলবে না।

৭। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার পরিবর্তন করতে হবে।

৮। গো-হত্যা বন্ধ করা চলবে না।

৯। মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে ধর্মীয় শোভাযাত্রা চলবে না।

১০। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

১১। মুসলমানদের পারিবারিক ও ধর্মীয় আইনে কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না।

কংগ্রেস নেতাদের সামনে দেশভাগের ছোরা উঁচিয়ে জিন্না এসব দাবিদাওয়া তুলে ধরলেন। তার সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের—গান্ধী, নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কোনো আলোচনাই ফলপ্রসূ হল না। সুভাষচন্দ্র বসু বা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কেউ তাকে যুক্তির পথে আনতে পারলেন না। তিনি ইতিমধ্যেই দেশভাগের নিশ্চয়তা পেয়েছেন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। তিনি অখন্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেন না। তার কাছে গরু জবাই আর দেশমাতৃকা জবাইয়ে কোনো তফাৎ নেই। তাই একের পর এক সম্ভব অসম্ভব দাবি তুলে দেশভাগের দায়টা কংগ্রেস নেতাদের ঘাড়ে চাপাতেই তার ব্যারিস্টারি চাল চেলে চলেছেন এবং তাতে অনেকটাই সফল হয়েছেন, যেমন যশোবন্ত সিং-এর লেখা এখন প্রমাণ করছে।

ব্রিটিশ সরকার একের পর এক বৈঠক ও প্রস্তাব মারফত দেশভাগের দিকে ভারতের রাজনীতিকে টেনে নিয়েছে। ক্রীপস্ প্রস্তাব, সিমলা বৈঠক, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ভারতবর্ষকে কেন্দ্রীয়ভাবে দুর্বল রেখে দুটি শক্তিশালী মুসলিম ব্লকের চাপে বাকি ভারতকে নিষ্পিষ্ট রাখার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা তো দেশভাগের চেয়েও ক্ষতিকর। দু দুটি শক্তিশালি ইউনিটের—(১) পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ ও বালুচিস্তান এবং (২) বাংলা ও আসাম — চাপে বাকি ভারতের নাভিশ্বাস ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে এমনই ঠুঁটো জগন্নাথ বানানো হয়েছিল যে, জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলমান সম্প্রদায় যখন কলকাতা, নোয়াখালি ও পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার টুঁ শব্দটি করতে পারেনি। স্বয়ং সর্দার প্যাটেলকে কলকাতা আসতে বাধা দিয়েছেন বড়লাট ওয়াভেল। অথচ প্যাটেল ছিলেন তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

মুসলিম লিগের পৈশাচিক দাঙ্গার কথা ভুলে দেশভাগের জন্য কংগ্রেস নেতাদের দায়ী করা ভাবের ঘরে চুরি। যারা আজ দেশভাগের জন্য তৎকালীন নেতাদের বিশেষত হিন্দু নেতাদের দায়ী করেন তাদের সামনে দাঙ্গার একটু সামান্য চিত্র তুলে ধরা যাক —

"যাহারা খুন হইয়াছে তাহাদের যেসব শিশু ছেলে ছিল তাহাদের পা দুটি ধরিয়া দেওয়ালের গায়ে আছড়ে মারা হইয়াছে। আর মেয়েদের ঐভাবে মারিবার আগে ধর্ষণ করিয়া নেওয়া হইত। আর তাহারা যদি কিশোরী বা তরুণী হইতেন, তাহলে তাহাদের ধর্ষণ করিবার পর তাহাদের স্তন কাটিয়া ফেলা হইত। যদি এদের মধ্যে কেউ সন্তানসম্ভবা থাকিত, তাহলে ধর্ষণের পর তাহাদের পেট চিরিয়া ফেলা হইত।" (Last Days of British Raj–Leonard Mosley)

জিন্নার চেলাচামুন্ডাদের এরকম পৈশাচিক আচরণে জিন্নার মনে কোনো বিকার ঘটেনি। বরং তিনি বলেছেন, পাকিস্তান দাবি না মানলে এ ধরনের ঘটনা চলতেই থাকবে। দেশভাগের দায় থেকে যারা জিন্নাকে 'ক্লিন চীট' দিচ্ছেন, তারা তাদের ছেলে মেয়ে মা-বোনের উপর এ ধরনের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হলেও কি জিন্নার নামে জয়ধ্বনি দিতেন, তাকে মোবারকবাদ জানাতেন! বাংলার হিন্দুরা এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীরা দেশভাগের দাবি তোলার আগেই কিন্তু পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখরা দেশভাগের দাবি তুলেছিল।

কোনও একটি সংবাদপত্রে "দেশভাগ মেনে নিল কংগ্রেস, গান্ধী জানলেনও না" শীর্ষক রচনায় যশোবন্ত সিং-এর বিতর্কিত বইটির নির্বাচিত অংশের অনুবাদ পাঠ করে দেশভাগের ভুক্তভোগী হিসাবে দু-একটি কথা বলা উচিত বলে মনে করি।

সেই ১৯৪৮ সালের কথা। দাঙ্গাহাঙ্গামা কিছুটা স্তিমিত হলেও আমরা নোয়াখালির হিন্দুরা শীতকালে লোমছাঁটা ভেড়ার মতো তখনো ঠকঠক করে কাঁপছি। এমন সময় মিঃ জিন্না এন্তেকাল করলেন। হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও তাদের রসবোধে একেবারে খরা লাগেনি। উপমহাদেশের দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের তৎকালীন সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে আমরা ছড়া কেটেছিলাম—

"কাশ্মীরে হানাদার
হায়দ্রাবাদে রাজাকার
পূর্ববঙ্গে আনসার
জিন্নার হল ক্যানসার"

জিন্না যখন বিলাত থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ব্রিটিশের শেখানো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বুলি তোতাপাখির মতো যত্রতত্র বলে বেড়াতে থাকেন, তখন গান্ধীজি তাঁকে লিখেছিলেন পূর্বোক্ত চিঠিখানা।

বলাই বাহুল্য, জিন্নার কাছ থেকে গান্ধীর এই জিজ্ঞাসার কোনো জবাব আসেনি। তবে প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে সেই জবাব এসেছিল দুবছর পরে মুসলিম লিগের ভারত ভাগের দাবি সম্বলিত লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে। তারপর থেকে জিন্নাকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি।

১৯৪২ সালের ক্রীপস্ প্রস্তাবে তো যুদ্ধ শেষে জিন্নার পাকিস্তান দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ক্রীপস্ প্রস্তাবে হুবহু লাহোর প্রস্তাবের ছাপ পড়েছে বলা যায়। লাহোর প্রস্তাবের উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে গান্ধীজি তো স্পষ্টই বলেছেন, যারা নিজেদের আলাদা জাতি বলে মনে করে এবং যারা

দেশভাগের দাবি তোলে, তাদের আমার মতে আনতে আমি জোর খাটাব না। নেহরুজি আরেক পা এগিয়ে বললেন, লাহোর প্রস্তাবে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এমন বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে বাস করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। মুসলিম লিগের বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকেই ক্রীপস্ প্রস্তাবে রূপদান করা হয়েছিল।

ক্রীপস্ প্রস্তাব থেকে মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব—মাত্র চার বছরের ব্যবধান—কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে ঘটে গেছে আকাশ পাতাল তফাৎ। ভারতবর্ষের রাজনীতি হিন্দু-মুসলমান, বা কংগ্রেস-মুসলিম লিগের মধ্যে লড়াইয়ে নামিয়ে এনে নাটের গুরু ব্রিটিশ সরকার দূরে থেকে তামাসা দেখছে এবং জিন্নাকে পেছনে থেকে মদত জুগিয়ে যাচ্ছে। জিন্নার দাবি দাওয়া, ঔদ্ধত্য ও হিংস্রপ্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চারদিকে ধিকি ধিকি জ্বলছে অসন্তোষের আগুন। তা প্রশমনের কোনো চেষ্টা নেই; বরং ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে মিঃ জিন্না ও মুসলিম লিগ।

জিন্নার ক্রোধ ও বিরক্তি প্রশমন করতে গান্ধীজি একনাগাড়ে ১৮ দিন জিন্নার বাড়িতে ধর্ণা দিয়েছেন। কিন্তু জিন্নাকে স্বমতে আনতে পারেননি। জিন্না কোনো যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না। তার কাম্য পাকিস্তানের স্বরূপ ও চরিত্র ব্যাখ্যা করেন না। তার এক পয়েন্ট দাবি--পাকিস্তান চাই। সেই পাকিস্তান রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং বৈদেশিক ও দেশরক্ষা বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুরক্ষিত হবে কিনা সে চিন্তাভাবনা তার নেই। যেহেতু ব্রিটিশ আর্মিতে সংখ্যার তুলনায় মুসলমান সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি, সেই জোরেই কিন্তু সবসময় লড়কে লেঙ্গে, মারকে লেঙ্গে হেঁকে চলেছেন।

এমতাবস্থায় ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রীমিশন এসে যে পরিকল্পনা পেশ করল, ভারতকে অখণ্ড রাখার নামে ত্রিখণ্ড করার পথ পরিষ্কার করে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের হাতেই দেশ শাসনের চাবিকাঠি রাখার প্রস্তাব রাখল, সে-প্রস্তাব কার্যকর করা কারো পক্ষে সম্ভব হল না। মুসলিম লিগ প্রস্তাব গ্রহণ করেও বর্জন করল। কংগ্রেস নিজস্ব ব্যাখ্যানুযায়ী প্রস্তাব গ্রহণ করে শাসনভার গ্রহণে সম্মতি দিল এবং জিন্নাকেও সরকার গঠন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণে আহ্বান জানাল। প্রত্যুত্তরে জিন্না ডাক দিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা ডাইরেক্ট অ্যাকশনে—অবশ্যই হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

তারই ফলশ্রুতি ১৬ আগস্টের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস এবং ১০ অক্টোবরের নোয়াখালির নরমেধ যজ্ঞ। গান্ধীর অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেল শত সহস্র নিরাপরাধ নরনারীর খণ্ড বিখণ্ড দেহের বিকট স্তূপ দর্শনে। কলকাতা নোয়াখালি ও বিহারের সে-বীভৎস দৃশ্য দেখার পর তিনি আর অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা তুললেন না। নেহরুজি নোয়াখালি গেলেন দেশভাগে তাঁর গুরু গান্ধীজির সম্মতি আদায়ে। গান্ধীজিও মৌনং সম্মতি জানিয়ে দিলেন। অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লিগ মন্ত্রীদের অসহযোগিতা, প্রতিটি প্রশ্নে বাধাদান ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। তাতে ইন্ধন জোগাল সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের পৈশাচিক ঘটনাবলী। মিঃ মোসলে বর্ণিত সে বীভৎস্যতার নমুনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই অমানুযিক বর্বরতা থেকে কন্যার ইজ্জত রাক্ষার্থে অনেক শিখ-বাবা স্বহস্তে কন্যার শিরচ্ছেদ করেছেন, অনেক শিখরমণী পাতকুয়ায় ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। হিন্দু ও শিখদের উপর এ ধরনের পৈশাচিক অত্যাচারের পরও জিন্নার ডান হাত ও অখণ্ড ভারতের

অর্থ মন্ত্রী এবং পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান বলেছেন ঃ পাঞ্জাবে যা ঘটানো হয়েছে, পাকিস্তান না পেলে সারা ভারতেও তাই ঘটানো হবে।

পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ই. জেনকিংস মুসলিম লিগ নেতাদের এ ধরনের নির্লিপ্ত মনোভাবে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন ঃ এই পৈশাচিক বর্বরতা মুসলিম লিগের পরিকল্পিত। পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখরা মুসলমানদের জন্তুজানোয়ারেরও অধম মনে করে, মুসলিম লিগকে ক্ষমতাসীন করার আগে আমি পদত্যাগ করব, কোনো ব্রিটিশ অফিসার এ ধরনের মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করবে কিনা সন্দেহ।

এদিকে জিন্নাও বিষের বাঁশি বাজিয়েই চলেছেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন—পাকিস্তান বিরোধিরা ইসলামের শত্রু। জিন্নার চোখে হিন্দুরা মনুষ্যেতর জীব; একসঙ্গে বসবাসের অযোগ্য। বিলাতে লর্ড ইজমের সঙ্গে আলোচনায় জিন্নার এরূপ বিকৃত মনোভাবের পরিচয় পেয়ে ইজমে লিখেছেন :

"The dominating feature in Mr. Jinnah's mental structure was his loathing and contempt of the Hindus. He apparently thought that all Hindus were sub-human creatures with whom it was impossible for the Muslims to live."

পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখ নেতৃবৃন্দ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন, হত্যাকারী মুসলিম লিগের সঙ্গে সরকার গঠনে তারা নেই। সর্দার বলদেব সিং লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি লিখে জানালেন, অবিলম্বে পাঞ্জাব ভাগ চাই। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ জননেতারা যখন পাঞ্জাব ভাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং মুসলিম লিগের নজিরহীন বর্বরতা বন্ধ হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যখন নেওয়া হচ্ছিল, তখন গান্ধীজি নোয়াখালি ছেড়ে বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় পরিভ্রমণরত। তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিত্য দেখাশোনা ও আলোচনা। তিনি যদি বলে থাকেন যে, তাঁকে এড়িয়ে ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাহলে সত্যের অপলাপ হবে। ওয়ার্কিং কমিটির সামনে তখন দ্বিতীয় পথ খোলা ছিলনা। আর কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারের বীভৎসতার পর গান্ধীজির অহিংস-ঘড়ায় ছিটাবার মতো শান্তিজলও তখন অবশিষ্ট ছিল না।

যারা পাঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্তের জন্য নেহেরু-প্যাটেলের সমালোচনা করেন, তারা কঠোর সত্য ও নির্মম বাস্তবতাকে স্বীকার করতে ভয় পান। আসল কথা হল, কলকাতা নোয়াখালি ও বিহারের দাঙ্গার ভয়াবহতা দর্শনে গান্ধীজির অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন টুটে গেছে। মাটি অখণ্ড রাখতে গিয়ে হাজার লক্ষ মানুষের দেহ যে খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছে, তাতে গান্ধীজি বিচলিত বোধ করেছেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যে মন ভেঙে গেছে, সে-মন আর জোড়া লাগবে না। তবে সে কথা স্বীকার করে নিতে তাঁর অন্তরে বাজে। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকে সেই পরাজয় স্বীকৃতির হাত থেকে রেহাই দিয়েছে। পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটি যখন পাঞ্জাব ভাগের দাবি তোলে এবং ওয়ার্কিং কমিটি তার ভিত্তিতে পাঞ্জাব ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করে, গান্ধীজি তো সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতে পারতেন। তাতে বাধা দিতে পারতেন। তিনি সে পথে না গিয়ে প্রস্তাব গ্রহণের তিন সপ্তাহ পর নেহরু-প্যাটেলের কাছে এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণের কারণ জানতে চাইলেন। এটা গান্ধীজির পক্ষে শুধু দ্বিচারিতা নয়, চূড়ান্ত ভণ্ডামি।

ফলকথা, গান্ধী যখন কি করবেন না করবেন ভেবে বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, তখন পাঞ্জাবই তাঁকে সঠিক পথ নির্দেশ দিল। এবং তার দেখাদেখি বাংলা থেকেও বাংলাভাগের দাবি উঠল। ফলে, দেশভাগ আর ঠেকাবার মতো কোন উপায় রইল না। আর স্বয়ং গন্ধীজিই তো ১৯৪৪ সালে, রাজাজি প্রস্তাব মারফতে মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। মুসলমানরা নৃশংস হিন্দুবিরোধী দাঙ্গায় গান্ধীজির সেই ইঙ্গিতকেই কার্যে রূপদান করেছিল।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেনের আবির্ভাব। জিন্নার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার কালেই তিনি বুঝলেন, জিন্না মানসিক বিকারগ্রস্ত। মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হলেও জিন্নার পাকিস্তান চাই-ই। এমনকি খণ্ডিত পাকিস্তান হলেও তাঁর অখণ্ড কর্তৃত্ব চাই। মাউন্টবাটেন যখন জিন্নাকে বললেন—"দেশ খণ্ডিত হলে প্রদেশও খণ্ডিত হবে। তিনি কি পূর্ণ সার্বভৌমত্বসহ অখণ্ড ভারতবর্ষ, না পোকাকাটা পাকিস্তান চান? আপনি দেশভাগ চাইলে আপনাকে প্রদেশভাগ অর্থাৎ পাঞ্জাব ও বাংলাভাগ মেনে নিতেই হবে।" জিন্না তখন মাউন্টব্যাটেনের কাছে সকাতর আবেদন জানান—আমাকে পোকাকাটা পাকিস্তান দিবেন না। আবার মাউন্টব্যাটেনকেও সাবধান করে বললেন, পাকিস্তান না পেলে রক্তপাত চলছে চলবে।

মাউন্টব্যাটেন যখন জিন্নাকে অনুরোধ করে বললেন, আপনি আমাকে দেশভাগে বাধ্য করবেন না, তখনও জিন্না অনড়। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে পরিষ্কার ভাষায় বললেন, আপনাকে অস্ত্রোপচার করতেই হবে–" You must carry out a surgical operation. Cut India and its army firmly in half and give me the half that belong to the Muslims"

তার উত্তরে মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে বলেছেন—আমি যদি ভারতবর্ষকে ভাগ করার আপনার যুক্তি মেনে নিই, তাহলে পাঞ্জাব ও বাংলাভাগের প্রশ্নে কংগ্রেসের যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারি না : "I told him that if I accepted his arguments on the needs for partition of India, then I could not resist the arguments that Congress were putting forward for the partition of the Punjab and Bengal."

আজ যারা দেশভাগের জন্য নেহরু-প্যাটেলকে দায়ী করেন, জিন্নার পক্ষে সাফাই গান এবং গান্ধীজিকে সন্দেহের অবকাশে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেন, তারা যদি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করেন; আর তাদের সামনে আছড়ে মারা শিশু সন্তান, ধর্ষিতা ও স্তনকাটা যুবতী কন্যা এবং পেট চিরে ফেলা সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর মৃতদেহ এনে ফেলা হয়, তখনো কি তারা নরপশুদের ক্ষমা করে চোখ বুঁজে "ঈশ্বর-আল্লা তেরে নাম" গাইবেন; না দুর্জনের সহবাস ত্যাগ করার সঙ্কল্প নেবেন? রাখঢাক না করে সরাসরি উত্তরটা দিলেই ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা হবে।

দেশভাগ হল, বাংলা ভাগ হল, পাঞ্জাব ভাগ হল, পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু - শিখ নিশ্চিহ্ন হল। আর পূর্ববঙ্গে / পূর্বপাকিস্তানে মুসলিম শাসনের যে পরিচয় দশ মাস আগেই হিন্দুরা কলকাতা নোয়াখালী - ত্রিপুরাতে পেয়েছে, তারা শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনের অপেক্ষায় দুরু দুরু বক্ষে দিন গুনতে লাগল। সাতশত বছরের মুসলিম শাসনের স্বরূপ অবগত থেকেও তারা অত্যন্ত মূর্খ ও অর্বাচীনের মতো বিশ্বাস করেছিল ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ফাঁকা

আশ্বাসে —

> "রাজনৈতিক সীমারেখা যাঁদেরকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছেন না, আমরা সেই ভাই-বোনদের কথাও স্মরণ করছি। ঘটনা যাই ঘটুক, তাঁরা আমাদের এবং আমাদেরই থাকবেন। আমরা অবশ্যই তাঁদের সুখ-দু:খের অংশীদার হব।"

এ তো তালাক দেওয়া বিবির নতুন সংসারে দুঃখ কষ্টের সম্ভাবনায় প্রাক্তন খসমের "ভয় কি, আমি তো আছি"— গোছের অভয় দানের সামিল! বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক হিন্দুদের কাছে তার কি মূল্য আছে? আর নেহেরুজীর এই স্তোকবাক্য যে কত মূল্যহীন, মাত্র আড়াই বছরের মাথায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তার প্রমাণ পেল চরম মূল্য দিয়ে। সে তথ্য উদঘাটন এবং সত্য প্রকাশেই বর্তমান গ্রন্থের অবতারণা।

কোডেক্স
কলকাতা - ৯

ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ
সম্পাদক

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চাশের দাঙ্গা — বাঙালির সার্বিক বিপর্যয়

"১৯৫০ বঙ্গজীবনের ইতিহাসে এক শোচনীয়তম অধ্যায়ের সূচনা করল। দেশবিভাগের যে বিষপাত্র গান্ধীজি বাঙালির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন সেই বিষপাত্র এক অদৃশ্য নায়ক বাঙালির হাতে ফের তুলে দিল ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে। গান্ধীজির হত্যার পর সামগ্রিকভাবে এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তির এক বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মনেও হিন্দুদের এই মুহূর্তে বিতাড়নের মানসিকতা গড়ে ওঠার কোনও লক্ষণও দেখা দেয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারে ২৫ থেকে ২৮ শতাংশ হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। বেসরকারি জীবনে অর্থাৎ শিক্ষা, আইনব্যবসা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ওই সংখ্যা তখন ৫০ শতাংশেরও বেশি ছিল। সমাজজীবনের ওই অংশগুলি থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হলে বাঙালি মুসলমানেরা ওই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করবে, এমন অবস্থা তখন তাদের ছিল না। ফলে কোনও রকম পূর্বাভায ছাড়াই ১০ ফেব্রুয়ারির (১৯৫০) পর প্রদেশের প্রায় বারোটি জেলায় হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। এই দাঙ্গায় একধাক্কায় প্রায় ৩৫ লাখ হিন্দু চলে এল পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় এবং অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও কাছাড় জেলায়। প্রতিহিংসামূলক দাঙ্গায় বিপন্ন হল পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি জেলার মুসলমানেরা। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সম্পৃক্ত সমাজজীবনকে এরকম বড় আঘাত দেশবিভাগও দিতে পারেনি। এই দাঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা প্রায় ত্রিশ লাখ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির জীবনবোধ, মমত্ব, দায়ভাগ ও মূল্যবোধকে একেবারে ওলট-পালট করে দিল। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এক নতুনপ্রজন্ম দেখা দিল যাদের জন্ম রেললাইনের পাশে জবরদখল জমির কুঁড়েঘরে, এমনকী রেলগাড়ির পরিত্যক্ত কামরায়। শিয়ালদা স্টেশনের ৭৫/৮০ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ধুবুলিয়া, বাদকুল্লা, রূপশ্রী, কুপার্সক্যাম্প, তাহেরপুর, রাণাঘাট, ঘোলা প্রভৃতি শরণার্থী শিবিরের মেয়েদের দেখা যেতে লাগল সন্ধ্যার অন্ধকারে ধর্মতলা, চৌরঙ্গি, এসপ্ল্যানেডের মোড়ে। পাওয়া যেতে লাগল কলকাতার পতিতালয়গুলিতে 'বাঙাল' উচ্চারণভঙ্গির মেয়েদের অস্তিত্ব। শুধু বেঁচে থাকা, ভাইবোন ও বৃদ্ধ মা বাপের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজেদের মানুষের ভগ্নাংশে পরিণত করা। সীমান্তশহর বনগাঁর লাখ লাখ শরণার্থীর মাঝে দাঁড়িয়ে ওই সময় সমাজজীবনের এই অবনমনের কথা মনে রেখে জওহরলাল নেহেরুকে বলতে হয়েছিল 'Partition of the Country brought many evils at its trail...' । গান্ধীজির সেক্রেটারি অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু বোধহয় একমাত্র বাঙালি যিনি তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে শরণার্থীদের মানসিকতা সম্পর্কে কিছু গবেষণা করে ওই সময় রচনা করেছিলেন 'Social tension among East Pakistani refugees'। (বঙ্গসংহার এবং ... সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)

কি ঘটেছিল সেই ১০ ফেব্রুয়ারি ও তার পরবর্তী কয়দিন তার অতি অকিঞ্চিৎকর বিবরণ পাওয়া যায় সমকালীন পত্রিকার পাতায়। সে সময় যে কত জানা-অজানা, পরিচিত-

অপরিচিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষক-ছাত্র, চাষী-ব্যবসায়ীকে পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, নৌকায় স্টীমারে, ঘরে-বাইরে, কুকুর-বিড়াল, মশা-মাছির মতো খুন করা হয়েছিল, তার হিসাব কি কোনও দিন মিলবে? সেসব ভয়ঙ্কর দিনের কিছু ছবি পাওয়া যায় নিম্নোক্ত বর্ণনায়ঃ-

সেই কালো ১০ই ফেব্রুয়ারী দিনটি ঃ জুম্মার নামাজ সেরেই আল্লার নাম নিয়ে কোতল শুরু

"আমি বলি যে, আমাদের বন্ধু অতুলানন্দবাবু এইমাত্র বলে গেলেন যে, আজ নমাজের পরেই নাকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হবে। কথাটা শুনেই, ধীরাজবাবুই ঘাবড়ালেন বেশি; কারণ, তাঁর বাসা গেণ্ডারিয়া অঞ্চলে মুসলমান বস্তির মধ্যে। তিনি ঘড়ি দেখে দেখেন যে নমাজের সময় হয়ে এসেছে; ফলে, তিনি এতই ভয় পেয়ে যান যে, একাকী বাসায় যেতেও সাহস পান না। তখন অরুণবাবু তাঁর অবস্থা দেখে বলেন যে,—"চলুন, আমি আমার মোটরে করে নিয়ে আপনার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি।" তাই হল। তাঁরা চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই খবর পেলাম, দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পূর্ববঙ্গ সরকারের সচিবালয় (সেক্রেটারিয়েট) প্রাঙ্গণেই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। তার বিবরণ একটু পরেই দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের বাসায় খবর আসে যে, অতুলানন্দবাবুর বাড়িও দাঙ্গাকারীরা আক্রমণ করে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছোরা মেরেছে তাঁর বাড়িতেই। তাঁরও বাড়ি কাঠের পুলের ওপারে গেণ্ডারিয়া অঞ্চলেই। খবরটি শুনেই বন্ধু সুবোধ নাগ ও স্বদেশ নাগ—উভয়েই ছোটেন অতুলানন্দবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে। একে তো তাঁরা উভয়েই ছিলেন অতীতের বিপ্লবী; তার উপর তাঁরা ঢাকার লোক! ঢাকার হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়েই এতকাল টিকে থাকতে হয়েছে; তাই তাঁদের সাহসও অন্য স্থানের লোকের চেয়ে কিছুটা বেশি। তাঁরা গেলেন। আমরা যাঁরা বাসায় থাকলেম তাঁরা তাঁদের ফিরে আসা পর্যন্ত অধীর আগ্রহ নিয়েই থাকি। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে উভয়েই গলদঘর্ম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসেন। তাঁদের কাছে শুনি, দাঙ্গাকারীরা অতুলানন্দ বাবুর বাড়ির ভেতরে ঢুকেই সামনে পায় তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে। ছেলেকেই তারা ছোরা নিয়ে যখন আক্রমণ করতে যায়, তখন অতুলবাবু ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঢেকে ফেলেন। সেই অবস্থার উপরেই ছোরা চলে; ফলে, ছোরার আঘাতগুলো পড়ে অতুলানন্দবাবুর পিঠের উপরে। সুবোধবাবু ও স্বদেশবাবু অতুলানন্দবাবুর অবস্থা দেখে ঢাকা হাসপাতালে খবর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আনিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ফিরে এসেছেন। ফেরার পথে তাঁদেরও একদল দাঙ্গাকারী গুণ্ডা আক্রমণ করার জন্য তাড়া করে। তাঁরা দৌড়তে দৌড়তে কাঠের পুল পার হয়ে এপারে এসে পড়লে গুণ্ডারা আর তাঁদের পেছনে আসে না। দাঙ্গা ঠেকাবার ক্ষমতা আর হিন্দুদের ছিল না। ঢাকায় আগে হিন্দু অঞ্চল ও মুসলমান অঞ্চল আলাদা আলাদা ছিল। ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশানের' দাঙ্গায় দেখেছি কলকাতাতেও তাই-ই ছিল। হ্যারিসন রোডের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) এক দিকে হিন্দু অঞ্চল আর অপর দিকে মুসলমান অঞ্চল। দাঙ্গার সময়ে হিন্দু অঞ্চলে মুসলমান বা মুসলমান অঞ্চলে হিন্দু ঢুকলে

জ্যান্ত অবস্থায় খুব কম লোকই বের হতে পারতেন; তাই, যারা স্থানীয় লোক তাঁরা কখনও অপর সম্প্রদায়ের অঞ্চলে ঢুকতেন না। ঢাকাতেও তখনকার অর্থাৎ ১৯৫০ সালের দাঙ্গার প্রথম দিন পর্যন্ত সেই মনোভাবই দেখা গিয়েছে সেই জন্যই সুবোধবাবু ও স্বদেশবাবু সে যাত্রায় বেঁচে যান, কিন্তু দাঙ্গার প্রথম দিনের পরে আর সে মনোভাব ছিল না। মুসলমান দাঙ্গাকারীরা দেখেছিল যে, হিন্দুদের আর আগের সেই মনোবল নেই; তাই তারা—এমন কি ১৫।১৬ বছরের দাঙ্গাকারী মুসলমান তরুণ যুবকদের মধ্যেও কেউ কেউ নির্ভয়ে হিন্দু মহল্লায় এসে হিন্দুর বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েও হিন্দুর উপরে ছোরা চালিয়েছে বা হিন্দুর বাড়ি লুট করেছে।

ঢাকা সেক্রেটারিয়েটে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব আক্রান্ত ঃ দাঙ্গার নেতৃত্বে সরকারি কর্মচারীরা

"কিছুক্ষণ পরেই আমরা আমাদের বাসায় থেকেই দাঙ্গার মুল কেন্দ্রস্থল পূর্ববঙ্গ সরকারের সচিবালয়ের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাই। বিবরণ দেন সচিবালয়েই একজন হিন্দু কেরাণী। তাঁর কাছে শুনি—"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় (বর্তমানে পরলোকগত) পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দুই মুখ্যসচিবদের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত বৈঠকের জন্য ঢাকায় এসে পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব জনাব আজিজ আহমেদের সাথে তাঁর ঘরেই বৈঠক শেষ করে শুক্রবারের জুম্মার নমাজের জন্য সচিবালয়ের সেদিনের মত ছুটি হয়ে যাওয়ায় যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সচিবালয়েরই কর্মচারীদের একটা দল নাকি তাঁকেই সর্ব প্রথমে ঘিরে ধরে এবং ভারত-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী ধ্বনি করতে থাকে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীসেনকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয় ঐ কর্মচারীদের কাছ থেকে। যাই হোক, পরে, তারা দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা করে ভারত ও হিন্দু-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে নবাবপুরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতে থাকে। অহিংস সত্যাগ্রহীর মত তাঁরা শুধুমাত্র ধ্বনি দিয়েই তাঁদের কাজ শেষ করেন না। পূর্ব থেকে চিহ্নিত হিন্দুর দোকানগুলো লুটও করতে এবং হিন্দুর উপর ছোরা-লাঠিও চালাতে থাকেন। সচিবালেয়ের কর্মচারীরা রাস্তায় নেমে আসার পরে, বাইরের আরও বহু লোকই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে দল ভারী করে। হিন্দুর সেই দুঃসময়েও শুনেছি, ২।১টি বাঙালী মুসলমান যুবক সাইকেলে চড়ে নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে হিন্দুদের সতর্ক করে, চিৎকার করতে করতে যান। তাঁরা নাকি বলেন,—"হিন্দু দোকানদাররা তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ ক'রে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যান। 'দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে এবং দাঙ্গাকারীরা লুটপাট করতে করতে আসছে।" হিন্দু দোকানীরা যাঁরা যাঁরা পারলেন, দোকান বন্ধ করে বাড়ির দিকে ছুটলেন এবং যাঁরা তা করলেন না বা করতে পারলেন না, তাঁরা দীর্ঘসূত্রতার জন্য উচিত মূল্য নিজের রক্ত দিয়েই শোধ করলেন। তাঁদের দোকানও রক্ষা হল না; অবশ্য, যাঁরা তাঁদের দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও দোকান রক্ষা পায় নি, তবে প্রাণটা হয়তো রক্ষা পেয়েছে। তাও সকলেরই যে রক্ষা পেয়েছে, তা সঠিক বলা যায় না; কারণ, মহল্লায় মহল্লায়ও হিন্দুহত্যা ও হিন্দুর বাড়ি লুট-পর্ব ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের কর্মচারীরাও নির্বাক দর্শক। ওয়াড়ী অঞ্চলের বহু

হিন্দুই তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি নিয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে প্রাণের ভয়ে গিয়ে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিস ও প্রাঙ্গণ ভরে ফেলেছেন। সেই সময়ে, আমার যতটা মনে পড়ে তাতে মনে হয়, কংগ্রেসের নেতা শ্রীসন্তোষ বসু মহাশয় ঢাকায় ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। তিনি বা তাঁর অফিসের কোনও পদস্থ কর্মচারীও রাস্তায় বের হয়ে সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের বিপন্ন লোকজনের কোনও খোঁজ-খবর নেওয়ার সুযোগ পান নি। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের সেদিনও যে অবস্থা দেখেছি, আজ পর্যন্ত সেই অবস্থার কোনও পবিবর্তন হয়েছে বলে জানি না। শুনিও নি। বরং শুনেছি, উল্টোটাই। অর্থাৎ 'যথা পূর্বং তথা পরং''। ভারতে কিন্তু অন্যরূপ ব্যবস্থা! যখনই ভারতের কলকাতায় বা মালদহের মত একটি মফঃস্বল জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তখনই কিন্তু কলকাতায় পাকিস্তানের যে ডেপুটি হাইকমিশন আছে, তার পদস্থ কর্মচারীরা সেই সব অঞ্চলে গিয়ে নিজেরা সব দেখার সুযোগ পেয়েছেন। পাক-ভারতের রূপরেখার দুই দেশের দুই সরকারের মনোভাবের মধ্যে তফাৎই এইখানে! এখানে একটি কথা বলে রাখি যে, ১৯৫০ সালের সেই দাঙ্গায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন সম্পর্কে সেখানে আশ্রয়প্রার্থী ঢাকার বহু হিন্দুই এসে আমাদের কাছে ঐ অফিসের কর্তাব্যক্তির ও তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য কর্মচারীদের ব্যবহার সম্পর্কে বহু অভিযোগই করেছিলেন। ভারত সরকারের কাছেও বোধহয় সেই সব অভিযোগ গিয়েছিল।

হিন্দু এম. এল. এ-দের হোটেলও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল

''দাঙ্গাকারীরা নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলতে থাকে। শ্রীস্বদেশ নাগ, আবারও বাসা থেকে বাইরে বের হয়েছিলেন। আমাদের বাসা যেখানে ছিল, অর্থাৎ সূত্রাপুর থানার অধীন হেমেন্দ্র দাস রোড, সে স্থানটিই শুধু নয়, সূত্রাপুর থানা এলাকার প্রায় সমুদয় অঞ্চলটাই ছিল পূর্বে হিন্দু এলাকা সুতরাং স্বদেশবাবু, তাই হয়তো কতকটা নির্ভয়েই রাস্তায় বের হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি 'হন্তদন্ত' হয়ে ছুটে এসে বলেন—তাঁর এক মুসলমান বন্ধুর কাছে তিনি শুনে এলেন যে, বিরোধী দলের কংগ্রেসী 'এম-এল-এ'-দের বাড়িগুলোও নাকি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছে দাঙ্গাকারীরা। আমাদের বাসার ফটকে আমাদের নামলেখা (নেম প্লেট) কাঠের ফলক লোহার কাঁটা দিয়ে আটকানো ছিল। স্বদেশবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই নাম লেখা ফলকটি তুলে ফেললেন। ইতিমধ্যেই খবর পাই যে, বাংলা বাজারে যে হোটেলে শ্রীমনোহর ঢালি (এম-এল-এ) ছিলেন এবং যিনি খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামের ঘটনা নিয়ে পূর্ববঙ্গ এসেম্বলিতে একটি মুলতুবি প্রস্তাব তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই হোটেলটি আক্রান্ত হয়েছে। শ্রীমনোহর ঢালি মহাশয়, আক্রমণকারীদের মারমুখী মূর্তিতে আসতে দেখেই একবস্ত্রে খালি গায়ে পাগলের মত রাস্তায় বেরিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলেন। দাঙ্গার পর তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি তখন কী বলে চিৎকার করছিলেন এবং কোথায় ছুটে চলেছিলেন, তাঁর সে সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান ছিল না। হিন্দুরা তো সকলেই তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত! কে কাকে সাহায্য করে? মনোহরবাবুর সেই পাগলের মত অবস্থা দেখে একজন বাঙালী মুসলমান ভদ্রলোকই তাঁকে তাঁর বাড়িতে

নিয়ে গিয়ে তিনদিন রেখেছিলেন; তাই তিনি সে যাত্রায় বেঁচে যান। তিনদিনের মধ্যে তাঁর কোনই খবর না পেয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই মনে করেছিলেন যে, তিনি 'খতম' হয়ে গিয়েছেন!

নির্মম হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী হারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী

"সেই সময় সারা ঢাকা শহর ও জেলার গ্রামাঞ্চলে যে কী তাণ্ডব চলছিল, তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। আমার বিশিষ্ট বন্ধু নোয়াখালির 'এম-এল-এ' শ্রীহারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (সম্প্রতি এই বহু সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা, পরলোকগমন করেছেন) মশায় সেই সময় 'ভিক্টোরিয়া পার্কে'র কাছে অবস্থিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার বাড়ির তে-তলায় ছিলেন। তিনি সেই তে-তলায় থেকে ঐ অঞ্চলের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য নিজ চোখে দেখে যে একটা বীভৎস চিত্র দেন, তা শুনলেও লোকে আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন। ঐ পার্কেরই অপর এক কোণে একটি বাড়িতে একটা কমার্শিয়াল স্কুল ছিল। তার মালিক ছিলেন,...মুখার্জী উপাধিধারী একজন বিশিষ্ট বাঙালী হিন্দু। তাঁকে যেভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলতে দেখেছেন হারানবাবু তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়-বিদারক। হারানবাবু বলেছিলেন, কুড়ুল দিয়ে যেভাবে লোকে কাঠ ফাঁড়ে সেইভাবে দুর্বৃত্তেরা শ্রীমুখার্জিকে লাঠি, লোহার রড প্রভৃতি দিয়ে আঘাত করতে থাকে, তিনি আহত হয়ে আর্ত চীৎকার করতে থাকেন, কিন্তু ঐ অঞ্চল হিন্দু-অধ্যুষিত হলেও কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান না।

হিন্দু এলাকা মুছে গেছে : হিন্দুদের প্রতিরোধ শক্তি ঘুচে গেছে

"পূর্বেই বলেছি, ঢাকার হিন্দু মুসলমানগণ বরাবর সবগুলো সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়েই আত্মরক্ষার কৌশল বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করে নিজেদের রক্ষাই শুধু করেন নি, প্রতিপক্ষকে চরম আঘাতও হেনেছেন। হিন্দুরাও যে সেদিক দিয়ে মুসলমানের পেছনে ছিলেন, তা' মোটেই না। তার প্রমাণ আমরা দেখেছি ঢাকার নবাবপুরে রাস্তার পাশে একেবারে জেলা-কোর্টের গায়ে লাগা একটা মসজিদের ভাঙা স্তূপ থেকে। ঢাকার হিন্দুরাও ছিলেন বেপরোয়া, অকুতোভয়। দেশ বিভাগ, তথা পাকিস্তান সৃষ্টির এই আড়াই বছরেরও কিছু কম সময়ের মধ্যেই হিন্দুর সেই সাহস—সেই মনোবল একদম ভেঙে গিয়েছে। আমরা ঢাকায় থেকে ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় যা' দেখেছি তাকে 'দাঙ্গা' বলা ঠিক নয়। সেটা হয়েছিল একতরফা হিন্দু-গৃহ-লুন্ঠন ও হিন্দুর হত্যা। 'দাঙ্গা' হয় উভয় পক্ষের সংঘর্ষে। এই দাঙ্গায় আমরা দেখেছি একতরফা আক্রমণ; অপর পক্ষের কোন প্রতিরোধ তো ছিলই না—প্রকাশ্য প্রতিবাদেও তাঁদের মুখর হতেও শুনি নি। এই পরাজিতের মনোভাব যে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তার জন্য দায়ী কে? ঢাকার সাধারণ হিন্দুরা, না কংগ্রেস নেতারা যাঁরা সাম্প্রাদায়িকতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন? আমার মত স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন ক্ষুদ্র সৈনিকের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চুড়ান্ত ধৃষ্টতাই হবে; তাই, আমার মতামত এখানে তুলে ধরতে ক্ষান্ত থেকে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের উপরই এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার ছেড়ে দিয়ে রাখলাম। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় দেখেছি ঢাকায় হিন্দু এলাকা

বলে পৃথক সত্তার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। দাঙ্গাকারীরা আমাদের বাসার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছিল কিন্তু রাস্তার মধ্যে হিন্দু বাড়ি লুট করতে করতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়। সেদিনের মত তারা লুটের মালপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ইতিমধ্যে আমরা খবর পাই এস-ডি-ও শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসার আশেপাশে আক্রমণ চলতে থাকায় তিনি সপরিবারে গিয়ে ওঠেন একটি আশ্রয় শিবিরে। সাময়িকভাবে তখন তখনই একটা আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। গেণ্ডারিয়া অঞ্চলেই তখন ঢাকার প্রখ্যাত নেতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। তাঁর বাড়িও আক্রান্ত হয়েছিল। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, অন্তত ঐ অঞ্চলে যিনি আক্রমণকারীদের সামনে সিংহ-গর্জনে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলে শুনেছি। তাঁর প্রতিরোধশক্তি দেখে আক্রামণকারীরা পিছিয়ে যায়। এই শ্রীশবাবুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় পূর্ববঙ্গে 'অনুশীলন সমিতি'র স্রষ্টা পুঁলিনবিহারী দাস মহাশয়ের সহকর্মী হিসাবে। তিনি ঢাকার উকিল ছিলেন এবং বিপ্লবী কর্মীদের বহু মামলায় তিনি আসামীপক্ষের সমর্থনে বরাবর এগিয়ে গিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আসামের গৌহাটি শহরে ফেরারী বিপ্লবীদের সাথে পুলিশের যে খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং যার ফলে আমাদের দলের আমরা ৫ (পাঁচ) জন ধৃত হই—আমি পুলিশের রাইফেলের গুলীতে আহত হয়ে পরে কামাখ্যা পাহাড়ের উপরে ধরা পড়ি, এবং সেই ঘটনাকে অবলম্বন করে যখন আমাদের তৎকালীন ভারতরক্ষা আইনে 'স্পেশাল ট্রিবিউনালে' বিচার হয়, তখন সেই মামলায় কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার শ্রী এস. এন হালদার সাহেব ও ঢাকা থেকে শ্রীশবাবু আমাদের পক্ষ সমর্থন করতে বাংলাদেশ থেকে যান। শ্রীশবাবু বরাবরই ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ই তাঁকে গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসের নেতৃত্বে নিয়ে আসেন। তিনি গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসে আসেন বটে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (তিনি কিছুকাল আগে পশ্চিম বাংলায় এসে ৯১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন) যদিও কংগ্রেসসেবীই ছিলেন, তবু তিনি কোনও দিনই গান্ধীজীকে "মহাত্মা" বলতেন না। আমার রচিত— "India Partitioned and minorities in Pakistan" ইংরাজী বইখানির ভূমিকা তিনিই লিখেছিলেন। তাতেই, গান্ধীজীর নামের আগে তিনি 'মহাত্মা' কথাটি লেখেন নি—আমি বলা সত্ত্বেও তিনি লিখতে রাজী হন নি। এইরকমই একরোখা তিনি বরাবরই ছিলেন। এইটেই ছিল তাঁর চরিত্রের ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তিনি লিখতে রাজী হন নি। এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তিনি সেদিন তাঁর বাড়িতে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।" (পাক-ভারতের রূপরেখা—প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী)

হিন্দু এম. এল. এ.-দের জীবনও নিরাপদ ছিল না ঃ দাঙ্গা বন্ধের চেষ্টা না করে হিন্দু এম.এল.দের পাহারার ব্যবস্থা

"স্বদেশবাবুকে তাঁর মুসলমান বন্ধুর দেওয়া খবর, অর্থাৎ আমাদের বাড়িও যে আক্রান্ত হবে সেই খবর সত্য বলেই আমরা ধরে নিয়েছিলেম। অতুলানন্দবাবুকে, তাঁর জনৈক মুসলমান বন্ধুর দেওয়া দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার খবর সত্যে পরিণত হতে দেখে, আর মুসলমানদের দেওয়া খবর অবিশ্বাস করার আমাদের কোন কারণ ছিল না। ১৯৫০ সালের

দাঙ্গা যে সুপরিকল্পিত ও পূর্বনির্দিষ্ট ছিল সে বিষয়ে অন্তত আমার মনে আর কোনও সন্দেহ ছিল না। তখনও না, এখনও না। সেটারই প্রমাণ আমি ক্রমশ আরও তুলে ধরবো। যাক্ আমাদের বাড়িও আক্রান্ত হবে ধরে নিয়েই আমরাও প্রস্তুতই হয়ে ছিলেম। আমরা ঠিক করেছিলম, মরতেই যদি হয় তবে কোনওরূপ দুর্বলতা না দেখিয়ে বীরের মতই মৃত্যুকে বরণ করবো। কিন্তু আমাদের বাড়ি আর আক্রান্ত হল না। কেন যে হতে পারলো না, সেই কথাটাই বলছি। সন্ধ্যার পরই তিনজন মন্ত্রী-বন্ধু— (১) ডাঃ এ. এম. মালেক, (২) জনাব হবিবুল্লা বাহার ও (৩) জনাব তফাজ্জল আলি সাহেব, এক 'ট্রাক' ভর্তি বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে আমাদের বাসায় আসেন। পুলিশরা বন্দুক নিয়ে রাস্তায় 'টহল' দিতে থাকেন; আর মন্ত্রীরা আমাদের উপরতলায় এসে আমাদের সাথে আলোচনা আরম্ভ করেন। নানা বিয়য়েই আমরা আলোচনা করি। মন্ত্রীদের আমরা বলি যে একখানি 'জীপ' গাড়ি দু-একজন পুলিশ পাহারা সহ আমাদের দিলে যে সব হিন্দু, মুসলমান মহল্লায় আটক পড়ে (marooned হয়ে) আছেন, তাঁদের আমরা নিরাপদ স্থানে উদ্ধার করে আনতে পারি। মন্ত্রী-বন্ধুরা তা' দিতেও রাজী হন। কিন্তু তাঁরা তা দেন নি। আমার বিশ্বাস দিতে পারেন নি। কেন আমার ঐ বিশ্বাস হয়েছে, তাও আমি ক্রমশ দেখাতে চেষ্টা করবো। তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি ঠিক না রাখলেও, বা না রাখতে পারলেও তাঁরা যে একদল বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে এসে রাত ১২টা পর্যন্ত আমাদের বাসায় থাকেন এবং সিপাহীরা রাস্তায় টহল দিয়ে চলেন, শক্তির এই বহিঃপ্রকাশ (demonstration) যে ভবিষ্যৎ আক্রমণকারীদের উপর এমন একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে আর আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হয় নি, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। মন্ত্রী-বন্ধুরাও হয়তো পূর্বে থেকে অন্যান্য মুসলমানদের মত খবর পেয়েই হোক, বা আশঙ্কা করেই হোক, একদল সশস্ত্র সিপাহি নিয়ে এসেছিলেনও বোধ হয় সেই উদ্দেশ্যেই। যাক, আমাদের বাড়ি আর আক্রান্ত হল না; তবে, পুলিশ পাহারাসহ 'জীপ' না পাওয়ায় আমরা আর অন্যান্য হিন্দুকে উদ্ধার করতে পারলেম না। তবে, ভগবানই হয়তো অনেকের উদ্ধারের একটা যোগাযোগ অন্যের মারফৎ করে দিলেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের-হঠাৎ আবির্ভাবে কিছু হিন্দুর জীবন রক্ষা

"পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী তখন ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তাঁকে আমি ১৯৪৬ সাল থেকেই দেখেছি। সুরাবর্দীর মন্ত্রীসভায় ও দেশ বিভাগের আগেই তিনি বাংলাদেশের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন। দেশ বিভাগের পরেও তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। বরাবরের সেই মুসলিম লীগ সমর্থক শ্রীযোগেন্দ্র মন্ডল মহাশয় হঠাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই করাচি থেকে ঢাকার কিছু সংখ্যক হিন্দুর—তারমধ্যে তাঁর সমগোত্রীয় হিন্দুই হয়তো বেশি ছিলেন—তিনি যথেষ্ট উপকার করেছেন। তিনি তাঁর গাড়ি ও পুলিশ নিয়ে গিয়ে অনেক হিন্দুকেই উদ্ধার করেছেন। হোক না কেন তাঁদের বেশির ভাগই তাঁর স্বজাতীয়, তবু তাঁরা হিন্দু, তাঁরা বিপন্ন মানুষ। যা আমরা করতে পারলেম না, তিনি তা' সেদিন তাঁর মন্ত্রিত্বের পদাধিকারবলে করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে আমি ধন্যাবাদ না জানিয়ে পারি না। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, "devils

must be given their due shares." অর্থাৎ মানুষ যতই মন্দ হোক না কেন, তার করা ভাল কাজও অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। যোগেনবাবুর রাজনীতিক মতের সাথে কোনও দিনই অতীতে আমরা একমত তো হতেই পারি নি, বরং সব সময়েই দেখেছি, তিনি আমাদের মতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজই করেছেন; তবু, তাঁর সেদিনের কাজের জন্য আমি তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তার পরের দিনই তিনি সম্ভবত ঢাকায় থেকেই বরিশাল ধ্বংসের খবর পেয়েই, তাঁর জেলা বরিশালে চলে যান।" (ঐ)

ঢাকার দাঙ্গায় যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের প্রতিক্রিয়া

"একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটানো হল ১৯৫০-এর ১০ই ফেব্রুয়ারী। একটি মেয়েছেলেকে লাল রঙ্ মাখিয়ে এমনভাবে দেখাবার চেষ্টা করা হয় যেন কলকাতায় দাঙ্গায় তার স্তন দুটি কেটে ফেলা হয়েছে। সকাল দশটার সময় তাকে ঢাকাস্থ পূর্ববঙ্গ সচিবালয়ের অফিসে ঘোরানো হ'তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ববঙ্গ সচিবালয়ের সমস্ত কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়ে হিন্দুদের উপর বদলা নেওয়ার শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল করে পথে বেরিয়ে পড়ল। এক মাইলের কিছু বেশী দূরত্ব অতিক্রম করতে না করতেই মিছিলের আকার ও আয়তন বৃদ্ধি পেতে লাগল। বেলা ১২টায় ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত গিয়ে মিছিল শেষ হল। সেখানে এক জনসভায় আমলাগণসহ কতিপয় বক্তা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষণ দিলেন। পুরো খেল্‌টার মজা এইখানে যে, যখন গোটা সচিবালয়ের সমস্ত কর্মী কাজ ফেলে রেখে মিছিলে যোগদান করার জন্য বেরিয়ে পড়ছিল, তখন ঐ বাড়ীরই একটি কক্ষে পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব তাঁর প্রতিপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের সঙ্গে বসে, কিভাবে উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করা যায় তারই পন্থাপদ্ধতি নিরূপণ করতে ব্যস্ত ছিলেন।" (ঐ)

সরকারী কর্মীরা মদত দিল লুটেরাদের

"বেলা প্রায় ১টার সময় সারা ঢাকা শহর জুড়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। শহরের সবখানেই হিন্দুর ঘর-বাড়ী ও দোকান লুট ও অগ্নিসংযোগ পুরোদমে চলল। যেখানেই পেল হিন্দুদেরকে ধরে ধরে হত্যা করতে লাগল। এমনকি মুসলমানদের কাছ থেকেই আমি সাক্ষ্য পেলাম যে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের চোখের সামনেই অবাধে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতেই সোনার দোকানগুলি লুট হল। লুটতরাজ বন্ধ করার চেষ্টা না করে তারা শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল তা নয়, দুষ্কৃতিকারীদের বুদ্ধি জুগিয়ে, কৌশল শিখিয়ে, লুটতরাজের অভিযান পরিচালনা করল। আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে; ঐদিন অর্থাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০-এর বিকেল পাঁচটার সময় আমি ঢাকায় পৌঁছলাম। আপন মহল্লের লোকজনের নিকট সান্নিধ্যে থেকে নানা দুঃখজনক ঘটনা স্বচক্ষে দেখলাম, স্বকর্ণে শুনলাম। বড়ই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। নিজের চোখে দেখা, অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা অত্যাচারের সেসব, বীভৎস কাহিনী বড়ই হৃদয়বিদারক।"

(যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের পাক-মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ পত্র থেকে গৃহীত)

দ্বিতীয় অধ্যায়

তিন দিনের দাঙ্গায় ঢাকা শহর ধ্বংস

বরিশালের কথা আপাতত থাক। আগে ঢাকা শহরের কথা শেষ করি। তৈমুর লঙ, নাদির শাহের হাতে দিল্লী ধ্বংসের কাহিনী আমরা ইতিহাসে পড়েছি। কিন্তু হিন্দুদের শ্রমে ও অর্থে গড়া ঢাকা শহরে হিন্দু আধিপত্য মাত্র তিন দিনের দাঙ্গায় যেমন অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয়ভাবে খতম করা হল, তার তুলনা ঐ তৈমুর ও নাদিরশাহী কান্ডের সঙ্গেই চলতে পারে। ঢাকা শহরে হিন্দু আধিপত্য নিশ্চিহ্ন করার চিত্র ও পরিচয় মেলে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণী ও সারণী থেকে :—

NON-MUSLIM IN DACCA.

Dacca is the biggest city of East Bengal and oldest too. Before partition nearly 58.5 p. c. of the total population of the city were Hindus. Of the 17 elected commissioners of the city, 10 were Hindus and 7 Muslims. More than 85 p. c. of the properties of the city–its buildings. shops, bazars–belonged to the Hindus. But now ? The following charts will speak for thamselves.*

Non-Muslim Holdings.

The first chart depicts how many Hindu holdings were in the city befor partition and how many are still there in the possession of Hindus. The places selected in the chart were exculsively Hindu elakas before partition. Here in the chart, a 'family' means a group of Hindus living with one or two elderly women in each holding and 'without family' indicates only male members.

(Exclusively Hindu Elakas)

Name of Place	Before Partition	After Partition		Total Hindu Holdings at present
	Total Hindu Holding	With Family	Without family	
1. Tikatully & Gopibag	430	6	21	27
2. Gandaria	731	12	22	34
3. Armanitola & Nalgola	773	6	12	18
4. Nawabpur Rd.	274	8	14	12
5. Banagram	272	58	21	19
6. Lalchan Mukim Lane	74	Nil	8	8
7. Thatari Bazar	133	Nil	15	15
8. Juginagar	91	Nil	14	14

Contd.

9. Malitolla & Purana Mughaltuly	251	Nil	Nil	Nil
10. Dakshin Maisundi	182	14	12	26
11. Swamibag	77	Nil	Nil	Nil
12. Wari	450	12	25	37
13. Purana Paltan & Segun Bagicha	252	1	7	s
14. Kulutolra	110	52	12	64
15. Banianagar	360	42	26	68
16. Lalbag Elaka	580	80	26	108
17. Bairagitola	214	29	25	54
18. Pyaridas Rocd	97	16	15	sl
19. Goalnagar	82	35	6	41
20. Tantibazar Elaka	573	108	50	158
21. Sangatola	49	3	6	9
22. Srdgtola	68	25	Nil	25
23. Digbazar	35	3	2	5
24. Laxmibazar Elaka	78	9	1	10
25. Sankbari Bazar	936	54	17	71
	7175	**573**	**347**	**920**

An analysis cf these figures will show that out of 7175 Hindu holdings of exclusively Hindu elakas only 12.7% or 920 holdings are still in possession of the Hindus. Again out of these 920 holdings, there are only one or two elderly women members in each of 573 holdings, and in the rest of 347 holdings, only male members, living as caretakers, are to be found.

There were large number of Hindu-Muslim mixed elakas and small Hindu-pockets in the city. But now Hindus of those places have been completely replaced by Muslims.

Nearly 90 p. c. of the Hindu citizen of Dacca have migrated to Indian Union. In some houses one or two elderly Hindu women may be found out but not young women, married or unmarried. Youngmen have also migrated to India almost en masse. Hindus living in the city, now consists mainly of aged guardians who, after sending their wards to other side of the border, are staying there temporarily for the purpose of carrying on their professions as teachers, professors, doctors, lawyers, traders, businessmen etc., so long they are not able to find out an alternative provision in West Bengal or in some other places in India.

Student Population.

What is tne position of the student population of the city ? Educational institutions, having overwhelmingly Hindu Students in prepartition days, in which only predominantly Hindu Institions have been included, will clearly show in what numbers the Hindu guardians of Dacca, have transferred their boys and girls to West Bengal and Assam and other parts of India.

STUDENTS POPULATION
A–BOYS SCHOOLS

Name of School	Before Partition (1947)			After Partition but before Feby. Riot. (1950 Jan)			At present (Dec. 1950)		
	Total	Hindu	Muslim	Total	Hindu	Muslim	Total	Hindu	Muslim
Priyanath	528	472	56	303	187	106	125	9	114
Pogose	870	728	142	720	580	149	224	50	171
Jubili	726	646	80	804	719	85	183	52	131
Gandaria	380	370	10	335	245	90	230	10	220
East Bengal	357	357	Nil	294	204	90	101	16	85
Navakumar	387	316	71	169	51	118	151	5	146
Total	**3240**	**2889**	**359**	**2635**	**1996**	**631**	**1014**	**142**	**870**

STUDENTS POPULATION
B–GIRLS SCHOOLS

Name of School	Before Partition (1947)			After Partition but before Feby. Riot. (1950 Jan)			At present (Dec. 1950)		
	Total	Hindu	Muslim	Total	Hindu	Muslim	Total	Hindu	Muslim
Nari Siksha	600	597	3	394	275	119	82	8	74
Banglabazar	751	722	29	684	606	78	46	2	44
Anandamoyee	350	320	30	180	75	105	120	5	115
Gandaria	450	435	15	257	227	30	125	10	115
Total	**2151**	**2074**	**77**	**1514**	**1183**	**332**	**373**	**25**	**348**
C – Jagannath College									
	1091	835	156	1441	403	1038	905	41	864

The Chart reveals that student roll of the six almost exclusively Hindu private schools, has fallen from 3240 to 1014 and out of 2889 Hindu students only 142 or 4.4% students are still remaining in the city to fill up the vacant benches of these schools.

Total number of students in the predominantly Hindu girls schools were 2151 in prepartition days. But now it is only 373. And out of 2074 Hindu girls only 1.2% or 25 minor Hindu girls are still to be found in these schools. Even before February killing of 1950, there were 1183 Hindu girls in these schools.

In 1947, out of 1091 students in Jagannath College, the only big private college of the city, 835 were Hindus. Now there are only 41 or 3.6%, Hindu students in this college, all of whom are examinees waiting to shift to Inian Union, as soon as their examinations are completed.

Dacca University included 2257 students in its roll in January 1950, of which only 7.1% or 162 were Hindus. In prepartition days of 1947, nearly 65 p.c. of the students belonged to Hindu community but now out of nearly 1500 students of the University their strength is only 12, all examinees, waiting to migrate to Indian Union after examinations.

In Medical and Engineering Schools and Colleges, one would not find even half a dozen students belonging to non-Muslim community.

Bar Association.

Figures of Bar Association will indicate the position of politically conscious Hindus of Dacca. Before partition members of Dacca Bar numbered 310, of which 280 were Hindus. In the month of January 1950, its strength reduced to 239 still 198 being Hindus. At present. out of total 160 members, of Dacca Bar only 96 are Hindus. Again out of these 96 members, excepting 4 or 5 gentlemen, all of the Hindu lawyers have shifted their families to Indian Union.

Hindu Business.

Trade and business of Dacca were overwhelmingly in the hand of Hindus but their present position will be evident from the following figures.

Hindu Shops

Sl No.	Name of Road	Total Nûmber	No. of Hindu Shop at Present
1.	Nawabpur Road	470	45
2.	Madan Basak Road	105	2
3.	Farashganj	120	33

4.	Bangla Bazar	65	15
5.	Wiseghat	51	11
6.	Patuatully	356	28
7.	Mitford Road	264	11
8.	Thataribazar	76	7
9.	Shambazar	92	5
		1499	157

The business and shopping centres mentiones in the chart exclusively belonged to Hindus in pre-partition days. But now out of 1499 shops, only 10.5% or 157 are still in the hands of the Hindus. The future of these remaining Hindu shops are very uncertain as selling of Hindu concerns to Muslims are going on unceasingly in Dacca as in other parts of East Bengal.

Dacca had two very old cottage industries—Conch-shell and Dacca-e-muslins—almost dated back from twelvth century. Two classes of people, called 'Sankharies' and 'Basaks' grew out of these 'Sankha' and 'Muslin' industries. The main bulk of Hindu populace of Dacca consisted of these two classes of people. These very old citizen of Dacca, who successfully survived the stormy days of Pathans, Mughals and Nawabs of Bengal, could not withstand the fury of the twentieth century state of Pakistan. After last February killing, 90 p.c. of these Basaks and Sankharies have migrated to Indian Union.

Temples and Religious Festivals.

Dacca was specially famous for its temple and Hindu festivals. To Vaishnavas, Dacca was second 'Brindaban.' A small city like Dacca contained as many as 700 Vaishnava temple, along with many 'Kali-temples' and some 'Gurdwaras'. Some of these temple were established during the days of Pathans and Mughals. A large number of these temples have been destroyed, defiled or looted during February riot. Some 26 important temples, including welknown Tokani Pal's temple, Madan Gopalji, Hayagribaji, Shamrajji, Gopinathli, Kalachandgi, Balaramji and other temples are still under Muslim occupation. People of East Bengal, as of Dacca are overwhelmingly Vaishnava. They could pursue their religious life, various Vaishnavic rituals, ceremonies and festivals, unhindered even during the days of Pathan and Mughals rules. But three years of Pakistan have made them so much terrorised, that while migrating to Indian Union they have taken away with them 90 p.c. of their 'Vigrahas' and deities. Innumerable Hindu temples are still lying empty and vacant in the city of Dacca.

Janmastami Michhil, Ratha Jatras and Jhulans were some of the very old

religious festivals of Vaishnavas of Dacca. Janmastami Michhil was nearly 300 years old in its origin. Every year, on the occasion the Michhil, consisting of two grand religious processions of Hindus, several lakhs of people were seen to assemble in Dacca from various parts of East Bengal. But this Janmastami Michhil had to be abandoned in the very first year of Pak-rule in E. Bengal. In older days large number of Muslims of the city used to cooperate and participate actively in this Michhil but the hostile attitide of the Muslims today compelled the Hindus to give up their centuries old religeous custom.

Every year, Hindu localities of Dacca would have been humming in music, Jatras, dances, Kirtans along with spectacular display of illumination, during Jhulan Jatra festivals but this year Jhulan Jatra passes off almost without any notice at all.

Rathajatra was another special festival of Dacca Hindus. Bearly 45 Rathas used to come out in the street of the city. But this year no Rathajatra was observed excepting in the village of Dhamrai situated 20 miles away from Dacca.

This is a nutshell is the factual position of non muslims in Dacca-a city which contained 58.5 p.c. Hindu population and whose predominance was manifest in every aspect of the city life before partition.

(Non-Muslims Behind the Curtain
of East Pakistan : Prof. Samar Guha)

তৃতীয় অধ্যায়

মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বরিশাল গিয়ে কি দেখলেন?

"সেখানে গিয়েই সব অবস্থা স্ব-চোখে দেখে ও জীবিত আত্মীয়স্বজনের কাছে পূর্ণ বিবরণ শুনে তাঁর এতকালের সযত্নে পোষিত মুসলিম লীগের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের মোহমুক্তি ঘটে। তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও তাঁর সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে যাঁর কাছেই খোঁজ করেন তাঁর কাছ থেকেই শোনেন—'নাই, নাই, নাই', আর শোনেন, চার দিকেই বুকফাটা আর্তনাদ ও মর্মভেদী হাহাকার! তিনি বরিশালে গিয়ে দেখেন, তাঁর সমাজের বস্তিগুলোর শ্মশানের দৃশ্য। বাড়ি নেই, ঘর নেই, নেই বলতে কিছুই নেই; আছে শুধু-ছাই, আর ছাই!" (পাক ভারতের রূপরেখা—প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী)

যোগেন্দ্রবাবুর নিজের কথায়

বিচিত্র তথ্য— প্রায় ১০,০০০ মৃত

"ঢাকায় নয়দিন অবস্থানকালে আমি ঢাকা ও তার সন্নিহিত এলাকার প্রায় সব দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করি। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে শতশত নিরপরাধ হিন্দুর হত্যালীলার সংবাদে আমাকে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত করল। ঢাকা দাঙ্গার ২য় দিনে আমি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। জেলা সহরগুলিতে, মফস্বলে এবং গ্রামাঞ্চলে যাতে দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে না পড়তে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে জেলা কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে তৎক্ষণাৎ জরুরী নির্দেশ পাঠাতে অনুরোধ জানালাম তাঁকে।"

যোগেন্দ্র বাবুর অনুরোধের কি ফল ফলল?

'ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ আমি বরিশাল পৌঁছলাম এবং সেখানকার দাঙ্গার ঘটনাবলী জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেই জেলা সহরে প্রচুর হিন্দু বাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। এই জেলার প্রায় প্রত্যেকটি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকা আমি পরিদর্শন করি। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না কি করে জেলা শহর থেকে মাত্র ৬ মাইল পরিধির মধ্যে মোটর রাস্তা দ্বারা যুক্ত কাশীপুর, মাধবপাশা এবং লাকুটিয়ার মত স্থানেও মুসলিম দাঙ্গাবাজরা বীভৎস তাণ্ডব সৃষ্টি করতে পারে! মাধবপাশার জমিদার বাড়ীতে প্রায় ২০০ জনকে হত্যা ও ৪০ জনকে আহত করা হয়। মূলাদি নামক একটি স্থানে নরকের বিভীষিকা নামিয়ে আনা হয়। স্থানীয় মুসলমান এবং অফিসারদের বক্তব্য অনুযায়ী একমাত্র মূলাদি বন্দরেই ৩০০ জনের বেশী লোককে হত্যা করা হয়। মূলাদি গ্রাম পরিদর্শনকালে আমি স্থানে স্থানে মৃত ব্যক্তিদের পড়ে থাকতে দেখেছি। দেখলাম নদীর ধারে ধারে কুকুর-শকুনেরা মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমি জানতে পারলাম, সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে পাইকারীভাবে হত্যা করার পর সব যুবতী নারীকে দুর্বৃত্তকারীগণের সর্দারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। রাজাপুর থানার অন্তর্গত কৈবর্তখালি গ্রামে ৬৩ জনকে

হত্যা করা হয়। ঐ থানা অফিসের অনতিদূরে অবস্থিত হিন্দুর বাড়ীগুলি লুট করে জ্বালিয়ে দিয়ে গৃহবাসীগণকে হত্যা করা হয়। বাবুগঞ্জ বাজারের সমস্ত হিন্দুর দোকান প্রথমে লুঠ করে পরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণ যা হাতে এসেছে, তা থেকে খুব কম করে ধরলেও একমাত্র বরিশাল জেলাতেই হত্যা করা হয়েছে ২৫০০ জনকে। ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার বলির সংখ্যা মোট ১০,০০০ হাজারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। এক সত্যিকারের গভীর দুঃখে আমি কাতর হয়ে পড়তাম। প্রিয় পরিজন-স্বজন হারানো নারী-পুরুষ ও শিশুদের সব-হারানোর কান্না-বেদনা-বিলাপে আমার ভগ্ন হৃদয় হাহাকার করে উঠল। আমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, "পাকিস্তানে ইসলামের নামে এসব কি চলছে!" (পাক-মন্ত্রীসভা থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ পত্র থেকে)

যোগেন্দ্র মণ্ডল দীর্ঘকাল মুসলিম লীগের সঙ্গে সহবাস করেছেন। নোয়াখালি দাঙ্গার সময় তিনি সুরাবর্দী মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন এবং নোয়াখালি গিয়ে মুসলিম লীগের গুণ্ডাদের হাতে স্বজাতি নমঃশূদ্রদের নির্যাতন ও লাঞ্ছনা দেখেও লীগ সরকারের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। এখন ইসলাম ধর্মবলম্বীদের জান্তব চরিত্র ও পাশবিক আচরণ দেখে তার অবাক হওয়া সাজেনা। তিনি ইসলাম ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারেন; কিন্তু ভারতে সাতশ' বছর ইসলামী শাসনের স্বরূপ তো তার অজানা থাকার কথা নয়। অথচ রাজনীতির সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সামান্য কথায় মুসলমানদের যে অসামান্য চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তার জবাব নেই!

শরৎচন্দ্রের কলমে মুসলমান চরিত্র

"একদিন মুসলিমরা লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়ে দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুস্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া, কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভূষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরদোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই-সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিবে না।

কিন্তু, কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি

লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশী তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কাল্‌চার হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না। হিন্দু নারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুঝিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমারাও লেগে যেতে পারি।"

(শরৎ সমিতি প্রকাশিত শরৎ রচনাবলী-৩য়খন্ড, ৪৭২-৭৬পৃ:)

ঢাকার ধ্বংস সাধনের পর্ব শেষ না হতেই মুসলিম গুণ্ডাদের কুনজর পড়ল সুখী সমৃদ্ধ বরিশাল জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর। সম্পূর্ণ সরকারি প্ররোচনা ও পরিকল্পনা মাফিক ঢাকা দাঙ্গার তিন দিন পর ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ তারিখ থেকে বরিশালের শহরে গ্রামে ইসলামী বর্বরের দল নৃশংসভাবে হিন্দুসম্প্রদায়ের সার্বিক বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হল। মহম্মদের অনুচর, ঘুরী-নাদিরশাহদের হিংস্রতার সঙ্গেই এসব ধর্মান্তরিত বাংলাভাষী নরঘাতকদের তুলনা চলে। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যে বলেছেন, "আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্মত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোষাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে; ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়েছে যে আর চিনিবার জো-নাই। ....উগ্রতায় ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।" বাঙালী হিন্দু অতীতের কথা দূরে থাক, ১৯৪৬ সাল থেকে বারবার তার পরিচয় পেয়েছে।

'জয়শ্রী'র সাংবাদিক জয়ন্ত দাসগুপ্ত বরিশাল জেলার ৫০-এর দাঙ্গা সম্পর্কে লেখে গেছেন:

পূর্ব বাংলায় হত্যালীলার মর্মন্তুদ কাহিনী
(বরিশাল)
জয়ন্ত দাসগুপ্ত

[মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে হত্যালীলা ও লুণ্ঠনের উন্মত্ততা ছড়িয়ে পড়ল। নিরীহ অজ্ঞ অশিক্ষিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান জনসাধারণের ওপরে যে পাশবিকতা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটন কোনদিনই হবে না। যতটুকু জানা গেছে তার কাহিনীও প্রকাশ সম্ভব নয়। শুধু দৃষ্টান্ত বা নমুনা হিসাবে দুচারটা ঘটনার বর্ণনা এখানে দেওয়া হল।]

বরিশাল! অশ্বিনী দত্তের বরিশাল! দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্মভূমি পুণ্যে বিশাল বরিশাল! এক লহমায় বরিশালের উজ্জ্বল ঐতিহ্যকে উন্মত্ত বর্বরতা অন্ধকারে ডুবাইয়া দিল। এখানে জনসাধারণের শতকরা ৮৫ জন মুসলমান। যে মুসলমান চাষী ও গরীবের জন্য অশ্বিনীকুমারের প্রেম সতত উচ্ছলিত হইত, যে ৮৫ জনের জন্যে বরিশালের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সার্থকতা তারা কোন্ দানবীয় প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত পশুদের মত হিন্দু খৃষ্টান সকলকে আক্রমণ করিয়া বসিল! ঢাকায় ১০ই থেকে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ। পূর্ববঙ্গ সরকার এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা কঠোর ব্যবস্থায় হাঙ্গামা বন্ধ করা তো দূরের কথা,—চক্ষু বুজিয়া থাকিলেন এবং উন্মত্ত বর্বরতা অবাধে গ্রামে গ্রামে রক্তস্রোত বহাইয়া চলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি, এ, ফারোকী কী করিতেছিলেন? কিছুদিন আগে হইতেই হিন্দুবিদ্বেষ তীব্র করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাপক প্রচার চলিতেছিল। মুদ্রামূল্য-সংকট ও পাটসংকট জনতাকে পাক সরকারের প্রতি সন্দিগ্ধ, প্রতিকূল করিয়া তুলিতেছিল, সেই ধূমায়িত অসন্তোষকে অন্যখাতে চালাইয়া মন্ত্রীত্বরক্ষার প্রয়াসও জোর ধরিতেছিল। মোল্লা ও মৌলবীর দল গ্রামে গ্রামে মসজিদে মজলিশে গুজব ছড়াইয়া কলিকাতার প্রতিহিংসা নিবার জন্য উস্কানী দিতেছিল। শোনা গিয়াছে মন্ত্রী জনাব তোফাজ্জল আলি কিছুদিন আগে পটুয়াখালি ও বরিশাল সহরে আসিয়া সভা করিয়া কলিকাতায় মুসলীম-ধ্বংসের প্রতিশোধে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। 'নকীব' নামে স্থানীয় পত্রিকা কলিকাতায় মুসলীম নিধনের খবর বড় বড় শিরোনামায় ছাপাইতেছিল। চারিদিকে থমথমে ভাব, মুসলীম জনতার হিংস্র মূর্ত্তির আভাস দেখা যাইতেছে। হিন্দুরা কেউ কেউ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এদিকে নজর দিতে বলায় তিনি উল্টো হিন্দুদের দোষ দিলেন, হিন্দুরা কেন কলিকাতার মুসলীম-নির্যাতনের প্রতিবাদ করে না?

১৩ই বিকালে টাউন হলের সভা

ফলে বার লাইব্রেরীতে ১১ই ফেব্রুয়ারী এক ঘরোয়া সভা ডাকা হইল। সেই সভায় জেলা মুসলীম লীগের সম্পাদক (মিঃ মহীউদ্দিন!) হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষা ব্যবহার করেন। কংগ্রেসের শ্রীসতীন সেনের কলিকাতা থেকে মুসলীম নির্যাতন বন্ধের চাপ দিতে হইবে, দাবি হইল। ১৩ই সোমবার টাউল হলে লীগ সেক্রেটারী মহীউদ্দিন তীব্রভাষায় হিন্দুদের প্রতিশোধ লইবার আমন্ত্রণ জানাইলেন। কলিকাতার কল্পিত অত্যাচারের ও ফজলুল

হকের হত্যার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইল। ভূতপূর্ব ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট হাসানালি মীরও বক্তৃতা করেন। শ্রীসরল দত্তের ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ ফেনায়িত উত্তেজনার মধ্যে ডুবিয়া গেল। গরম বক্তৃতার ফলে আবহাওয়া উত্তপ্ত হইল এবং হিংস্র উন্মত্ততা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যায় ফাটিয়া পড়িল হত্যা, লুন্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডে। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফারোকী তখন কোথায় এবং কী করিলেন? চারদিন যাবৎ ঢাকায় ও ট্রেনে স্টীমারে বিমানঘাটিতে নরকলীলা চলিয়াছে, তাহা জানিয়াও ১২ইর মিছিল ও ১৩ই সভা করিয়া হত্যাকাণ্ডের ভুমিকা রচনার সুযোগ তিনি দিলেন কেন? সভায় আই-বি পুলিশের রিপোর্টার ছিল, কর্তৃপক্ষ এইসব উত্তেজক বৃক্ততার কথা জানিয়াও লক্ষ্য করিলেন না কেন? ইহাতে সমস্ত ব্যাপারই পূর্ব-পরিকল্পিত বলিয়া মনে হয় না কি?

১৩ই, ১৪ই, ১৫ই বরিশাল শহরে ও শহরতলীতে

রাত্রি ৯টায়ই চারদিকে তুমুল 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। চারদিকে আগুনের শিখা। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ এবং "বাঁচাও, বাঁচাও" চীৎকার। আলকান্দা, চকবাজার, ফকীরবাড়ী, নবগ্রাম রোড, সর্বত্র লুঠ, হত্যা, আগুন দেওয়া চলিল। আলকান্দার মসজিদের পিছে সুরেন দত্তের বাড়ী আক্রান্ত ও ১০।১২ খানা টিন-ঘরে আগুন জ্বলিল। মেয়েরা জগদীশ থিয়েটারের মালিক উপেন গুপ্তের বাড়ী আশ্রয় নিল। বিরাট 'রায় হাউস' লুণ্ঠিত ও মালিক নিহত, অন্যেরা পলাইল। শোলনা গ্রামের পথে অজিত রায় উকীলের মুহুরি নগেন রায় ছুরির আঘাতে হত। ষ্টীমারঘাটে বহু লোক ছুরিকাঘাতে হতাহত। সদর রোডে ষ্টীমার কোম্পানীর হেত ক্লার্ক নিহত। ফরিয়াপটিতে চালের গুদামগুলি লুঠ ও ভস্মীভূত। শিক্ষয়িত্রী এক মহিলা নাজিরপুলে লুণ্ঠিত বাড়ীতে ছুরিকাহত হইয়া মরণাপন্ন। কালীবাড়ী রোডেও লুঠ, হত্যা ও আগুন। যাহারা পারিল পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রয় নিল। ১৪ই বি এম কলেজে ৫।৬ হাজার ও থানায় ২।৩ হাজার ভয়ার্ত নরনারী আসিয়া ভীড় করিয়াছে। সেখানে পৌর-চেয়ারম্যানের পারমিট ছাড়া কাহাকেও যাইয়া লাঞ্ছিতদের সঙ্গে দেখা ও কথা বলিতে, খবর জানিতে দেওয়া হইতেছে না। ১৫ই কাশীপুরে ১৪ই রাত্রিতে চারদিকে আগুন ও হট্টগোল শুনিয়া ভয়ে সকলে বদ্ধদ্বার ঘরে জাগিয়া কাটাইল। ১৫ই প্রাতে শোনা গেল আজ কাশীপর লুঠ হইবে। সকালে স্থানীয় পুলিশ সেকশনে যাইয়া হন্তদন্ত হইয়া সাহায্য চাওয়া হইল; কিন্তু দারোগা স্পষ্ট বলিলেন, তিনি সাহায্য দিতে অপারগ। গ্রামবাসীদের অনুরোধে হেডমাষ্টার প্রবীন সারদাপ্রসন্ন গুহ ও রিটায়ার্ড দারোগা মনোরঞ্জন বসু বরিশালে এস্-পি ও কোতোয়ালির দারোগার সঙ্গে রক্ষাব্যবস্থার আবেদন লইয়া রওনা হইলেন। কিন্তু পথে কয়েকজন মুসলমান তরুণ সাইকেলে আসিয়া আক্রমণ করিল। টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া দুর্বৃত্তেরা সারদাবাবুকে ও মনোরঞ্জনবাবুকে গুরুতরভাবে ছুরি মারিয়া রক্তাক্ত অবস্থায় রাখিয়া শহরের দিকে চলিয়া গেল। যাইবার কালে বলিল, 'সারা! চল্'। বহু স্থানীয় মুসলীম ডিঃ-বোর্ডের সড়কে দিবালোকের এই ঘটনা দেখিল, তারা সারদাবাবুদের সাহায্য করিতেও আসে নাই। দুর্বৃত্তদের সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়াও নড়িল না। বন্দুকধারী পুলিশ ছিল, সেও আসিল না। শহরে যাওয়া হইল না। গ্রামে এ খবরে দারুণ আতংক হিন্দুদের মধ্যে। রাত্রিতেই

গ্রামে দলে দলে গুণ্ডা আসিয়া লুঠ ও হত্যা চালাইল। কান্নার রোল উঠিল। যারা জঙ্গলে পলাইল বাঁচিল। পুরোহিত রাজেন্দ্র আচার্যকে হত্যা করিয়া তাহার ছিন্ন মস্তক এক ফুলগাছে লটকাইয়া রাখিল্। ব্যাপক নারীহরণ, নারীধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড, ধর্মান্তকরণ— কাশীপুরকে নরক করিয়া তুলিল। নারায়ণপুরেও এই একই কাণ্ড। অশীতিবর্ষ ডাঃ শরৎ সেনকেও দিনেদুপুরে অন্যান্যের সহিত হত্যা করিয়া নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা করিল।

মাধবপাশার নারকীয় ঘটনা ১৭ই ফেব্রুয়ারি

১৬ই থেকে ২৩শে হত্যাকাণ্ড লাকুটিয়া, শরষি, মাধবপাশা, রহমৎপুর, রাজপুর, মুলাদি প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। মাধবপাশা, ও মূলাদি গ্রামে যাহা ঘটিয়াছে তাহার নির্লজ্জ পাশবিকতা বরিশালের মুসলমান সম্প্রদায়কে চিকালের জন্য কলংকভাগী করিয়া রাখিবে। ১৫ই হইতেই চারপাশের গ্রামগুলি হইতে ভীত সন্ত্রস্ত নরনারী জলস্রোতের মত মাধবপাশায় আসিয়া আশ্রয় নিতে লাগিল জমিদার বাড়ীতে। রায়-চৌধুরীরা পুরানো জমিদার, বড় বড় পাকা দালান তাদের। সেখানে হাজার হাজার আশ্রয়ার্থীর ভীড় হইল। বুধবার ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতেই মুসলীমরা বলিতেছিল, 'আপনাদের বাড়ী গণ্ডগোল হইতে পারে, তবে ভয় নাই আমরাই রক্ষা করিব'। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই হিন্দু ও মুসলীম মিলিয়া রক্ষীদল গ্রাম পাহারা দিতে লাগিল। অন্যান্য বাড়ী থাকিলেও তিনটি বড় বাড়ীতে— প্রেমলাল ও বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরীর এবং প্রফুল্লবালা চৌধুরাণীর বাড়ীতে—সকল হিন্দুকে সমবেত করিয়া পাহারা দেওয়া হইল। কোঠার মধ্যে নারী ও শিশুরা এবং ছাদে, সিড়িতে ও বাহিরে পুরুষেরা। আক্রমণ হইলে বাধা দিবার জন্য পুরুষেরা প্রস্তুত হইল।

ভোলানাথ রায়ের চাকর মজাফর কাজী রক্ষা বাবদ ১০০ টাকা চাহিল, ২৫ টাকা দেওয়া হইল। বৃহস্পতিবার দলে দলে আশ্রয়প্রার্থী হিন্দু আসিল। বৃহস্পতিবার (১৬ই) ডি-এম'র কাছে টেলিগ্রাম করা হইল গার্ডের জন্য। জবাব নাই। বারবার পুলিশ রক্ষীর আবেদন ব্যর্থ হইল। বেলা ৫।৬টার সময়ে পাংশা গ্রামের নেতা কাঞ্চন মোল্লা আসিয়া বলিল, 'যা শুনিতেছি তাতে আপনাদের রক্ষা করিতে পারি এমন ক্ষমতা নাই। তবে যদি কিছু টাকা দেন তবে রক্ষা করিতে পারি।' 'কতটাকা?' '২৫০০০ টাকা'। 'কাল টাকা দিব, আজ কিছু লও'। কাঞ্চন মোল্লা ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যায়। রাত্রি ৮টায় এই কাঞ্চন মোল্লাই দলবল সহ বাজার আক্রমণ করিল। হিন্দুরক্ষী দল পিছে হটিয়া আসে বরিশাল হইতে ক'জন পুলিশ আসে, তারা শোলনা গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প ছিল, সেখানে গেল। পুলিশ আসায় দুর্বৃত্তেরা পলাইয়া যায়। কিন্তু গ্রামবাসীদের কাতর অনুরোধেও পুলিশ গ্রামে আসিতে রাজি হইল না, ক'জন বাজারে শেষরাত্রি পর্যন্ত থাকিয়া চলিয়া গেল। গ্রামবাসীরা ভয়ে অর্ধমৃত হইয়া রহিল। কখন আক্রমণ হয় কে জানে। বৃহস্পতিবার গেল। শেষরাত্রি ৪টায় সময়ে বরিশাল হইতে মিঃ ফারোকী, জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নেহাজ, সদর এস্‌ডিও, গৌরনদীর সার্কেল অফিসার, ভূতপূর্ব্ব আই-সি-এস্ পাদ্রী (নোয়াখালীর দাঙ্গাকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট) মিঃ ম্যাকিনার্ণী, এডিঃ এস-পি মিঃ আর খান প্রভৃতি সদলবলে আসিয়া উপস্থিত। জমিদার বাড়ীতে বসিয়া গ্রামবাসীরা কাতর আবেদন করিল রক্ষীর জন্য। মিঃ ফারোকী বরিশাল ফিরিয়া সকালবেলাই

পুলিশ পাঠাইবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। কয়েকজন দুর্বৃত্তের নামও এস-পি লিখিয়া নিলেন। কিন্তু কোন প্রতিকার হইল না, গুণ্ডাদের গ্রেপ্তারও করা হইল না। প্রতিশ্রুত সাহায্য বা পুলিশ আর সারা দিনেও আসিয়া পৌছিল না। ইতিমধ্যে প্রাতঃকালেই আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড শুরু হইয়া গেল। ম্যাজিস্ট্রেট যেন জানিয়া শুনিয়া শত শত লোকের হত্যার সুযোগ দিলেন। দুই হাজার আতঙ্কগ্রস্ত নারী ও শিশুকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া দিয়া ম্যাজিস্ট্রেট চলিয়া গেলেন।

ম্যাজেস্ট্রেট চলিয়া যাইবার কিছু সময় পরেই শুক্রবার (১৭ই) বেলা ৮টার সময় চারদিক হইতে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি উঠিল। ভয়ে সকলেরই প্রাণ শুকাইয়া গেল। ৯টার সময়ে চারদিকে হইতে ১৫০০।২০০০ মুসলমান তরবারি, লাঠি ছোরা, শড়কি প্রভৃতি মারাত্মক, অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তিনটি জমিদার বাড়ী ঘিরিয়া আক্রমণ করিল। বৈদ্যনাথবাবুর বাড়ীতে ৬০০, এবং প্রফুল্লবালার বাড়ীতে ৫০০ হিন্দু আশ্রয়ার্থী। মুসলমানদের অনেকের পায়ে ঘুংঘুর। উল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া তারা চীৎকার করিতেছে, হিন্দুর কেল্লা চাই, রক্ত চাই, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, 'মুসলমান হও, তবে বাঁচিবে' ইত্যাদি। আত্মরক্ষায় ছাদের উপর হইতে হিন্দুরা ইট ছুঁড়িতে লাগিল, পুলিশ আসিয়া পড়িলে রক্ষা পাইবে এই আশায়। এইভাবে প্রায় এক ঘন্টা কাটিল। তখন দুর্বৃত্তেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঢুকিয়া পড়িতেছে; মেয়েরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রেমবাবুর ছাদ হইতে প্রেমবাবু, ও তার পরিবারবর্গ (পুত্র মাণিক, পান্না, চুনি, নিতাই, স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধু প্রভৃতি নয় জন) নামিয়া আসিলে দুর্বৃত্তদের নেতা সিরাজ মৌলনা বলিল, ইহাদের এখন কাটিও না। মস্‌জিদে বিচার হইয়া পরে দেখা যাইবে। কয়েকজন ইহাদের লইয়া চলিল। তখন হিন্দুদের মারিয়া কাটিয়া, মেয়েদের উপর অত্যাচার করিয়া, সেখানে নরক সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুরা কাতর প্রার্থনা করিতেছে, 'আমরা মুসলমান হব। সম্পত্তি নিয়া যাও, প্রাণ রক্ষা কর।' বেলা ১টা ১।।০টায় হাঁটাইয়া প্রেমবাবুদের কুব্বাৎ আলির বাড়ী আনিল। রাত্রে সেখানে থাকিলে পরদিন মাধবপাশা স্কুলের সেক্রেটারী সরিফালী খন্দকারের বাড়ী ফুলতলা গ্রামে নিয়া কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিল। প্রেমবাবুর বাড়ীর অন্য সবাইকে পিঠমোড়া দিয়া বাঁধিয়া বাড়ীর সম্মুখে পথে বসাইয়া রাখিল। প্রেমবাবুর পরিবারবর্গ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরে উদ্ধার হইয়া বরিশাল আসে।

তখনো বৈদ্যনাথবাবুর বাড়ীর ছাদ হইতে হিন্দুরা আত্মরক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যে সদর ফাটক ভাঙ্গিয়া বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকিয়াছে গুণ্ডারা। ইষ্টকবর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা কবিবার জন্য তাহারা মাথায় দরজায় পাটা লইয়া অগ্রসর হইল। দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিল। উপায় না দেখিয়া ছাদ হইতে শত শত হিন্দু নামিতে লাগিল। মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল। দুর্বত্তেরা ভিন্ন গ্রামের একজন বৃদ্ধকে (যিনি নীচের তলায় ছিলেন) কাটিয়া দেহ মাটীতে ফেলিয়া ছিন্ন মাথা হাতে লইয়া নাচিতে লাগিল! গোবিন্দ সাহা, মাখন ঘোষ, পাঁচু রায়, হরকুমার রায়, সুরেন্দ্র রায় প্রভৃতি নামিয়া গেল। সুরেন রায় (৪৮) নামিয়া নীচে যাইয়া দুই হাত তুলিয়া কাকুতি করিলেন 'ভাই বাঁচাও।' কিন্তু এক কোপে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল, ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল, দেহটি মাটীতে লুঠাইয়া পড়িল। তাহার ছেলে অধীর (১৮) ছাদ হইতে এদৃশ্য দেখিল। দলে দলে দোতালায় ও ছাদে উঠিয়া রামদা দিয়া মাথা কাটিতে লাগিল। উমাচরণ শীল (৫৫) ও ফটীক চক্রবর্ত্তিকে (৫০) কাটিল। নারায়ণ চক্রবর্তি (৪৫), খুশাল শীল

(৪২), কালীচরণ বসাক (৫৫) প্রভৃতি বহু লোককে ছাদেই কাটে। একদল লোক লুঠ করিতেছে, মাথায় করিয়া জমিদার বাড়ীর মাল লইয়া যাইতেছে। অন্যেরা হত্যা চালাইতেছে। ছোট ছোট শিশুকে মায়ের বুক হইতে ছিনিয়া নিয়া আকাশে উর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দিতেছে, যখন তাহারা নীচে পড়িতেছে নীচে হইতে বল্লম লেজা উচাইয়া ধরিলে তাহাতে পড়িয়া কচি শিশুদের বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া মৃত্যু হইতেছে। ছাদ হইতে শিশুদের নীচে আছড়াইয়া ফেলিতেছে। এক এক জন হিন্দু হত্যা হইতেছে আর উল্লাসে পৈশাচিক চীৎকার উঠিতেছে। লুঠপাটের সঙ্গে দুর্বৃত্তেরা ৩০০ নারীকে নামাইয়া নিয়াছিল, তাহার মধ্যে সুন্দরী ও তরুণীদের বাছিয়া লইয়া গেল। তাহাদের খোঁজ নাই। বৃদ্ধা ও প্রবীণাদের বিকাল ৫টায় গালাগাল দিয়া ছাড়িয়া দেয়। বিপিন শীলকে আক্রমণ করিল তাহের খাঁ, নাজিমুদ্দিন প্রমুখ গুণ্ডারা। বিপিন জোয়ান এবং সে ধনুকবাণ দিয়া বাধা দিয়াছিল। সে মরিয়া হইয়া লাফাইয়া মাটীতে পড়িল এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তবু এক গুণ্ডা রামদার কোপে তার মাথা ছিন্ন করিয়া দিল। হরকুমার রায় প্রভৃতিকে নীচে সারি দিয়া রৌদ্রে বসাইয়া রাখিল। তার পুত্র সুখরঞ্জন (১৮) ও ভ্রাতুস্পুত্র অধীর (১৬) হইতে তাহের খাঁ ১৬০০ টাকা কাড়িয়া নিল। বালকেরা তাহের খাঁর কোমরে জড়াইয়া রহিল এবং তার ফলে প্রাণে বাঁচিল। সকলকে উলঙ্গ করিয়া সারিবদ্ধ মাটিতে বসান হইল। তিন শত নারীকে কাছেই আলাদা বসাইল। চার-পাঁচ জন মুসলমান পাজামা ও লুঙ্গি পরিয়া হাতে খড়গ লইয়া পায় ঘুংঘুর বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া হতভাগ্যদের কাটিতে লাগিল। প্রথমে হরকুমার রায়কে কাটিয়া ফেলিল। তার পরে নারায়ণ বণিকের (১৮ বছরের দশম শ্রেনীর ছাত্র) মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল। হরকুমারের পুত্র সুখরঞ্জনকে রামদা দিয়া কাটে, সে অপর মৃতদের নীচে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া থাকে (পরে বাঁচিয়া যায়), এরপরে সেই ঘাতকই অধীরকে কোপ দেয়, ঘাড় গভীরভাবে কাটিয়ে যায়; সে রক্তাক্ত হইয়া পড়িয়া যায় (পরে বাঁচে)। এদের ভাই সুশান্ত (৮) ও ভুবনমোহনকে (২৫) পরে কাটে। এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা সারিবদ্ধ হতভাগাদের বলি দিতে থাকে। গোপালকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল রায়, গোবিন্দ সাহা, কৃষ্ণ সাহা, যোগেশ সাহা কাটা পড়িয়াছেন। অদূরে মেয়েদের চোখের সমুখে ইহা ঘটে। জমিদার বাড়ীতে আশ্রয় প্রার্থীদের অধিকাংশ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মারা যায়। এক বৈদ্যনাথবাবুর দালানের সম্মুখেই ৩০০ মৃতদেহ এবং ১০০ আহত ছিল। এ ছাড়া পথে ঘাটে, সিঁড়িতে, ছাদে, ঘরে জঙ্গলে সর্বত্র মৃতদেহ স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া থাকে। মেয়েরা কতক জঙ্গলে পলায়। কতক আহতদের কাছে আসিয়া আত্মীয়দের সন্ধান করিতে থাকে। শত শত আহত বিনা ঔষুধে ও চিকিৎসায় সেদিন রাত্রে পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যায় ২ জন পুলিশ ও আনসার আসিয়া চেঁচাইয়া বলে, 'ডাকাতেরা চলিয়া গিয়াছে। রহমৎপুর ক্যাম্পে চল, সবাই বাহির হও, ভয় নাই।' তখন জঙ্গল হইতে ৭০০।৮০০ লোক দু'মাইল দুরে রহমৎপুর স্কুলে আশ্রয় নিল। আত্মীয়রা ঘুষ দিয়া কোন আহতকে পুলিশের সাহায্যে বরিশাল আনিল। বাকি আহতরা ৪।৫।৬ দিন সেই শূন্য প্রেতপুরীতে পড়িয়া রহিল। মৃতদেহ স্তূপে স্তূপে বহুদিন পর্যন্ত পড়িয়া রহিল। পরে বিরাট গর্ত্ত করিয়ে জমিদার বাড়ীতেই পুঁতিয়া ফেলা হয়। দালানে দালানে চাপ চাপ রক্তের দাগ এখনো সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষি দেয়। সেখানে শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডল গিয়াছিলেন, কী দেখিয়া আসিয়াছেন জনমানুষও তাহা জানে না। যাহারা

সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন লইয়া প্রাণে বাঁচিয়ে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে (রামলাল রায়, প্রেম রায়, ভোলানাথ রায় প্রভৃতি) তাহাদের মনে বিভীষিকা হইয়া এই হত্যাকাণ্ড চিরকাল জাগিয়া থাকিবে। কত লোক মরিয়াছে এবং কত নরনারীর সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার হিসাব কোনদিনই হইবে না। আজো যে সব নারী নিখোঁজ হইয়া নীরবে পশুদের বন্দী হইয়া অশ্রুমোচন করিতেছে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, তাহাদের সন্ধানই বা কে লয়?

মুলাদীর পাশবলীলা

ঢাকার খবরে উত্তেজনা। ১৪ই ফেব্রুয়ারি জিন্না ক্লাবে শান্তিসভায় মুসলমানরা প্রতিশ্রুতি দিল যে হিন্দুদের রক্ষা করা হইবে। এটা ভাঁওতা ও ষড়যন্ত্র। ১৫ই কাজিরচর ও খাসের হাট আক্রান্ত হইল। ১৬ই গভীর রাত্রিতে সতানী গ্রামে হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডের খবরের পর খবর আসিয়া হিন্দুদের ভয়ার্ত করিয়া তুলিল। মদন নন্দী ও তার ভাই লালুকে তাদের বাড়ীতে হত্যা করিয়াছে। ইহারা ধনী বারুই এবং মেয়েদের সরাইয়া দিয়া দুভাই বাড়ীতে ছিল। গ্রামবাসী হত্যার খবর থানায় জানাইলে দারোগা বলিল, 'পুড়াইয়া ফেল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, অসুখে মরিয়াছে।' দারোগার এই মনোভাবে ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। পাশের ইচলী, সতানী প্রভৃতি গ্রামের মেয়েদের মুলাদি বন্দরে পাঠাইতে লাগিল। ১৬ই রাত্রিতে দুর হইতে কেবলি তুমুল ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল, 'আল্লা হু আকবর', 'হিন্দুমারো'। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভয়ংকর দিন। দলে দলে আতঙ্কিত লোক থানার দিকে ছুটিল। কিন্তু বেলা ৩টায় চারিদিক হইতে ৩।৪ হাজার মুসলমান নানা ধ্বনি করিয়া মুলাদী বন্দর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে থাকে। সীতনাথ পাল ধনী ব্যবসী, বন্দুক আছে। **মুসলমানরা প্রাতেই তাকে ভয় দেখায় ও বন্দুক থানায় জমা দিতে বলে। সীতানাথ ২০০০০ টাকা ও ৮০ তোলা সোনা পেটে বাঁধিয়া বন্দুক হাতে থানা রওনা হন, বেলা ৩টায়। কিন্তু বেশীদুর যাইতে হয় নাই, পথেই উন্মত্ত জনতার সমুখে পড়েন। জনতার সম্মুখে হিন্দুরা ভয়ে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। সীতানাথ লাফাইয়া এক ডোবায় পড়িয়া কচুরীবনে লুকান। সেখান হইতে যে দৃশ্য দেখেন তাহা লোহর্ষক। তখন হিন্দুনারীরা দৌড়াইয়া দলে দলে পলাইতেছে কিন্তু দুর্বৃত্তেরা উন্মত্তের মত তাহাদের উপর পড়িয়া পাশবিক অত্যাচার শুরু করিল। উন্মুক্ত স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে এই নরকলীলা সংঘটিত হইল। থানা অদূরে, কিন্তু একটি কুটাও নড়িল না। সমস্ত বিকাল ও সন্ধ্যা লুঠ হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড করিয়া দুর্বৃত্তেরা গভীররাত্রে লুটের মাল ও অপহৃতা নারীদের লইয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে (১৮ই) চারিদিক সুনসান্। পথে ঘাটে গুদামে নদীতে তীরে সর্বত্র শত শত মৃতদেহ। ১১৭ বৎসর বয়স্ক সর্ব্বজনামান্য বৃদ্ধ মহেশ চন্দ্র পাল—যিনি শত অনুরোধেও পাকিস্তান ত্যাগ করেন নাই, হিতার্থী-মুসলমানের আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইতেও অস্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করা হইয়াছে। বন্দরে তখন ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠিয়াছে। গ্রামে, বন্দরে, পথে কত লোক মরিয়াছে সংখ্যা নাই, এক ব্যানার্জীর সুপারি বাগানেই তিন শতের বেশী মৃতদেহ ছিল। দলে দলে লোক থানায় যাইয়া আশ্রয় চাহিল, দারোগা আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে।** বাধ্য হইয়া সবাই জঙ্গলে লুকায়, কখন আবার আক্রমণ হয়। কিন্তু জঙ্গলেও

রেহাই নাই। মাখনলাল কুণ্ডুর স্ত্রী, খুড়া, শ্বশুর প্রভৃতির কাছে গণি মাঝি নামে গুণ্ডা ভয় দেখাইয়া টাকা বস্ত্র গহনা সর্বস্ব কাড়িয়া নিল। শনিবারে (১৮ই) অনেকে লুণ্ঠিত গৃহেই বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসে। বহুলোক সন্ধ্যাবেলা আবার থানায় যায়। যাহারা থানার দারোগাকে সোনা ও টাকা-কড়ি দিতে পারিয়াছে তাদের পরে আশ্রয় দেওয়া হয়। সীতানাথের পরিবারবর্গ গোপনে থানার আশ্রয় নেয় এয়ং দারোগা তাদের সর্বস্ব নিয়া যায়। **লাউড স্পীকারে আনসাররা সবাইকে ডাকিয়া বলে, সকলকে থানার আসিতে। কিন্তু জঙ্গল হইতে ফিরিয়া আসিলে পুরুষদের হত্যা করিয়া তরুণী নারীদের দুর্বৃত্তরা বন্টন করিয়া নেয়। বয়স্থাদের উপর পাশবিক অত্যাচার হয়। থানার দারোগা স্বয়ং নাকি হুকুম দিয়া শত শত লোককে থানায়ই হত্যা করিয়াছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন।** এমন কি নারায়ণ ভাদুড়ী নামে টি-বি রোগীকে স্ত্রীর কোল হইতে ছিনিয়া লইয়া তখনই হত্যা করে। কিন্তু সেই সাধ্বী পত্নীও নিহত হন। (সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করিয়া নিজেকে রক্ষা করেন একথাও কেহ কেহ বলেন) যশোদালাল কুণ্ডুকে রহিয়া রহিয়া ধীরে ধীরে কাটিয়া টুকরা করিয়া থানায় আনা হয়। মুলাদির ডাক্তার কুমুদবিহারী ব্যানার্জী আশ্রয় চাহিলে অস্বীকার করা হয় এবং হতভাগ্যকে থানাপ্রাঙ্গণেই হত্যা করা হয়। এইরূপ শত শত মৃতদেহ নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়। বরদাকান্ত পাল, গোপাল পাল, সুখদাসুন্দরী পাল, ধীরেন পাল, কবিরাজ ডি, এন, রায়, মদন পাল, গোপাল কুণ্ডু কয়েক কুণ্ডু, প্রভৃতিকে থানায়, গ্রামে ও বন্দরে হত্যা করা হয়। থানার দারোগা স্বয়ং সাধ্বী মেয়েদের শাখা-সিন্দুরহীন করিয়া 'কলমা' পড়াইয়া মুসলমান করিয়া দুর্বৃত্তদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিয়াছেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী আর এক হত্যাকাণ্ড করা হইল। কয়েক শত সমবেত নরনারীকে দারোগা বলিল, বন্দরে রিলিফ ক্যাম্প খুলিয়াছি—সেখানে যাও তোমরা। সবাই সেখানে গেল। যাইবার আগে দারোগা এদের টাকা, পয়সা ও গহনা রাখিয়া দিল। বন্দরে ৩টী গুদামে—পাঁচ তহবিল, মাধবলাল কুণ্ড ও সুখময় কুণ্ডুর গুদামে—শত শত নরনারীকে ভাগ করিয়া বসাইয়া রাখে। ইহারাও সরল বিশ্বাসে আশ্রয় পাইল মনে করিয়া সেখানে বসিয়া থাকে। মাত্র দুই-জন চৌকিদার পাহারা রাখিয়া দারোগা সরিয়া পড়ে। **বেলা ১২টার সময়ে দারোগার ইঙ্গিতে প্রায় ৩০০০ সশস্ত্র মুসলমান গুদাম আক্রমণ করিয়া পুরুষদের ভিন্ন করিয়া হত্যা করিতে থাকে। তিনটি গুদামই রক্তে ভাসিয়া গেল। কাতরোক্তি ও মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া প্রায় ৭০০ পুরুষকে (কেহ বলে বেশী) এবং বৃদ্ধাদেরও নৃশংসভাবে মারিয়া ফেলিল ও নদীতে ফেলিয়া দিল। তার-পরে মুক্তেশ্বর সাহার ঘরে টিনের চালার মধ্যে নিয়া সমস্ত মেয়েদের নমাজ পড়ায়। বয়স্থাদের প্রায় ৫০কে পৃথক করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লয়। পাঁচ তহবিলের গুদামে প্রাণবল্লভ ঘোষ স্ত্রী, ভ্রাতৃবধু, প্রভৃতি মেয়েদের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। উহাদের মধ্য হইতে ছিনাইয়া নিয়া মহিলাদের সম্মুখে তাহাকে কাটিয়া ফেলে। গঙ্গাচরণ সরকার (৬২) ও নিত্যানন্দ পালকে (৬৫) সেখানেই কাটে। মাখনলাল, সুখময়, রাধাশ্যাম, বিপিন, নগেন ও হরেন কুণ্ডু এই ছয়জনকে তাদের আত্মীয় মহিলাবৃন্দ ও স্ত্রীকন্যাদের সম্মুখেই হত্যা করিয়া মাখন কুণ্ডুর পরিবারটীকে একেবারে নিঃসহায় করিয়া দিয়াছে।** ইহা শুধু দৃষ্টান্ত, এমনি অগণ্য পরিবার উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

বরিশাল হইতে বিকালে সেদিন ভাগ্যক্রমে মিঃ সিরাজুল হক্ (Regional Controller of Procurement) লঞ্চ ও সশস্ত্র পুলিশ সহ উপস্থিত হওয়ায় গুণ্ডাদল পলাইয়া যায়। জীবিত পুরুষ ও অবশিষ্ট নারীদের বরিশাল লইয়া আসা হয়। নৃশংসতা ও পাশবিকতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া মূলাদির মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে ইতিহাসের এক চিরঘৃণিত অধ্যায় রচনা করিল। সমস্ত মুলাদি অঞ্চলে একখানা হিন্দুবাড়ী নাই—গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত এবং হিন্দুশূন্য হইয়া গিয়াছে।

রাজাপুরের হত্যা

রাজাপুরে বহু হিন্দুর বাস। ১৫ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পুর্বে রাজাপুর থানার দুজন কনস্টেবল অতুলনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য লোকের বাড়ী আসিয়া বলে, 'রাজাপুরে আজ কারফিউ, আপনারা সন্ধ্যার পর কেহই ঘর হইতে বাহির হইবেন না। বাহির হইলে আমরাই গুলি করিতে বাধ্য হইব, দারোগা সাহেবের হুকুম।' তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সারিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যাবেলা চারিদিক হইতে 'আল্লা হু আকবর' প্রভৃতি তুমুল ধ্বনি উঠিল। হাজার হাজার মুসলমান গ্রামের দক্ষিণ দিকে ৬০।৭০ খানা বাড়ী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ আক্রমণ করে। প্রথমে ধনী তালুকদার রাজিতরাম তেওয়ারির বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহার দালানে আগুন দেয় ও লুঠ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর লোক যে যেদিকে পারে পলাইয়া যায়, কিন্তু রাজিতের ছেলেটি দুর্বৃত্তদের সম্মুখে পড়িয়া যায়, তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই আগুন দেখিয়া ও চীৎকার শুনিয়া গ্রামের লোক সবাই জঙ্গল, খাল, নালা ইত্যাদির মধ্যে যাইয়া লুকাইয়া থাকে। পশ্চিম পাড়ায়ও সন্ধ্যার পরে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ চলে। সমস্ত সাহা ও যোগী বাড়ীগুলি প্রথমে লুঠ করিয়া পরে আগুন দেয়। লোকজন পলাইয়া যায় কিন্তু যারা বার্ধক্য বা অসুস্থতা হেতু পলাইতে পারে নাই তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। যথা বাতবাধিতে অচল বৃদ্ধ অধর সাহা। যেমন গোপাল সাহার বৃদ্ধা মাতা, তাকে লেপকাঁথায় মুড়িয়া বাঁধিয়া কেরসিন ঢালিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারে। রামচরণ যোগী ও অন্য একজন যোগীকেও হত্যা করে। এমনি পূর্ব্ব পাড়ারও অন্য দল কুমার ও নাপিতবাড়ী-গুলি লুঠ করিয়া পোড়াইয়া দেয়।

অতুলনারায়ণ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। রাত্রি ৮টায় চতুর্দিকে ধ্বনি উঠিতেই ছাদে উঠিয়া দেখেন চারিদিকেই আগুন জ্বলিতেছে। পাড়ার সবগুলি পরিবার তাহার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে, ছাদের উপরে সকলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিয়া আছে। রাত্রি ১২টার সময়ে 'রক্তের বদলে রক্ত চাই,' 'হিন্দুর রক্ত চাই', 'হিন্দুর রক্ত চাই', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে ৩০০০ মুসলমান লেজা, লাঠি, বন্দুক, রামদা, শড়কী সহ বাড়ী ঘিরিল। ইহাদের নেতৃত্ব করিতেছে ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট আছমত আলিখাঁ বন্দুক হাতে, এক্সাইজ দারোগা, লীগ-প্রেসিডেন্ট মোকামেল হুসেন, U. B-সভ্য নুরুল হক্ প্রভৃতি অসংখ্য পরিচিত মুসলমান। আসিয়াই ঘরে আগুন জ্বালাইয়া ঢেঁকিঘর হইতে ঢেঁকি দিয়া দালানের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢোকে এবং লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুঠ করিল। কতক লোক উঠানে ধ্বনি দিতেছে, কতক সিঁড়ি-দরজা ভাঙিতে না পারিয়া ১৫।১৬ টী সুপারি গাছ কাটিয়া ছাদে

লাগাইল। তাহাতেও না পারিয়া শেষে ছাদে উঠিয়া আসিল বাঁশের মই বানাইয়া। ছাদে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। মেয়েছেলেরা সিড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল, পিছনে দুর্বৃত্তের দল। বহুক্ষণ বাধা দিয়া ৬।৭ জনকে জখম করিয়া অতুল নিজেও জখম হইয়া ইটের পাজায় পড়িয়া যান। দুর্বৃত্তেরা বলে, 'শালা শেষ।' মৃত মনে করিয়া তাহারা অন্যদিকে চলিয়া যায়। সারারাত্রি ধরিয়া পরদিন সকাল ৭টা পর্য্যন্ত লুন্ঠন ও ধ্বংসকার্য করিতে থাকে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার বহুলোক মালামাল নদীর দিকে নিতে থাকে। অতুল বহু কষ্টে উঠিয়া থানায় যাইয়া দারোগার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলে, 'এখনো যান, আমার বাড়ীর লোকদের রক্ষা করুন' কিন্তু দারোগা ভ্রূক্ষেপও করিল না। লুঠের মাল লইয়া যাইতেছে থানার সমুখ দিয়া, ডাক্তার পুলিশ কেহ কিছু বলে না। সারারাত রেজেস্ট্রী অফিসের বারান্দার ছটফট করিয়া **পরদিন প্রাতে ৮টায় নিজের বাড়ীতে যাইয়া অতুল দেখেন, বাড়ী ভস্মীভুত চারদিকে আগুন জ্বলিতেছে, সামনের বারান্দায় অর্ধদগ্ধ অবস্থায় তাহার পিতা শশীভূষণ (৬৫) মৃত এবং দেওয়ালের সঙ্গে ৯টী কাটা মুণ্ড সাজান রহিয়াছে। যাহাদের হত্যা করিয়া মুণ্ড সাজাইয়াছে তাহারা অতুলের ঠাকুরদা আশুতোষ গাঙ্গুলী (৭০), শিশু কন্যা আরতি, (৭) প্রতিবেশী সত্যচরণ দে সরকার (৬০) ঐ স্ত্রী সরযুবালা (৩৫) ঐ পুত্র সন্তোষ (১৮) ঐ পুত্র গান্ধী, (৮), পুত্র সুভাষ (৫) ঐ কন্যা কালিদাসী (১৬) এবং ঢাকা লোহাজংয়ের ব্যবসায়ী কিশোরীমোহন কুণ্ডু (৪৫)।**

দুর্বৃত্তেরা সারারাত্রির তাণ্ডবের পরে ফিরিবার পথে রাজাপুরের বসন্ত দাসকে নালার মধ্যে পাইয়া হত্যা করিয়া বেলা ৯টায় ২০০ মাইল দুরে কৈবর্তখালি গ্রাম লুন্ঠন করে এবং ৭০ জন হিন্দুর মধ্যে ৪৩ জনকে হত্যা করে, দিনের বেলা অনেকেই পলাইতে পারে নাই। ঐ দিন আশেপাশের গ্রামও ভস্মীভুত হয়। ১৬ই তারিখে চারদিকের আল্লাহ আকবর' ধ্বনি ও লুঠ ও হত্যার রোল শুনিয়া স্কুলে ও থানায় আশ্রয় নেয় ২।৩ হাজার লোক। তিনদিন অনাহারে থাকার পরে দারোগা স্কুল ও থানা হইতে ইহাদের তাড়াইয়া দেয়। ঘটনার এজাহারে হত্যাকাণ্ডের নেতা লীগ প্রেসিডেন্ট প্রভৃতির নাম লিখিতে দারোগা অস্বীকার করে; নৃশংস হত্যা, লুঠ ও অত্যাচারে সমস্ত গ্রামগুলি আজ হিন্দুশূন্য, গৃহগুলি ভস্মীভূত।

অধ্যক্ষা শান্তিসুধা ঘোষের চোখে তিনটি দিন

১৯৫০ সাল, ১০ ফেব্রুয়ারি।

রাত তখন প্রায় আটটা। কালীপদ (বাড়ির পশ্চিমাংশের ভাড়াটে হেমচন্দ্র দের ছেলে) শহর থেকে ঘুরে বাড়ি ফিরল, আমাদেরই অন্দরের উঠোনের মধ্য দিয়ে। বলল "পিসীমা, শহর আজ বেশ গরম।" আমি কিছুটা অবজ্ঞাভরে হেসে বললাম, "আরে রেখে দাও, ও তো তোমাদের লেগেই আছে!" বাস্তবিক পাকিস্তানে গরম হাওয়া ছাড়া স্নিগ্ধ মলয়ানিল বড়ো একটা বইতে দেখি নি। আজ এটা, কাল সেটা উপলক্ষ করে আগুনের হল্‌কা কোনো ছুতোয় ছড়াতে পারলেই হয়।

বাড়িতে আমি, একটি কলেজের ছাত্র সুখরঞ্জন, আর শয্যাশায়ী রুগণা মা। রাত

৯/৯১/২টায় আমি আর সুখরঞ্জন খাওয়াদাওয়া শেষ করে উঠলাম। রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মুখ ধুতে ধুতে সুখরঞ্জন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "পিসীমা ওকি!! আকাশের ওদিকটা লাল দেখা যাচ্ছে কেন? আগুন লাগল নাকি?"

আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, তাই তো! আমাদের দালানের ছাদের দিকটায় হবে। সে আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূর। অকস্মাৎ বাড়ির ঠিক বিপরীত কোণের দিক থেকে সাড়া এল, "আল্লা হো আক্‌বর।" সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা লক্‌লক্ করে উঠল। এবার অনেক কাছে, মনে হ'ল অতুলনগরের—নলিনদের চিন্তাহরণবাবুদের বাড়ির দিকটায়।

আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। কালীপদর ঘোষিত "গরম হাওয়া" নিমেষের মধ্যে আগুনে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

ভাবনাচিন্তার কোনো অবকাশ রইল না; মুহূর্তের মধ্যে আমাদের পাশের বাড়ির ঠিক গা দিয়ে যে গলিটি পশ্চিমদিকে গিয়েছে, যার দুপাশে বহু হিন্দু গৃহস্থের সারি সারি বাড়ি, সেইখানে আগুনের শিখা দেখা গেল। পাশের বাড়িখানা আমাদের পিসেমশাই-এর। বর্তমানে, পাকিস্তান সৃষ্টির পরে তাঁরা কলকাতার অধিবাসী, এবং বাড়িতে বসবাস করছেন একজন মুসলমান পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার।

ইতস্তত করবার ক্ষণমাত্র অবসর নেই, ঘরে অর্ধ-মুমূর্ষু মা, তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে। পাশের বাড়ি ও আমাদের বাড়ির মধ্যে মাত্র একখানা পাঁচিলের ব্যবধান। কিন্তু পরস্পর যাতায়াত করতে হলে অনেকদূর হেঁটে উভয় বাড়ির সদর ফটক, উভয় বাড়ির লম্বা রাস্তা এবং রাজপথের একটুখানি অংশ অতিক্রম করে তবে যেতে হয়। মার পক্ষে অতখানি পথ চলা অসম্ভব। সুখরঞ্জন প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি সহকারে পাঁচিলের গায়ে চাল্‌তা গাছটির পাশে একটি মই বসিয়ে দিল এবং পাঁচিল টপ্‌কে ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের বাড়ির লোকেদের অনুমতি নিয়ে মাকে পাঁজাকোলা করে মই বেয়ে পাঁচিলের ওপর তুলে দিল, ও-পাশ থেকে সে-বাড়ির লোকজনরা মাকে ওধারে নামিয়ে নিল। পেছন-পেছন আমি ও সুখরঞ্জনও ও-বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

গিয়ে দেখি সেখানে ইতিমধ্যে এ পাড়ার আশপাশের সব হিন্দু গৃহস্থবাড়ির লোকজন জমে গেছে। আকস্মিক এই সাম্প্রদায়িক বিপদ থেকে জীবন বাঁচাবার পক্ষে এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর আপাতত নেই। ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব তখন বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনেরা যথেষ্ট সহৃদয়তা সহকারে সবাইকে স্থান দিয়েছেন। মাকে ও আমাকে আরো বিশেষ সমাদরপূর্বক একখানা খাটে লেপ-তোষক দিয়ে ভালো করে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তখন মাঘের শীতের রাত্রি। পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলির আগুনের হল্‌কা তখনো পর্যন্ত কক্ষাভ্যন্তরস্থ আমাদের যথেষ্ট উত্তপ্ত করে তুলতে পারে নি। তাই লেপের তলায় শুয়ে বেশ আরাম বোধ করলাম।

কিন্তু মনের মধ্যে বিষম উদ্‌বেগ। এপাশে আগুন, ওপাশে আগুন, আর আকাশ-মন্থন করা চীৎকার "আল্লাহো আক্‌বর।" অজানা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সকলের চোখমুখ উদ্‌ভ্রান্ত। আগুন তো হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ জানে না; পাশের গলির অগ্নিশিখা যে-কোনো মুহূর্তে জিহ্বা বাড়িয়ে দিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের বাড়িটিকেও তো স্পর্শ করতে পারে।

গুজবের মুখে লাগাম নেই। তার রটনায় হাল ছেড়ে দেবার মতো কানেরও অভাব নেই। নানা জনের মুখে নানা ভয়ার্ত, উত্তেজিত আলোচনা শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম। শুনলাম, কলকাতায়, নাকি হিন্দুরা মৌলবী ফজলুল হক্ ও তার জামাতাকে হত্যা করেছে, এবং সেই সংবাদটি পেয়েই নাকি বরিশালের মুসলমানেরা উত্তেজিত হয়ে আজ এই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে। কলকাতায় কোথায় কী ঘটেছে তার সত্যি-মিথ্যে জানি না; কিন্তু আমরা যে পূর্ব পাকিস্তানের বিবরে বসে আজ মরণের সম্মুখীন হয়েছি, এ কথা নিশ্চিতভাবে জানছি।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়। আগুন এদিকে আর অগ্রসর না হয়ে আস্তে আস্তে যেন ম্লান হয়ে নিভে গেল। শহরের অন্যত্র কোথায় কী ঘটছে, বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের আলেকান্দা পাড়াটা যেন ক্রমশ আগুন ও হট্টগোলের পরিবর্তে রাতের স্বাভাবিক অন্ধকার ও নিস্তব্ধতায় শান্ত হয়ে এল।

আরো কিছু সময় যায়। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভাবলাম,আর কতক্ষণ? এভাবে অন্য বাড়িতে মাথা গুঁজে এত লোকের মধ্যে সারারাত জেগে কাটনো যায়? রাত তখন প্রায় বারোটা। প্রতিবেশীদের উপদেশ না মেনেই আমি উঠলাম। মাকে আবার পূর্ববৎ মই-এর সাহায্যে সুখরঞ্জন দেয়ালের ওপারে আমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনল। আমি সদরফটক ও রাজপথ পার হয়ে একাই বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে যথানিয়মে একটি দালানে মার ঘরে মা ও আমার ঘরে আমি এবং অপর দিকের দক্ষিণের ঘরে সুখরঞ্জন অভ্যস্ত শয্যার আশ্রয় নিয়ে অচিরে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদের অত বড়ো প্রকাণ্ড বাড়িটি এবং পশ্চিমদিকের প্রজাবাড়ি একেবারে জনশূন্য, নিঝ্‌ঝুম!

কিন্তু আশ্চর্য, একটুও ভয়ের সঞ্চার হল না তো!

পরদিন ভোর হতেই আমাদের পশ্চিমখণ্ডের প্রজা দুজন—অমর সিংহ ও হেম-চন্দ্র—গম্ভীর লম্বামুখ করে এসে আমাদের বারান্দায় দাঁড়াল। বলল, "দিদি, আপনার কাছে একটু পরামর্শ চাই।"

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী পরামর্শ?"

"আজ কি ডকে যাব?"—এরা দুজনেই বরিশাল R. S. N. Company-র ডকে মিস্ত্রীর কাজ করে। রোজ সকাল ৬টায় ডকের বাঁশি বেজে ওঠে, এরা তার আগেই সেখানে হাজিরা দিতে চলে যায়। কিন্তু আজ যায় নি। গতরাতের সাম্প্রদায়িক অগ্নিলীলায় বোধহয় আতঙ্কে থম্‌কে গেছে। আমি তা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, "কেন?"

ধীরে ধীরে তাদের উদ্‌বেগ ও ভীতির কারণ ব্যক্ত করে বলল, "যদি আজও আবার গোলমাল হয়? যদি আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ঘরবাড়ি লুটপাট হয়?

এ কল্পনা আমার মনে আসিনি। এমনধারা ভয় করবার কোনো সংগত কারণ আছে বলেও মনে হল না। তথাপি তাদের ভয়ার্ত মুখগুলের দিকে তাকিয় বললাম, "তাহলে থাক্।"

ওরা চলে গেল। প্রাতঃরাশ ও প্রাতঃকালীন গৃহকর্মগুলো সেরে আমি বড়ি দিতে বসলাম। গতরাত্রে বড়ির ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম।

বড়ি দেওয়া প্রায় শেষ করে এনেছি, এমন সময় পুলিস হাসপাতালের কম্পাউন্ডার সুরেশবাবু আমার কাছে একজন লোক পাঠালেন। পুলিস-হাসপাতালটি ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে, সদর রাস্তার ওপারে। কম্পাউন্ডারের পরিবারের সাথে আমাদের বেশ মেলামেশা ঘনিষ্ঠাতা আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর?"

"কম্পাউন্ডারবাবু বলে পাঠালেন, নলিনবাবুকে ও তাঁর স্ত্রীকে গতরাত্রে আহত অবস্থায় পুলিস হাসপাতালে আনা হয়েছে। বেলা দশটায় সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। যদি আপনি দেখতে চান তবে এখনই একবার এসে দেখে যেতে পারেন। নলিন আমার সম্পর্কিত ভাইপো; অতুলনগরে, —যেদিকটায় গতকাল রাত্রে অগ্নিসংযোগ অনুমান করেছিলাম। আমি হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আহত? সেকি!!

বার্তাবহকে বিদায় দিলাম, "বল, আমি যাচ্ছি।"

বড়ি দেওয়া সাঙ্গ করে হাত ধুয়ে আমি হাসপাতালে চললাম।

গিয়ে যা দেখলাম, একেবারে চক্ষুঃস্থির! নলিন, তার স্ত্রী, অম্বিকাবাবুর বৃদ্ধা স্ত্রী, জ্যেষ্ঠপুত্র, নাতি, নাৎনী প্রভৃতি আট-দশজন একটি ঘরে শুয়ে আছে, মলিন রক্তাক্ত কাপড়ে অবিন্যস্তভাবে দেহ আবৃত। শুক্‌নো রক্তের রাশি চাপ বেধে কাপড়ের স্থানে স্থানে একেবারে চট্ বেঁধে গেছে; কারও মাথায়, কারও পিঠে, কারও বা গলায় গুরুতর রকম ছুরিকাঘাত। হাসপাতাল থেকে কোনোরকমে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে।— কিছুক্ষণের জন্য আমার যেন বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না, মনও নিশ্চল। পরে দু-চারটে কথাবার্তা বলে যা জানতে পারলাম, তা এই।—

গতকাল রাত দশটা নাগাদ অতুলনগরের ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অম্বিকাচরণ গুহ প্রভৃতিদের বাড়িতে দুর্বৃত্তগণ আগুন লাগিয়ে দেয়। গৃহস্থেরা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে ও লুকিয়ে থেকে কোনো প্রাকারে প্রাণ বাঁচায়, আগুনে পুড়ে মরে নি। কিন্তু চোখের সামনে তাদের সযত্নরচিত গৃহগুলি সব ভস্মসাৎ হয়ে গেল। আগুন নিভে যাওয়ার পর গৃহহারা নরনারীগণ একটু আশ্রয়ের আশায় শহরের দিকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল, তখন রাজপথের উপরে আততায়ীর হাতে ছুরিকাঘাত! পথিমধ্যেই লুটিয়ে পড়তে হ'ল। টহলদার পুলিসেরা যাকে যাকে দেখতে পেয়েছে, তুলে এনে নিকটবর্তী পুলিস হাসপাতালে এনে জড়ো করেছে।

বলবার কিছু নেই, ভাববার কিছু নেই, ঘটনাটা উপলব্ধি করবার শক্তিও বোধহয় রহিত হয়ে গেছে—এমনই অপ্রত্যাশিত, অভাবিত।

বেশিক্ষণ থাকবার সময় হল না। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ জানালেন, এখন আহতদের সদর হাসপাতালে চালান দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর, এদিকে আমারও কলেজে যাবার সময় হয়ে এসেছে।

বাড়ি ফিরে অর্থহীন, উদ্‌ভ্রান্তমনে স্নানের উদ্যোগ করতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় বাণীপীঠ ইস্কুলের হেড্‌মাস্টার শ্রীযুক্ত প্রেমাংশু সেনগুপ্ত এসে উপস্থিত। বসে পড়ে বললেন, "খবর সব শুনেছেন তো? এখন আমাদের হিন্দুদের তরফ থেকে কী করা যায়?

তাঁর মুখে শুনলাম, গতরাতে শুধু দু-তিন জায়গায় অগ্নিকাণ্ড করেই লীলার শেষ হয়

নি, এই সবে শুরু। কাশীপুর, লাখুটিয়া, মাধবপাশা ইত্যাদি প্রত্যন্ত স্থানগুলি থেকে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী লোকের মুখে মুখে কানে আসছে; বাস্তুহারা হয়ে দলে দলে হিন্দু নরনারী, বালকবালিকা, শহরের দিকে আসছে। ম্যাজিস্ট্রেট্‌ সাহেব আপাতত বি. এম. স্কুল বিল্ডিংটি দখল করে সেখানে তাদের মাথা গুজবার ব্যবস্থা করেছেন। আরো কী ঘটেছে, আরো কী ঘটবে, তা এখনো অজানা।

প্রেমাংশুবাবুর আলোচনার বিষয় হল, এ অবস্থায় আমরা কি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কচুকাটা হব? নিজেদের রক্ষার জন্য কোনো প্রকার সংঘবদ্ধ আয়োজন বা প্রচেষ্টা কি সম্ভবপর নয়?

সত্যই তো! পাকিস্তানী হিন্দু, আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? শুধু চেয়ে দেখব আর আর্তনাদ করে মরব?—মুহূর্তের মধ্যে বুঝলাম, আগাগোড়া পাকিস্তানের জন্মরহস্য জেনেও, পাকিস্তানে বাস করেও আমি এতদিন, এতক্ষণ গজদন্ত মিনারে বাস করে স্বপ্ন দেখছিলাম। গতকাল রাত্রে "আল্লাহো-আক্‌বর"-বিঘোষিত ভয়াবহ অগ্নিলীলার কোটরে কাটিয়েও, নলিন-অম্বিকাবাবুদের পরিবারের রক্তাক্ত কলেবর দেখে এসেও এখনই কলেজে যাবার আয়োজন করেছিলাম—যেন কোথাও কিছুই ঘটে নি। এতদিন কিসের রাজনীতি করে এসেছি? নিজের নির্বুদ্ধিতায় ধিক্কার এল। ঘটনাবলীর ব্যাপকতা, গভীরতা ও চক্রান্তের গুরুত্ব এতক্ষণে সহসা হৃদয়ঙ্গম করলাম। ঠিক করে ফেললাম, আজ আর কলেজে যাব না। উৎপীড়িত হিন্দু পরিবারগুলির রক্ষার জন্য কী আয়োজন করা যায়, প্রেমাংশুবাবু প্রমুখ যে কয়জন বিশিষ্ট হিন্দুকে পাওয়া যায়, তাঁদের সহযোগিতায় তারই পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা আজ আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য।

আলোচনা হল, এক-এক পাড়ায় বেছে বেছে দু-একটি বড়ো বাড়িতে পাড়ার সব হিন্দু নরনারীকে একত্র রেখে সেই বাড়িতে সরকার-কর্তৃক কড়া পুলিসি পাহারা রাখবার চেষ্টা করতে হবে। এবং ইতিমধ্যেই গতরাতের তাণ্ডবলীলায় যে-সব নিরাশ্রয় নরনরী শহরে এসে সমবেত হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রকৃত ঘটনাবলী যথাসম্ভব অনুসন্ধান করে সমগ্র ব্যাপারটির যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করতে হবে।

প্রেমাংশুবাবু চলে গেলেন। বলে গেলেন, আরো কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করে পরে আমাকে আবার জানিয়ে যাবেন।

উদ্‌বিগ্ন চিন্তায় কাটাতে লাগলাম। গৃহকর্মাদি ও স্নানাহার সবই যন্ত্রের মতো যথারীতি সম্পন্ন করা গেল। প্রেমাংশুবাবু আর এলেন না।

বেলা প্রায় ২/২½টে। ভাবলাম, বাইরের খবরাখবর কিছুই পাচ্ছি না, ঘরে বসে কালহরণ করে কোনো কাজ হচ্ছে না; বি.এম. স্কুল প্রাঙ্গণে যেখানে শরণার্থীদের স্থান দেওয়া হয়েছে, সেখানে একবার গিয়ে শরণার্থীদের কাছ থেকে তথ্যসংগ্রহ করে দেখা যাক।

একটা রিক্‌শ করে বেরিয়ে পড়লাম।—বি. এম. স্কুলের গেটে এসে ভেতরে যেতে উদ্যত হতেই পুলিস পাহারাওয়ালা বাধা দিল। জানাল, ম্যাজিস্ট্রেট্‌ সাহেবের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কাউকে প্রবেশ করতে দেবার হুকুম নেই।— খানিকটা থমকে গেলাম। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের গেটে পুলিস প্রহরা! পথ রুদ্ধ; যেখানে প্রতিনিয়ত অবাধে যাতায়াত করেছি!

কিন্তু করবার কিছু নেই।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ি খুব নিকটেই। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সরলবাবু আমাদের কলেজের গভর্নিং বডির সভ্য এবং জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ তার সভাপতি। সরলবাবুর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের হৃদ্যতাও যথেষ্ট। ভাবলাম, সরলবাবুর কাছে যাই, যদি তিনি কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

সরলবাবুকে বাড়িতেই পেলাম। তাঁর কাছে পরমর্শ চাইতে তিনি আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একবার দেখা করে দেখো, কিছু করতে পার কিনা।

ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠির দিকে রিক্‌শ ফেরালাম। কুঠিটি এখান থেকে বেশ অনেকটা দূর, নদীর পারে। গেটে এসে থামতেই দ্বাররক্ষী জানাল, সাহেব এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন।

দু-চার মিনিট ইতস্ততঃ করে অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে বাড়ির দিকেই ফিরলাম।

বিকেল হয়ে এসেছে। একটু পরেই সুরেশবাবু পুলিস হাসপাতাল থেকে খবর পাঠালেন, আজ রাতে যেন আমরা বাড়িতে না ঘুমোই, সন্ধের পরেই যেন মাকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে চলে যাই, তিনি সেখানে আমাদের শোবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

শুনে চমকিত হলাম। ব্যাপার কি তা হলে আরো সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে?

এদিকে আজ সন্ধ্যা থেকে কারফিউ জারী হয়ে গেছে। সুরেশবাবুর কোয়ার্টারে যেতে হলে সরকারী রাস্তা পার হয়ে যেতে হয়, সুতরাং সন্ধ্যার আগেই যেতে হয়।—যেতে হবেই, কিন্তু কল্পনাটি আমার আদৌ ভালো লাগল না। কেননা, দুর্বৃত্তদের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছি, এ দৃশ্যটি সদর্পে বিচরণকারী দুর্বৃত্তদেরই চোখের সামনে দেখাতে অত্যন্ত অপমানবোধ হল।

অথচ, উপায় নেই। চলৎশক্তিরহিতা মাকে সরাতেই হবে।—তাড়াতাড়ি করে, বাড়ি খালি রেখে যাবার যতরকম টুকিটাকি প্রস্তুতির বিষয় মনে পড়ল সব সারলাম। এ ঘর তালাবন্ধ কর, ও ঘর তলাবন্ধ কর, বিড়াল-কুকুরদের রাত্রের খাওয়া পর্ব সমাধা কর, ইত্যাদি। একটি বিড়াল বাচ্চা—নাম তার "কবি"—অত্যন্ত নিরীহ, অন্যান্য বিড়ালগুলির চড়চাপড় কামড়াকামড়ির ভয়ে সে কিছুদিন যাবৎ বেশির ভাগ সময়েই অন্দরমহল থেকে দূরে দূরে বৈঠকখানা ঘরের কাছে থাকে, তাকে ভাত নিয়ে বহির্বাটীতে, বাইরে বাগানে গিয়ে ডেকে খাওয়াতে হয়। আজও সেটি করতে ভুললাম না। অসময়েই কবিকে ডাকাডাকি করতে হল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই মাকে নিয়ে আমি ও সুখরঞ্জন পুলিস হাসপাতালের প্রাঙ্গণে কম্পাউন্ডার বাবুর কোয়ার্টার্সে এসে পৌঁছলাম।

আমাদের বাড়িতে যে পরিচারিকাটি গৃহকর্মাদি করত—"তুলির মা"—সে খৃষ্টান। হিন্দুনিধনযজ্ঞের সূচনা দেখেই সে-ও বিকেলবেলাই আমাদের বাড়ি ছেড়ে পালাল। তার মেয়ের বাড়ি অনতিদূরে খৃস্টান পাড়ায়। এ কয়দিন সে সেখানেই রাত কাটাবে বলে গেল। হিন্দুর বাড়িতে কাজ করে বলে সে অকারণ হিন্দুর সঙ্গে প্রাণটা খোয়াতে রাজি নয়।

কম্পাউন্ডার বাবুর কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দেখি, সেখানে ইতিমধ্যেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। এ পাড়ার যত হিন্দু গৃহস্থ সবাই বোধহয় আজ রাতে এখানে আশ্রয় নিয়েছে।

হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের দোতলাতেও ডাক্তার সাহেব (মুসলমান) অনেক হিন্দু নরনারীকে স্থান দিয়েছেন শুনলাম। গত রাত্রের মতো এ রাত্রেও মা আর আমি ছাপরখাটে লেপতোষকের তলায় আরামে শুয়ে পড়লামঃ কিন্তু নিদ্রা এ রাতে মোটেই আঁখিপল্লবে একবারও বসল না। কেননা, ঘরময় গিজ্-গিজ্ লোকের সমবেত চাপা কথাবার্তার ফিস্ফিস্, গুন্গুন্, বাচ্চাদের কান্না এবং সর্বোপরি মাথার কাছের রাজপথ দিয়ে অনবরত টং টং শব্দসহ দমকলের ছুটোছুটিতে মগজটা বিশ্রামের সুযোগ কমই পেল। ঘরের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নানা গুঞ্জন কানে আসছে, অমুক পাড়ায় আগুন লেগেছে, অমুক পাড়ায় ছুরিকা-ঘাত হচ্ছে, এমন কত কী? মোটের ওপর, রজনী যখন প্রভাত হয়ে এল, নিদ্রা-বিহীন চোখে শয্যাত্যাগ করে মা আর আমি পুনরায় বাড়ি ফিরে এলাম অতি প্রত্যূষে।'' (জীবনের রঙ্গমঞ্চে-শান্তিসুধা ঘোষ)

সকালবেলাই খবর পেলাম, শ্রীযুক্ত প্রেমাংশু সেনগুপ্তকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপরাধ তিনি বি. এম. স্কুলে আশ্রয়প্রাপ্ত শরণার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। এখন বুঝলাম, গতকাল কেন তিনি আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন নি, এবং কেনই বা গতকাল থেকে বি. এম. স্কুলে পুলিস প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে—যাতে অত্যাচার কাহিনীগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ না করতে পারে। চকিতে মনে হল, ভাগ্যিস্ কাল আমি ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেবের দেখা না পেয়ে বিফলমনেরাথ হয়ে ফিরেছি, নতুরা আমারও কপালে আজ প্রেমাংশুবাবুর সঙ্গে শ্রীঘরবাস ঘটত।

আরো খবর, গতকাল সতীন সেনকে আর্যলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের উপরতলা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর গ্রেপ্তারের কারণ ঠিক জানতে পারি নি। তবে তিনিই বরিশালের একমাত্র হিন্দু জননায়ক যাঁর অভয়বাণী ও সবল প্রচেষ্টায় এই বিপদের মধ্যেও হিন্দু জনগণ ভরসায় বুক বেঁধে হয়তো সংঘবদ্ধ হবার প্রয়াস করতে পারে, এটিই যথেষ্ট কারণ। তাঁকে এরূপ অকারণ গ্রেপ্তারের অশোভনতা ঢাকবার জন্যই বোধহয় সরকারী মহল থেকে প্রচারিত হল, সতীন্দ্রনাথ সেনকে "Protective custody"তে রাখা হয়েছে।

বিপদের মাত্রা ক্রমশ ঘনিয়ে আসতে লাগল। দুপুরবেলা বেলা বারোটায় খেতে বসেছি, এমন সময় পেছনের ভাড়াটেদের বাড়ি থেকে একজন এসে ভয়বিহ্বলভাবে জানাল, ‘‘দুর্গাপ্রসন্ন বাবুদের ওপাড়া থেকে শুনে এলাম, পুলিসের লোক নাকি তাদের সব বাড়ি-বাড়ি বলে এসেছে, সবাই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাও, এখনই লুঠপাট্ আরম্ভ হবে।—দিদি এখন আমরা কী করি?''

শুনে আমার আপাদমস্তক যেন জ্বলে উঠল। প্রকাশ্য দিবালোকে, দ্বিপ্রহরে গুণ্ডার দল নোটিস্ দিয়ে ঘরবাড়ি লুঠ করবে, আর তারই পোষকতা করে পুলিসের লোক গৃহস্থকে বাড়ি ছেড়ে পালাবার পরামর্শ দিয়ে বেড়াচ্ছে!! আইনশৃঙ্খলা রক্ষকগণ কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখবে!! একি মগের মুলুক নাকি?—মুহূর্তমধ্যে ভ্রম সংশোধন করে নিয়ে বুঝলাম, না, এ মগের মুলুক নয়, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর, পাকিস্তানী মুলুক!

আর সহ্য হল না। আমি অভুক্ত অবস্থাতেই উঠে উচ্ছিষ্ট মাখা হাত ধুয়ে পুলিস সুপারের কাছে একখানা চিঠি লিখে ফেললাম। মর্ম এই, ‘‘দুপুর বেলাই দুর্বৃত্তগণ এ পাড়ার ঘরবাড়ি

লুণ্ঠন করবে বলে জোর জনবর শোনা যাচ্ছে; আমাদের বাড়ি সম্পূর্ণ লোকবলশূন্য এবং বিপদের সম্মুখীন। আপনি অবিলম্বে সশস্ত্র পুলিস প্রহরী পাঠিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করলে বাধিত হব।"—যদিও মনে মনে জানি কোনোই ব্যবস্থা হবে না। তবু আইনসঙ্গত চেষ্টা করে তো দেখা যাক্।

কিন্তু সমস্যা, চিঠিখানা পাঠাই কার হাতে? সুখরঞ্জন ঘরে আছে বটে, কিন্তু হিন্দু যুবকের পক্ষে এ সংকটে রাজপথে বেরোনো খুবই বিপজ্জনক। তদুপরি, পুলিস সুপারকে এ সময় বাড়িতে পাওয়া যাবে কিনা, এবং সুখরঞ্জন তাঁর সাক্ষাৎ-কার লাভে সমর্থ হবে কিনা, সবই সংশয়ের কথা। অগত্যা বুদ্ধি খাটিয়ে কম্পাউন্ডার সুরেশবাবুর শরণাপন্ন হলাম। মালীকে দিয়ে তাঁর কাছে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিলাম, তিনি যদি কোনো কৌশলে হাসপাতালের কোনো কর্মচারীকে দিয়ে ওটি পুলিস সাহেবের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

আবার এসে বসলাম, আহারপর্ব সমাধা করলাম।

এদিকে পিছনের দুই বাড়ির আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে এসে আমাদের উঠোনে ও বারান্দায় ভিড় করেছে। কোথায় যাবে? কিভাবে প্রাণ, মান বাঁচাবে? কোথাও একটু আশ্রয় চাই!

এ হেন বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে কী করা কর্তব্য কিছুই ভেবে পেলাম না। হঠাৎ মনে হল, পাশের বাড়ির ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের কথা। তাড়াতাড়ি পরশুকার রাতের মত পাঁচিলে মই লাগিয়ে অর্ধেক পথ উঠলাম। মুখ বাড়িয়ে একজন লোককে ডেকে বললাম, ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের স্ত্রীকে একবার ডেকে দিতে। বিবিসাহেবা খানিকক্ষণ পরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এদিক্‌কার বিপদের কথা জানিয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য তাঁর বাড়িতে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। প্রথম রাত্রে এঁদের সহৃদয়তা যা দেখেছিলাম, তাতেই আশান্বিত হয়ে ভেবেছিলাম, এই বাড়িতে একটি নিরাপদ আশ্রয় মিলবে। কিন্তু যা উত্তর পেলাম, একেবারে অপ্রত্যাশিত। বিবিসাহেবা বিরসবদনে জানালেন, "দেখুন, ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব বাড়িতে নেই, মফঃস্বল গেছেন। পুলিস অফিস থেকে আমাদের মানা করে গেছে, বাড়িতে কাউকে আশ্রয় দেবেন না, দিলে বিপদ হবে।" আমি হতাশ হয়ে বোকার মতো তর্ক করলাম, "এতগুলো ছেলে, মেয়ে, বুড়োমানুষ— এরা আপনাদের চোখের সামনে এরকম ভাবে মরবে?—"

"দেখুন, আমি কী করব? আমার কিচ্ছু সাধ্য নেই।" বলে বিবিসাহেব প্রস্থান করলেন। আমি নেমে এলাম।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে বাড়ির প্রাচীর ছাড়িয়ে, দক্ষিণে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের প্রশস্ত কম্পউন্ড পেরিয়ে দূরের সদর রাজপথ পর্যন্ত অবাধে দেখা যায়। দেখলাম, শরণার্থী বোঝাই পুলিসের ভ্যান, লরী ইত্যাদি সাগরদির পথে ছুটোছুটি করছে। সদর হাসপাতাল থেকে যে-সব অল্প আহত নরনারীকে খালাস দেওয়া হয়েছে, এবং আরো অন্যান্য স্থানের উৎপীড়িত শরণার্থীদের, সাগরদির সরকারী মূক্‌বধির বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, জানতে পারালাম। বি. এম. স্কুলের মতো এখানেও একটি শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। পরে খবর পেয়েছি, নলিন ভাইপোদেরও সদর হাসপাতাল থেকে খালাস করে এই কেন্দ্রে আনা হয়েছে।

হট্টগোলে বেলা গড়িয়ে তখন আড়াইটে-তিনটে। দেখলাম, তিনটি লাঠি-পুলিস আমাদের সদর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। তারা এসে রিপোর্ট করল, পুলিস সাহেব তাদের এখানে ডিউটিতে পাঠিয়েছেন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কেননা, গুণ্ডার দল হৈ-হৈ করে বাড়িতে ঢুকে পড়লে সশস্ত্র পুলিসের পরিবর্তে এই তিনটি নিরস্ত্র লাঠি-পুলিসের পক্ষে তাদের বাধা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবু তো পুলিসসুপার মান রেখেছেন!

ইতিমধ্যে সুরেশবাবু একটি লোক মারফত খবর পাঠালেন, আজ যেন আর রাতের বেলায় তাঁর ওখানে শুতে না যাই। পুলিস সাহেব আজ পুলিস হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এসে ডাক্তার সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন হাসপাতাল কম্পাউন্ডে যেন কোনো হিন্দুকে আশ্রয় দেওয়া না হয়। সুতরাং আজ রাত্রে যেন আমরা অন্য কোথাও আশ্রয়ের চেষ্টা করি।

বিপদ একা আসে না। একে একে সমস্ত দিক থেকে সকল দরজা বন্ধ হয়ে আসছে। তখনো দক্ষিণের একটি খোলা। অবিলম্বে দক্ষিণ দিকের সংলগ্ন বাড়ির ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রীকে একটা চিরকুট লিখে পাঠালাম, অবস্থা আজ বেগতিক! তাঁর ওখানে মাকে নিয়ে আজ রাতের মতো থাকতে পারি কিনা? ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মিঃ ফজলুল হক ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই অমায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব-বিশিষ্ট। আমাদের বাড়ির সঙ্গে তাঁদের বহুদিন থেকেই প্রতিবেশীসুলভ হৃদ্যতা। সুতরাং এখানে নিরাশ হব না বলেই মনে হল! -আশাভঙ্গ হল না। বিবি সাহেবা তৎক্ষণাৎ উত্তর পাঠালেন—"নিশ্চয়ই আসবেন। আপনার মাকে নিয়ে এখনই চলে আসুন। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি।" এ রাতের জন্য নিশ্চিন্ত হলাম। যদি দিনমানের মতো বাঁচি। সন্ধে হতে এখনও দু-তিন দণ্ড বাকী। সূর্যাস্তের আগে অর্থাৎ দিবালোকে দুর্বৃত্তদের চোখের সামনে ঘরবাড়ি ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যাবার অসম্মান সহ্য করতে মন কিছুতেই রাজি নয়। বরঞ্চ, যথাসম্ভব মাথা উঁচু রেখে সাহসের পরিচয় দেওয়াতে কিছু কাজ হতে পারে।

বেলা পড়ে আসছে। কাজকর্ম সন্ধ্যার পূর্বে যথাসম্ভব গুছিয়ে নিচ্ছি। খাবার ঘর থেকে থালা হাতে করে বেড়াল-কুকুরদের ভাত-মাছ বার করতে রান্নাঘরে ঢুকছি, এমন সময় হঠাৎ কে এসে ডাকল, "শান্তিদি"।—একেবারে রান্নাঘরের সিঁড়ির সামনে। তাকিয়ে দেখলাম, একটি অপরিচিত যুবক। প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেই সে পরিচয় দিয়ে বলল, "আমি জালালুদ্দীন; আপনার ছাত্র।"

হতে পারে, বহু ছাত্র আছে, সবাইকে আমি চিনি না। বলল, সে এই আলেকান্দা পাড়াতেই থাকে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার?"

"এই আপনাদের খোঁজখবর নিতে এসেছি। কী ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করলেন দেখতে এলাম।"

বললাম, "ব্যবস্থা আমরা আর কী করব? করবে তো তোমরা। গুণ্ডারা যাতে কোনোরকম উচ্ছৃঙ্খলতা, অত্যাচার না করতে পারে, সেটা দেখা তো তোমাদেরই কর্তব্য!"

সে একটু আমতা আমতা করে কথাটা এড়িয়ে বলল, "সে তো ঠিকই। কিন্তু শান্তিদি, আপনাদের বাড়িতে এত সব লোকজন জড়ো হয়েছে, বাইরের রাস্তা থেকে সব দেখা যাচ্ছে। এদের সরিয়ে দিন।"

বললাম, "কেন?"

"দেখে মনে হচ্ছে, এটা হিন্দুদের একটা ঘাঁটি! এতে হয়তো বিপদ হতে পারে!"

"তা কী করা যাবে? যখন জনরব শোনা যাচ্ছে, লুঠপাঠ হবে, অথচ রক্ষা করবার জন্যে কেউ এগিয়ে আসছে না, এরা সন্ত্রস্ত হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তখন এদের তো সরিয়ে দিতে পারব না।"

বিড়ালের ভাত আর বাড়া হল না, থালাখানা রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বড়ো দালানের দিকে ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চললাম। কোনো রকমে একে তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।

জালালুদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে চলল। দু'-চারটে কথার প্রত্যুত্তর করতে করতে তাকে নিয়ে গেটের দিকে অগ্রসর হলাম। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সদর গেট খুলে একজন বিপুলায়তন গুণ্ডামতন চেহারার লোক রাজপথ থেকে আমাদের বাড়িতে ঢুকছে। আমি জালালের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, অন্দর বাড়ির গেটে। সেখানে থেকে সদর ফটকের দূরত্ব অনেকখানি।

জালালুদ্দীন সেদিকে দৃষ্টিপাত করে ব্যস্তভাবে বলল, "শান্তিদি, আপনি ভেতরে যান!"

"কেন?"

" ঐ দেখুন-না, একজন লোক আসছে!"

মুখের সাহস অক্ষুণ্ণ রেখে বললাম, "লোকটি যখন আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে, আমার সঙ্গে দেখা করতেই আসছে অবশ্য। আমি ভেতরে যাব কেন?"

জালাল একটু ব্যস্তভাব দেখিয়ে বলল, "তাহলে আপনার হাতের চুড়িগুলো খুলে ফেলুন!"

আমিও নাছোড়বান্দা! বললাম, "চুড়িই বা খুলব কেন? ও লোকটি যদি আমার চুড়ি নিতেই এসে থাকে, তাহলে চাইলে পরে তখন খুলে দেব।"

অদূরে বাঁধানো বেঞ্চিটার উপরে লাঠি-পুলিস তিনজন বসে বসে আমাদের বাক্যলাপ শুনছিল। একজন একটু হেসে অপর একজনকে বলল, "হাঁ, এনাদের জানের ভয় নেই।"

জালালুদ্দীন তাড়াতাড়ি কথা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে রাস্তার আধা-আধি পথে আগন্তুকটির সঙ্গে মিলল। কী কথাবার্তা হল দেখলাম, শুনতে পেলাম না। তার পর দুজনে একত্র হয়ে সদর রাস্তার দিকে ফিরে চলল।

আমিও ঘরে ফিরলাম। ভাবলাম, "সাকরেদ্ নাকি?"

একটু পরেই অদূরে পুলিস-লাইনে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল। পাহারাদার লাঠি-পুলিস তিনটি সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় চলমান লোকজন, পুলিস প্রভৃতিদের মধ্যে কেমন যেন একটা সচঞ্চল সাড়া পড়ে গেল। পুলিস প্রহরী তিনজন "ঐ ঘন্টি বেজেছে; আমরা এখন চললাম, হাজিরা দিতে হবে" বলে দ্রুত প্রস্থান করল।—অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। নূতন আবার কী ঘটল?

কিছুক্ষণের মধ্যে লোকমুখে শুনতে পেলাম, সাগরদির দিক থেকে নাকি পাঁচশত নমঃশূদ্র সশস্ত্র হয়ে শহরে ঢুকছে, মুসলমানের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে। এই জনরবে স্থানীয়

মুসলমান জনতা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, এবং কর্তৃপক্ষ তাদের রক্ষার জন্য জোর পুলিস মোতায়েন করবার উদ্দেশ্যে পাগলা ঘন্টি বাজিয়েছেন। জনরবটি বিশ্বাসযোগ্য যদিও মোটেই নয়, তবু যেন সূচীভেদ্য অন্ধকারে একটু বিদ্যুতের ঝলকের মতো মনে একটুখানি আশার রেখা ঝলকে গেল। সত্যি সত্যিই নমঃশূদ্র হিন্দুরা প্রতিশোধ নিতে আসছে কি?

পরে জানা গেল জনরবের ভিত্তি কিছুই নেই। হয়তো বা মুসলমান জনতাকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে অভিসন্ধিমূলক প্রচার।

বেলা আর বেশি বাকী নেই। সূর্যাস্তের গাঢ় আবরণ নেমে আসছে। বারান্দায় একটা জোরালো বৈদুতিক আলো জ্বালিয়ে রেখে রাত্রিবাসের জন্য স্থানান্তর গমনের উদ্যোগ করলাম। দুপুর বেলা সুরেশবাবু যখন রাত্রিকালে আশ্রয় দানের অক্ষমতার খবর পাঠিয়েছিলেন, তখন গোপনে এ কথাও জানিয়েছিলেন যে, ডাক্তার সাহেব বাড়িতে সারারাত একটি জোরালো আলো জ্বালিয়ে রাখবার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে বাড়ির ওপর কোনোরূপ আক্রমণাত্মক হামলা হলে তিনি হাসপাতালের দোতলা থেকে লক্ষ্য রাখতে পারেন।

আমাদের বাড়ি ও ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাড়ির মধ্যে দিয়ে একটি প্রশস্ত নালা সীমানা রক্ষা করছে। বর্ষাকালে নালটি জলে বেশ ভরে ওঠে; বাবা সেই নালার জলে কতদিন ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন, শীতকাল সেটি শুকিয়ে আসে। শীতের শেষে এখন একেবারে শুকনো। সুখরঞ্জন মাকে পাঁজাকোলে করে সেই শুকনো নালাটি অতিক্রম করে দিল।

বাড়ি প্রকান্ড দ্বিতল। গিয়ে দেখি, আমাদের পশ্চিম খণ্ডের প্রজারা এবং আরো কোনো কোনো হিন্দু পরিবার ইতিমধ্যেই বাড়িটি ভর্তি করে ফেলেছে। সাহেব সম্পূর্ণ নীচের তলাটি আশ্রয় প্রার্থীদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। দুপুরে লুটপাটের আশঙ্কা দেখা দিতেই এরা এদের সংসারের যাবতীয় পোঁটলা পুঁটলি এখানে এনে জড় করেছে। বাড়িটি সাহেবী ধরনের। শৌচাগারে কমোড্ পাতা। দেখি, সেগুলো এধারে-ওধারে সরিয়ে কোনো মতে সকলে নিজ নিজ জিনিসপত্র রাখবার ও শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। থাকবার জন্যে যে কখানা বড়ো বড়ো কামরা, তাতে স্থান সংকুলান হচ্ছে না।

মার ও আমার জন্যে পৃথক একটা ঘরে খাটের ওপরে পরিপাটি বিছানা পাতাই ছিল। মাকে তার ওপর শুইয়ে দিলাম।

এতগুলি লোক, অথচ, একেবারে নিঃশব্দ, নিঝঝুম। কেননা, বাইরে থেকে একটু আওয়াজ শোনা গেলেই বিপদ্। দুর্বৃত্তেরা নিশ্চয়ই হিন্দু শিকারের সন্ধানে ঘুরছে। রাত্রি গভীর না হতেই গভীর রাতের মতো বোধ হতে লাগল। কাঁথা, কম্বল, লেপ, যার যা জুটেছে, তাই সম্বল করে মুড়ি দিয়ে সব কটি প্রাণী যেন নিশ্বাস রোধ করে রাত্রিযাপন করতে লাগল। ওপরে দোতলায় গৃহস্বামী মিঃ হক্ বন্দুক সজ্জিত রেখে সতর্ক পাহারায় সজাগ রইলেন।

রাতে আমাদের আরাম শয্যায় ঘুম হতে পারত ভালোই, কিন্তু ঠিকমত হল না। কেননা, নৈঃশব্দ বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কেশোরুগী অমর সিংহের বারংবার কাশি কিছুতেই দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না; বাচ্চা-কাচ্চাদের মুখ চেপে ধরেও মায়েরা তাদের কান্না থামাতে পারছেন না সব সময়। আমার ঘুম নানা রকম বিচিত্র শব্দে মাঝে মাঝেই ভেঙে

যাচ্ছে। রাত্রির এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে হঠাৎ যেন আমার প্রচন্ড হাসি পেল।

তৃতীয় রাত নিরাপদে অতিক্রান্ত হল। প্রত্যূষে আবার মাকে নিয়ে নালা পেরিয়ে বাড়ি ফিরলাম। চারদিক্ গভীর কুয়াশার আবরণে ঢাকা, বাইরের কোনও প্রাণী আমাদের যাতায়াত দেখতে পেল না। একটু বেলা হলে যথারীতি মালী কাজে এল, মুসলমান গয়লা দুধ দিয়ে গেল। আমিও যথারীতি "প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং" দিবসের নিত্যকর্মগুলি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হলাম। লোকেরা সবাই জানল, আমি নিরুদ্‌বেগে নিজের বাড়িতেই দিন কাটিয়ে যাচ্ছি।

মাঝে মাঝে এদিক্ ওদিক থেকে লোকমুখে যেসব সংবাদ কানে আসছে, তাতে মনে হচ্ছে, শহরের তান্ডবনৃত্য যেন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে, হত্যাকান্ড ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। মাধবপাশা, মুলাদি প্রভৃতি স্থানে বীভৎস হত্যালীলা অবিশ্বাস্য কাহিনীর মতো ক্রমাগত কানে এসে পৌঁছুতে লাগল। খাস শহরের খবর একটি মাত্র শুনলাম, গতরাত্রে বগুড়া পাড়াস্থিত গৌড়ীয় মঠের তিনজন গৈরিকধারী সাধুকে মঠের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে। এ কয়দিনের ঘটনা-পরম্পরায় আমাদের স্নায়ুমন্ডল যেন একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছে, কোনো কিছুতেই যেন আর সচকিত হয়ে সাড়া দেয় না। নিরীহ, নির্বৈর বৈষ্ণব সাধুদের হত্যার এ মর্মন্তুদ কাহিনী শুনেও যেন কেমন নিথর হয়ে রইলাম।

দুপুরবেলা "তুলির মার" মেয়ে সুকেশিনী এল। বেড়াতে, না কুশল জিজ্ঞেস করতে, না মজা দেখতে, ঠিক বুঝলাম না। কেননা, কুশল প্রশ্নাদি করার পরই ইনিয়ে বিনিয়ে বল্‌ল, "দিদি, আজ বোধহয় আপনাদের বাড়ি চড়াও করবে।"

প্রশ্ন করলাম, "কী করে জান্‌লে?"

"আমাদের পাড়ার ওদিকে বলাবলি শুনলাম, আজ দেবপ্রসাদ বাবুর বাড়ি আক্রমণ করবে। এবার আর আগুন দেবে না, কেটে কুচি কুচি করবে।"

কথাগুলো শুনে মনে বিষম বিরক্তি ও ক্রোধের উদ্রেক হল। মুসলমানেরা এসে আমাদের কেটে কুচি কুচি করবে এ সম্ভাবনায় নয়, সুকেশিনীর মুখ থেকে কথাগুলো যে মুখব্যঞ্জনায় ও বাচনভঙ্গীতে পরিবেশিত হল, তার আনন্দিত ইঙ্গিতে। মনে হল, যেন নিজেরা খৃষ্টান পাড়ায় নিজ নিজ ঘরে বড়ো হরফে "খৃষ্টান" শব্দটি এবং ক্রুশচিহ্ন এঁকে মুসলমানের রোষবহ্নি থেকে সুরক্ষিত হয়ে হিন্দুর দুর্দশায় তামাসা দেখতে এসেছে। আমাদের বাড়ি যে মুসলমান-পরিবেষ্টিত হয়েও অদ্যাবধি মুসলমান-কর্তৃক আক্রান্ত হল না, আমরা পালালাম না, নির্ভয়ে নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত আছি, এটা যেন তার সহ্য হচ্ছে না; তাই ভয় দেখাতে এসেছে। তার কথার কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর না দিয়ে বিরক্তিভরে এদিকে চলে এলাম। (জীবনের রঙ্গমঞ্চে— শান্তিসুধা ঘোষ)

কবি'র চোখে দাঙ্গার ভয়াবহ দৃশ্য

বরিশাল ঝালকাটির খ্যাতনামা কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার দাঙ্গার সময় কুমিল্লা জেলার গৌরীপুরের আশেপাশে কবিগান করছিলেন। তারপর স্বয়ং কবিয়ালের কথায়:—

নৌকা থামা, বাদাম নামা

১৯৫০-এর আরম্ভ। হঠাৎ সংবাদ এলো যে নোয়াখালীর 'রায়টের' চেয়েও খুব বড় 'রায়ট' আরম্ভ হয়েছে বরিশালে। স্থানীয় গুণ্ডাদের সঙ্গে বিহারী মুসলমানরা যোগ দিয়ে হিন্দু-ধ্বংস অভিযান শুরু করেছে। সংবাদ শুনে নকুলেশ্বর বড় বিচলিত হয়ে পড়লেন। দল বন্ধ করে দেশে যাওয়ার মনস্থ করলেন। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁকে নিষেধ করতে লাগলেন— আপনি এসময় বরিশাল রওনা হবেন না, পথে আপনার বিপদ হতে পারে। শুনেছি ষণ্ডা গুণ্ডার দল এক অরাজকতা আরম্ভ করেছে—নদীপথে বেপারী মহাজন যার নৌকা পায়, খুন জখম করে সব লুটপাট করে নিয়ে যায়।

নকুলেশ্বর বললেন—দেশের আত্মীয়-পরিজন যারা আছে তাদেরই যদি মেরে ফেলে তবে আমি বেঁচে থেকে লাভ কি! আমার যেতেই হবে। গৌরীপুর বাজারে সোনা মিঞা নামে একজন বড় কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে নকুলেশ্বরের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি বললেন—একান্তই যদি যেতে হয়, তবে হিন্দু পরিচয় দেবেন না—পথে ঘাটে মুসলমান পরিচয় দেবেন। এই বলে তিনি দলের সব পুরুষদের একটা করে লুঙ্গী ও একটা করে সাদা টুপী এবং মেয়েদের তিন জনের জন্য তিনটা বোরখা দিয়ে বললেন—বন্ধুর এই দান গ্রহণ করুন। খোদার কি মরজি; জানিনা আর দেখা হবে কিনা। খোদার কাছে মোনাজাত করি যেন আপনাদের মঙ্গলে রাখেন—এই বলে সাশ্রু নয়নে নকুলেশ্বরকে বিদায় দিলেন।

বরিশাল অভিমুখে নৌকা চলল—মাঝি মাল্লাসহ সকলের ঐ মুসলমানী পোষাক। বাদাম দিয়ে নৌকা ছুটেছে, সবার প্রাণে আতঙ্ক; কি হয় কি হয়! নৌকার মধ্যে কোন সাড়া শব্দ নেই।

নকুলেশ্বরের দলে তখন গায়িকা ছিল চারজন—মানদা, হিরণবালা, কিরণবালা ও শরৎবালা। এরা সবাই বোরখা পরে নিয়েছিল। পুরুষদের মধ্যে দলের ধরতা দোহার ছিল—আচার্যকর্তার দলের সেই সুবল ও বিহারী। তাদের বাড়ী ছিল কুমিল্লায়। দল বরিশাল আসার পথে তারা বাড়ী চলে গেল। নৌকায় রইলেন নকুলেশ্বর স্বয়ং, ঢুলি হরিচরণ, হারমোনিবাদক অশ্বিনী শীল, আর তিন জন মাঝি—তাদের নাম শিশু মণ্ডল, বাহেরালী ওরফে কালাচাঁদ এবং নকুলেশ্বরের বাড়ীর পাশের ইঞ্চি হাওলাদার—সে বারোমাস নৌকা-রক্ষক হিসেবে নৌকায় থাকত।

মোট এই নয়টি প্রাণী প্রাণ হাতে করে বরিশাল অভিমুখে মেঘনার বুক চিরে অগ্রসর হলো। মাঝি মাল্লা সহ সকলের ঐ মুসলমানী পোযাক। বাদাম দিয়ে নৌকা ছুটেছে। আশে পাশে অন্য নৌকা পাশ কেটে গেলে একটু স্বস্তি। নৌকার মধ্যে কোন সাড়া শব্দ নেই। যে নকুলেশ্বরের পান্‌সী নৌকা সর্বদা গানবাজনার শব্দে থাকত আনন্দ কোলাহলে মুখরিত, সেই নৌকা আজ নিষ্প্রাণ নিষ্পন্দ। নৌকা থেকে তাঁর বিজয় কেতন "বীণাপাণি কবি পার্টি" নামাঙ্কিত বোর্ড সরিয়ে "সার্কেল অফিসার" নামাঙ্কিত ভূয়া বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হোল।

বারো আনা পথ কেটে গেল। কোন বিপদের চিহ্ন নেই। প্রায় বরিশাল জেলার কাছাকাছি ফরিদপুর-বরিশালের বর্ডারে নৌকা এসেছে। বেলা ১০টা। এমন সময় দেখা

গেল, পনের বিশ খানা ডিঙ্গি ছিপ্ নৌকা—এক এক নৌকায় বিশ পঁচিশ জন করে লোক—ল্যাজা, সড়্কী, রামদাও ইত্যাদি হাতে নিয়ে নকুলেশ্বরের নৌকা ঘিরে ফেলে হাঁক্ দিচ্ছে—নৌকা থামা, বাদাম নামা—ইত্যাদি কোলাহল।

নকুলেশ্বর মাঝিদের বললেন—সাহস করে তোরাও একটু জোরে জোরে বল—কেন রে, নৌকা থামাব কেন রে? এটা সার্কেল অফিসারের নৌকা। বরিশাল কোর্টে যেতে হবে, এখন সময় নাই। মাঝিরা এবং দলের লুঙ্গীপরা পুরুষ কয়জন একত্র হয়ে ঐ কথা বলে খুব জোরে জোরে উত্তর দিচ্ছে।

গুণ্ডারা বলে—কেমন সারকেল্ অফিসার আমরা দেখব। ভাগ্য ভালো ছিল, নৌকাগুলি ত্রিশ চল্লিশ হাত তফাতে ছিল।

নকুলেশ্বর ভাবলেন—ওরা যদি নৌকার পার্শ্বে এসে নোকায় উঠে পড়ে তখন তো আর করণীয় কিছু থাক্‌বেনা; আগেই বাধা দেওয়া দরকার। এই ভেবে নকুলেশ্বর একটা ভালো জামা গায় দিয়ে গুলীর বাক্স ও বন্দুক নিয়ে লাফ দিয়ে ছাদের উপরে উঠে ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন, এবং বন্দুকে গুলী ভরে বললেন—আয়, সারকেল অফিসার দেখবিতো আয় শালারা! মগের মুল্লুক পেয়েছিস? এই বলে দুম্ দাম্ করে ২।৩ টা ফাঁকা আওয়াজ করামাত্র-পাখীর চকে ঢিল পড়ার মতো ওরা সব ছুট্ ছুট্ চারদিকে পালিয়ে গেল। নকুলেশ্বর ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে খালের মধ্যে ঢুকে বললেন-যাও, ফাঁড়া কেটে গেছে।

খালের মধ্য দিয়ে যত অগ্রসর হচ্ছেন ততই রায়টের বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ছে। হিন্দুর গ্রাম বলতে কোন চিহ্ন নেই। শুধু ভস্মের স্তূপ। এমন ভাবে আগুনে পুড়িয়েছে যে তাল নারিকেল গাছের মাথা পর্যন্ত পুড়ে গেছে।

খালের দুই ধারে ঝোপ জঙ্গলে খালের জলে অসংখ্য মরা মানুষ ভেসে যাচ্ছে। এইসব দৃশ্য দেখে নকুলেশ্বরের চোখে জল এলো—হায় ভগবান! একি প্রলয় দৃশ্য দেখালে? দু'তিন মাস আগে এই খাল দিয়ে যখন ঢাকা, ত্রিপুরা যাচ্ছিলেন তখন প্রত্যেকটা বাড়ী ধনে জনে শিশুর কলকোলাহলে পূর্ণ; আজ সব বাড়ীতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা!

নকুলেশ্বর মনে মনে ভাবছেন—আমাদের গ্রামেও কেউ বোধ হয় বেঁচে নেই। কালিজিরা নদীতে পড়ে বাড়ীর দিকে যত এগুচ্ছেন ততই যেন তাঁর হাত পা অবশ হয়ে আসছে। এই নদীর পাড়েই তাঁর বাড়ী। নদীর ঘাট হতে রসি দুই তফাত।

গৃহ না শ্মশান—কলকাতায় আশ্রয়ের সন্ধানে

বাড়ীর ঘাটে গিয়ে নকুলেশ্বর মাঝিদের বললেন—নৌকা ঘাটে ভিড়িও না; মাঝ গাঙ্গে নোঙ্গর কর। নকুলেশ্বরের নৌকা দেখে গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর মুসলমান নদীর কূলে এসে ডাকলেন—সরকার মহাশয়, মাঝ গাঙ্গে নৌকা বাঁধলেন কেন? কিনারে আসুন। আপনার কোন ভয় নেই। আমাদের এখানে 'রায়ট' হয়েছে বটে, কিন্তু কাটাকাটি হয় নাই। আসুন—নেমে বাড়ী যান।

নকুলেশ্বর বললেন—বাড়ী যাব—বাড়ী কি আছে?

মাতব্বররা বললেন—আছে আছে; গ্রামের অন্যান্য বাড়ী ঘর পুড়ে দিয়েছে। আপনার জারিগানের 'বয়াতি' শিষ্যেরা আপনার ঘরে আগুন দিতে দেয় নাই, যান বাড়ী যান। নকুলেশ্বর ঘাটে নৌকা এনে ছুটে বাড়ী গেলেন। গিয়ে দেখেন বাড়ীতো নয় যেন শ্মশান। ঘরখানা মাত্র সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে; চাল বেড়া ছাড়া আর কিছুই নেই; এমন কি ঘর কুড়ানো ঝাঁটা গাছাটা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। অন্যান্য কোন বাড়ীতে ঘরের চিহ্নও নেই—সব পুড়ে ছাই করে গিয়েছে। নকুলেশ্বরের স্ত্রী-পুত্র পরিজন সব কেউ বনজঙ্গলে, কেউ মুসলমান বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে কোন প্রকারে বেঁচে আছে।

নকুলেশ্বর বাড়ী এসেছে সংবাদ পেয়ে সকলে এসে জড়ো হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। ওদিকে গ্রামের মাতব্বর মুসলমানরাও এসে নানারকম সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারা বললেন—পশুর দলেরা যা করেছে, খুব অন্যায় করেছে। আপনি গ্রামের সকলকে বলুন, কেউ যেন সরকারী ক্যাম্পে না যায়। আমরা লুটের মাল ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করব।

প্রকাশ্যে নকুলেশ্বর বললেন—আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করুন। কিন্তু মনে মনে বললেন—কি বিশ্বাসঘাতকতা, কি অকৃতজ্ঞতা! এদের অসাধ্য কর্ম কি আছে? যাদের পূজা-পার্বণ আনন্দ উৎসবে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছি, বাবার শ্রাদ্ধে গ্রামশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছি, আমার বাড়ীর দরজায় রান্না করে তারা খেয়ে গেছে। আজ তাদেরই এই কাজ? আর ওদের কথায় বিশ্বাস করব না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বললেন না।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা মাতব্বর মিঞারা এসে বসতেন। আর সামান্য কিছু লুট করা মাল—ভাঙ্গা পিঁড়ি, টুটা থালা এনে ফেরৎ দিতেন। ইস্‌লামী রাষ্ট্রে ''জিম্মি''র অবস্থা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া পেল।

দু'চার দিন এভাবে চলার পর নকুলেশ্বর মাঝিমাল্লা ছাড়া আর সকলকে বিদায় দিলেন। কারো কাছে কিছু না বলে একদিন কলকাতা রওনা হলেন। কিন্তু সে কি এক অস্বস্তিকর অবস্থা! ষ্টীমারে ট্রেনে সুঁচ ফোটাবার জায়গা নেই। লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়ের জন্য একবস্ত্রে ছুটেছে। জনস্রোতের ঢেউ যেন পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিবঙ্গের সীমান্তে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। প্রাণভয়ে ভীত মানুষের চেহারা কি ভীষণ হতে পারে—তিনি সেদিন তা প্রত্যক্ষ করলেন। আর তাদের মধ্যেই দেখলেন তাঁর কবিগানের পরমভক্ত—মণ্ডল-বিশ্বাস-হাওলাদার-দে-দত্ত-দাস-ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্র-মজুমদার-সিংহ-পাল-ভট্ট-সাহা-বণিক-কুণ্ডু-মুখার্জী-ব্যানার্জী-চক্রবর্তী-ভট্টাচার্য-নাথ-শীল ধূপী-গুপ্ত-সেন-রায়-চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিধারী পূর্ববঙ্গের কবিরসিক শ্রোতাদের ধনমান-জীবনহারা অসহায় মলিন মুখ। সাত পুরুষের সোনার ভিটা ছেড়ে অনিশ্চিত অন্ধকারে তাদের পদক্ষেপ।''

(কবিয়াল : কবিগান—দীনেশচন্দ্র সিংহ)

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ববাংলায় হত্যালীলার মর্মন্তুদ কাহিনী

ঢাকা শহরে হিন্দুদের ধ্বংস সাধন সমাপ্ত করে দাঙ্গাবাজদের নজর পড়ল ঢাকা-গামী ও ঢাকা থেকে বহির্গামী ট্রেনের উপর। পঞ্চাশের দাঙ্গার পর খ্যাতনাম জননেত্রী লীলা রায় সম্পাদিত 'জয়শ্রী' পত্রিকার পক্ষ থেকে জয়ন্ত দাশগুপ্ত দাঙ্গা বিধস্ত এলাকা পরিদর্শন করে -ধারাবাহিকভাবে চার কিস্তিতে তাঁর প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা "পূর্ববাংলায় হত্যালীলার মর্মন্তুদ কাহিনী" শিরোনামে 'জয়শ্রী' তে প্রকাশিত হয়। পঞ্চাশের দাঙ্গার এর চেয়ে তথ্যপূর্ণ বিবরণ আর কোথাও নেই। উক্ত রচনার মুখবন্ধে সাংবাদিক জয়ন্ত দাশগুপ্ত লিখেছেন :

যারা ভুক্তভোগী, হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষজ্ঞানী তাদের কাছ থেকেই এই কাহিনীর তথ্য নেওয়া হয়েছে। ট্রেনে-ষ্টীমারে কী কাণ্ড ঘটেছে এবার তারই কিছু বিবরণ দেওয়া হল।

॥ ১ ॥

[যারা ভুক্তভোগী, হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষজ্ঞানী তাদের কাছ থেকেই এই কাহিনীর তথ্য নেওয়া হয়েছে। ট্রেনে ষ্টীমারে কী কাণ্ড ঘটেছে এবার তারই কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।]

কেউ জানে নাই, কেউ ভাবেও নাই এমন কাণ্ড হইতে পারে। তাই নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। ট্রেনে ষ্টীমারে নৌকায় নানা কাজে নানা গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হইয়াছে। কিন্তু সকলের অজ্ঞাতে অনেক আগে হইতেই হত্যাকাণ্ডর যড়যন্ত্র তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। তাই হাজার হাজার নির্দোষ নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, কেহই আর ফিরিয়া বাড়ীতে আসিতে পারে নাই। কোনদিন আসিবেও না। ঘাতকের ধারালো অস্ত্রে তারা খণ্ড খণ্ড হইয়া নদীর চরে বা রেললাইনের দুধারে শকুনীগৃধিনীর ভক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। হত্যাকারীর দল প্ল্যানও করিয়াছে চমৎকার। কুশাগ্রপ্রখর দুষ্টবুদ্ধি তাদের। ট্রেনেষ্টীমারে পথে-ঘাটে হত্যা চালাইলে সংখ্যা নির্ণয় এবং নিহতদের পরিচয় ও ঠিকানা বাহির হওয়া ও প্রমাণ করা অসম্ভব হইবে। কোন সুদূর গ্রাম হইতে কে কোথায় যাইতেছে, কে কাহাকে চিনে। জলে ফেলিয়া দিলে বা মাটিতে পুতিয়া ফেলিলেই সব নিশ্চিহ্ন। অসহায় মেয়েদের লুঠিয়া লইয়া গেলে বা অত্যাচার করিলেই বা কোন্ অসামীকে কে চিনিবে! শহরে গিয়া পুলিশে খবর দিবেই বা কে? গ্রামে ও শহর হইতে বাহির হইবার সব পথেই চর ও গুণ্ডাদের গার্ড; বাস, যান চলাচল বন্ধ, চারদিকে লৌহযবনিকা বসাইয়া সমস্ত হিন্দুখৃষ্টানবৌদ্ধ যাত্রীদের এক ভয়ঙ্কর ফাঁদে আটকাইয়া হত্যা করা হইল।

১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৫।৬ দিন দিনরাত্রি ধরিয়া অবিরাম এই হত্যাকাণ্ড চলিয়াছে চলন্ত ট্রেনে, নৌকায়, ষ্টীমারে। ছুরি মারিয়া হত্যা করিয়া চলন্ত ট্রেন হইতে জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পোলের কাছে ট্রেন থামাইয়া কামরায় কামরায় হত্যা করিয়া লাশ জলে ফেলা হইয়াছে। আনসার, রেল কর্মচারি, পুলিশ সকলে একজোটে ইহা

করিয়াছে। ইঞ্জিন ড্রাইভার ও গার্ডেরা জায়গা মত গাড়ী থামাইয়া সহযোগিতা করিয়াছে। পুলিশ নির্বিকার চোখে তাকাইয়া রহিয়াছে। রেল-কুলীরা ও আনসাররা কখনো রেললাইনের মড়া উঠাইয়া জড় করিয়া গর্ত খুঁড়িয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কত লোক মারা গিয়াছে, নিখোঁজ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় কোনদিনই করা যাইবে না। তবে নমুনা স্বরূপ দুচারটে ঘটনা দেওয়া হইল।

১০ই ফেব্রুয়ারী হইতেই শুরু। গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমার চলিয়াছে। পথে মুন্সীগঞ্জ ষ্টেশনে অগণিত মুসলীম গুণ্ডা আসিয়া ষ্টীমার হইতে হিন্দু-যাত্রীদের জোর করিয়া নামাইয়া দিতে লাগিল। যাত্রীরা ভয়ে পলাইয়া নানা পথে কেহ কেহ পরদিন নারায়ণগঞ্জ আসিয়া পৌছিল। তখন ঢাকার হত্যাকান্ডের কিছু কিছু খবর জানিয়া ইহারা পরদিন ১২ই নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেনে স্ব স্ব গ্রামের বাড়ীতে পৌছিবার জন্য ব্যাকুল। সকালে ৮টায় গাড়ীতে সব হিন্দুরা একত্র হইয়া দুখানা কামরায় উঠিয়া পড়িল। ষ্টেশনে অবস্থা সন্দেহজনক। ভয়ে বুক দুরু-দুরু সবারই। রেল অফিসাররা অভয় দিয়া বলিল যে নরসিংহদি-ভৈরব যাইতে কোন ভয় নাই। নিরাপদে যাইতে পারিবেন। চারজন সশস্ত্র পুলিশ কামরা দুটীতে দেওয়া হইল। এ দুটী কামরা সম্পূর্ণ হিন্দুযাত্রী বোঝাই। অন্যান্য কামরায় হিন্দু ও মুসলীম যাত্রি মিশ্রিত হইয়া ছিল। ট্রেন গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে পৌছিবার সময়ে দেখা গেল, এই সব হিন্দু-মুসলীম মিশ্রিত কামরা হইতে হিন্দুদের ছুরি মারিয়া লাস জানলা দিয়ে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে হিন্দু কামরা দুখানার যাত্রীরা ভয়ে মৃতপ্রায় হইল। দয়াগঞ্জ পোল ছাড়াইতেই হঠাৎ ট্রেন থামিল এবং দেখা গেল চারজন সশস্ত্র ট্রেনরক্ষী পুলিশ নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মুসলমান যারা ট্রেনের দুপাশে অপেক্ষা করিতেছিল হিন্দু কামরাগুলি আক্রমণ করিল। ছুরি ও লোহার ডাণ্ডা দিয়া তাহারা নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করিল, ট্রেন রক্তে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। লাসগুলি বাহিরে ফেলিতে লাগিল। নরসিংদি থানার এক আশী বৎসরের বৃদ্ধা ভুবনেশ্বরী দাসকে অজ্ঞান অবস্থায় বাহিরে ফেলিয়া দেয়। অন্য সকল যাত্রিই হত। ভুবনেশ্বরীকে কেহ তুলিয়া নিয়া ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে দেয়, তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন। পরে নাজিরবাজার পুলের পরেও ট্রেন থামাইয়া বাকি হিন্দুদের হত্যা করা হয়। গতিকে জন দুই যাত্রির প্রাণ বাঁচে।

অধ্যাপক যতীশ দাস

অধ্যাপক যতীশচন্দ্র দাসের বাড়ী সিলেট। সম্প্রতি কিশোরগঞ্জের কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ পাইয়া মাত্র ২৫ জানুয়ারি তারিখে কাজে যোগ দিয়াছিলেন। একটা বাসা কিশোরগঞ্জ শহরে ঠিক করিয়া তিনি ১০ই ফেব্রুয়ারি সিলেট ফিরিয়া আসিলেন পরিবারবর্গকে লইয়া যাইবার জন্য। ১২ই প্রাতে ৬টার ট্রেনে সিলেট ষ্টেশন হইতে যতীশ বাবু পরিবার সহ রওনা হইলেন। পরিবারে স্বয়ং (৫৭), পত্নী লীলাবতী দাস (৪৫), পুত্র গৌতম (২৪), ঐ মঞ্জু (১৮), ঐ বাপ্পা (১৪), এবং অন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। গাড়ী ছাড়িয়াছে, দেখা গেল কিছু মালপত্র গাড়ীতে ওঠে নাই, বড় ছেলে গৌতম লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, সে পরদিন মাল সহ রওনা হইবে। সেদিন ট্রেনের অন্যান্য সবগুলি কামরা মিলিটারি দ্বারা

রিজার্ভ ছিল, কেবল যতীশ-বাবুদের কামরাখানাই যাত্রী বহন করিতেছিল। এ কামরাতে ৬০জন যাত্রীর সবাই মুসলীম, কেবল যতীশবাবুর পরিবার এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য ও তার স্ত্রী ও তিনবছরের কন্যা এরাই একমাত্র হিন্দু ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসিয়া ট্রেণ পৌঁছিল। ঐ সময়ে ঢাকা হইতে একখানা ট্রেন আসিয়াও স্টেশনে ঢুকিয়া পাশা পাশি দাঁড়াইল। ঐ ট্রেনের একটি কামরা রক্তেমাখা। লীলাবতী ডান পাশের ট্রেন হইতে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। এর অর্থ কি? উক্ত ট্রেণের যাত্রী এক মুসলীম যুবককে জিজ্ঞাসা করিলে সে হাত নাড়িয়া ইশারা করিল, চুপ করুন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ষ্টেশনে নামিয়া পড়ুন। বিপদের সংকেত পাইয়া যতীশ-বাবুরা নামিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হায়, বাহির হওয়ার উপায় কোথায়! কামরার ভিতরে, দরজায় মুসলীম যাত্রীদের ভীড়, ঠাসাঠাসি করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে ট্রেণ চলিতে শুরু করিয়াছে। ভয়ে এই কয়টী হিন্দু যাত্রীর প্রাণ শুকাইয়া গেল। তবে কী হইবে! সম্মুখে অজ্ঞাত, ভয়ংকর বিপদ, অথচ চারদিকে কোথাও সাহায্য করিবার একটী মানুষও নাই। কামরার মুসলমান যাত্রীদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, সে মুখ কঠিন ও উদাসীন।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ তাল-সহরে আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আনসার-পোষাক পরিহিত দুজন মুসলেম যুবক কামরায় উঠিয়া আসিল। ট্রেণ ছাড়িল। ইহারা কী চায়? কিন্তু এক মুহূর্তে আনসাররা অবিনাশ ভট্রাচার্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অবিনাশ বাবুর পত্নী আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, শিশু কন্যাটীও কাঁদিয়া উঠিল। ততক্ষণে অবিনাশবাবুকে দুর্বৃত্তেরা চলন্ত ট্রেণ হইতে ফেলিয়া দিয়াছে। শ্রীযুক্তা ভট্টাচার্য হইতে কাপড়-চোপড় গহনা কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের কাতর ক্রন্দনে কে কর্ণপাত করিবে? কামরার অপর প্রান্তে যতীশবাবু পরিবারবর্গসহ আতংকে আধমরা হইয়া রহিয়াছেন, শ্রীযুক্তা ভট্রাচার্যের আর্তনাদ ট্রেণের শব্দকে ছাপাইয়া উঠিতেছে, অথচ তাহাদের সাহায্যার্থে কামরার ভীড় ঠেলিয়া যাইবারও উপায় নাই। কয়েকজন মুসলেম মহিলাও এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কামরার মুসলমানরা তাহাদের আশ্বাস দিল, 'ভয় নাই, মুসলমানদের কোন ভয় নাই।' সেই মুহূর্তে মুসলমান কয়জন চেঁচাইয়া উঠিল, "এদিকেও আছে, এদিকেও আছে।" দুর্বৃত্তদল এইবার যতীশবাবুদের দিকে আগাইয়া আসিল। লীলাবতী দাস কাতর মিনতি করিলেন, গহনা টাকাকড়ি সব নাও, প্রাণে মারিওনা। তাকে ধাক্কা দিয়া ভূমিসাৎ করিয়া যতীশবাবুকে আক্রমণ করিল। যতীশ বলিতে লাগিলেন, "আমি পাকিস্তানী, আমাকে মারিও না" এবং ক্ষণকাল পরেই তাহাকে জানলা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। চৌদ্দ বছরের ছেলে বাপ্পাকেও মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। নৃশংস অত্যাচার যতক্ষণ চলিতেছিল, কামরার মুসলীম যাত্রীরা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, 'আল্লা-হু আকবর'। পুত্র মঞ্জুকে (১৮) নির্মমভাবে মারিতে লাগিল। বেঞ্চের পায়া ধরিয়া পড়িয়া ছিল সে। টানিয়া বাহিরে ফেলিতে দেরি হইতে ট্রেণ আসিয়া আশুগঞ্জ থামিল। দুর্বৃত্তেরা নামিয়া গেল, বোধ হয় আবার আসিয়া অবশিষ্টদের খতম করিবে। কিন্তু মাত্র এক মিনিট ট্রেণ থামে, তাহারা আসিয়া উঠিতে পারে নাই। অধ্যাপক যতীশবাবু ও ছেলে বাপ্পার দেহ ট্রেণপথে অজ্ঞাতস্থানে পড়িয়া রহিল, ট্রেনে রক্তগঙ্গা, পুত্র মঞ্জু মৃতপ্রায় মেজের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, অপর পুত্রকন্যারা অর্ধমৃতবৎ,

কিসের থেকে কী ঘটিয়া গেল! ট্রেন ভৈরববাজার আসিল, লীলাবতী দাস পুত্রকন্যাসহ নামিয়া রেলপুলিশের দারোগাকে দুঃখ-বেদনায় ভয়ে পাগলের মত অনুরোধ করিলেন কাহাকেও পাঠাইয়া স্বামী ও পুত্রের খোঁজ করিয়া আনিতে। কিন্তু কে শুনিবে? দারোগা বলে, মেঘানর ওপারে আমার এক্তিয়ার নাই, কিছু করা যাইবে না। তবে দুজন পুলিশ যারা ময়মনসিংহ যাইবে দারোগা তাদের সঙ্গে যাইতে বলিলেন। অসহায় মহিলা ছোট ছোট পুত্র কন্যা সহ অন্ধকার রাত্রিতে কিশোরগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। অপরিচিত স্থান, কোনদিন আসেন নাই। কোথায় যাইবেন তাহা জানেন না। ষ্টেশনে কত লোককে মিনতি করিলেন সাহায্য করিতে, কেহ শোনে না। টিকেট কালেক্টর টিকেট দাবি করে। স্বামী-পুত্রহারা লুণ্ঠিত-সর্বস্বা নারীর টিকেট কোথায়? অবশেষে দুজন সহৃদয় অপরিচিত যাত্রী অর্থ-দণ্ড দিয়া ইহাদের কিশোরগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। আজ পর্যন্ত যতীশবাবু, পুত্র বাপ্পা নিখোঁজ।

ভৈরব পুলে নগেন চ্যাটার্জি হত্যা ঃ হিন্দুদের মেরে মেরে জলে ফেলা হয়েছে।

ভৈরব পুল। মেঘনা নদীর উপরে। হাজার হাজার নরনারীর রক্তে মেঘনার কালো জল লাল হইয়া উঠিয়াছিল, কত নারী আর শিশুর অস্ফুট আর্তনাদ উঠিয়া শূন্য আকাশে মিলাইয়া গিয়াছিল, ভৈরবের বিশালকায় পুল তাহার নীরব সাক্ষী হইয়া থাকিল। পৃথিবীর আর কেহই তাহা জানিবে না।

১২ই ফেব্রুয়ারী। কিশোরগঞ্জ ষ্টেশনে এক-খানা কামরায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি সপরিবারে উঠিয়া বসিয়াছেন। তিনি কয়দিন আগে আসিয়া মায়ের শ্রাদ্ধকার্য শেষ করিয়া কর্মস্থল বানরিপাড়া (বরিশাল) ফিরিয়া যাইতেছেন। সেখানে তিনি পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের চাকরী করেন, সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টর। সঙ্গে আছেন স্ত্রী রমা চ্যাটার্জি, একমাত্র ছেলে অরুণ (৭), শিশু কন্যা সাথী (৪) ও পাখি (১½), ভাগিনেয় নিখিল ব্যানার্জি (২৭)। ঢাকায় গোলমাল হইয়াছে শুনিয়া চাঁদপুর-পথে নিরাপদ মনে করিয়া ভৈরবের গাড়ীতে উঠিয়াছেন। কিন্তু অদৃষ্ট অন্যরকম বিধান করিয়াছিল। পাকিস্তান সরকারের চাকুরীতে আর যোগ দেওয়া হইল না। করাল মূর্তিতে মৃত্যু আসিয়া পথরোধ করিল । ১২টায় ভৈরব পৌছিয়া একঘন্টা অপেক্ষা করিয়া প্রায় ১।।০টায় আখাউরার গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। তখন খবর পাইলেন, চাঁদপুরেও দাঙ্গা বাঁধিয়াছে। ভয় পাইয়া মালপত্র সহ আবার প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িলেন। সেই সময়ে সাহেবী স্যুটপরা এক মুসলীম যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় যাবেন, কি করেন আপনি।' নগেন বাবু সব বলেন। মুসলীম যুবক বলে, 'পাকিস্তানের অফিসার আমিও। আমার কামরায় উঠুন, কোন ভয় নাই। আখাউরা থেকে আমার ষ্টাফ সঙ্গে দিয়ে দিব।' আশ্বাস পাইয়া সরল বিশ্বাসে নগেন্দ্রনাথ আবার উঠিয়া পড়েন এই যুবকের কামরায়। ভাগ্যচিহ্নিত সরল নগেন্দ্রনাথ কিরূপে জানিবেন, ভদ্রবেশের আড়ালে গোখ্‌রা সাপের চাইতেও ক্রুর বিশ্বাসঘাতক পশু লুকাইয়া রহিয়াছে।

ট্রেন ছাড়িবার মুহূর্তে একদল মুসলমান আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল কামরায়। পরণে লুঙ্গি,

মাথায় পাগড়ি। হঠাৎ এ কী কাণ্ড? অসহায় হিন্দু পরিবারটীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, ইহারা কাহারা? কী চায়? ভয়-বিহ্বল হইয়া নগেন্দ্রনাথ যুবককে বলেন, মনে রখিবেন, আপনার উপরে নির্ভর ও বিশ্বাস করিয়াই আমরা গাড়ীতে উঠিয়াছি।' ক্রুর হাসি মুখে যুবক বলে, 'না, না, কোন ভয় নাই।' কিন্তু একী? মেঘনা পোলের উপরে উঠিয়াই গাড়ীর গতি হঠাৎ শ্লথ হইয়া পড়িল কেন? কিছু বুঝিয়া উঠিবার আগেই বিদ্যুৎগতিতে সেই ভদ্রবেশী স্যুটপরা পশুটি প্রকান্ড ছুরিকা বাহির করিয়া নগেন্দ্রনাথকে চক্ষুর ভিতরে বিদ্ধ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা ভাগনে নিখিলকে আক্রমণ করিল। কয়েকজনে নগেন্দ্রকে ধরিয়া রাখিয়াছে আর অন্য দুজনে তাহাকে দুদিক থেকে সমানে তলপেটে, বুকে চাকু মারিতেছে। ক্ষিপ্তের মত শ্রীমতী রমা চ্যাটার্জি স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য দৌড়াইয়া গেলেন কিন্তু দুর্বৃত্তরা তাঁকেও চাকু মারিয়া মেজের উপর ফেলিয়া দিল, ছুরিকার আঘাত করিতে লাগিল। রক্তে কামরা ভাসিয়া গেল। শিশু পুত্রকন্যারা ভয়ে বিহ্বল। রক্তাক্তদেহ রমা দেবী সভয়ে দেখিলেন, স্বামীর দেহকে দুর্বৃত্তেরা নীচে মেঘনার জলে ফেলিয়া দিল, ভাগনে নিখিলের দেহকেও ট্রেণ হইতে ঠেলিয়া ফেলিল। একদল এই নারকীয় কাণ্ড করিতে মত্ত, তখন অন্যদল টাকাকড়ি অলংকারপত্র ছিনাইয়া লইতে থাকে। কিন্তু হায়, এততেও নিবৃত্ত হয় নাই, পশুরা চার বছরের কন্যা সাথীকে মাথায় চাকু মারিয়া রক্তগঙ্গা করিল, নদীতে ফেলিয়া দিল। সাত বছরের ছেলে অরুণ আর দেড় বছরের একটি মেয়ে পাখিকেও ফেলিয়া দেয় নীচে মেঘনার জলে। পশুরা রক্তাক্তদেহ হইতে শ্রীমতী রমার পরিধেয় শাড়িখানাও খুলিয়া রাখে, তাঁহাকেও পুল হইতে জলে ফেলিয়া দেয়। নৃশংসতার চরম করিয়া ছাড়িল এই সব বর্বরেরা। ট্রেণভরা, কামরাভরা অগণিত মুসলমান চক্ষু মেলিয়া এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিল, প্রতিবাদ করিল না। নীরব সমর্থন করিয়া, কেহ কেহ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া, পশুত্বের ঘৃণ্য প্রমাণ রাখিয়া গেল সেদিন।

বহু নীচে মেঘনার চলন্ত কালো জলরাশি কুটীল স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। মাথার উপরে দুপুরের জলন্ত সূর্য আর বিপুল নীল আকাশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। শুধু নগেন্দ্র চ্যাটার্জি, তার ভাগনে নিখিল আর ছোট ছেলে অরুণ, কচি মেয়ে পাখি সংসার হইতে মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। হত্যালীলা সাঙ্গ হইলে ড্রাইভার গাড়ি চালাইয়া দিল, ট্রেণ পোল পার হইয়া গেল। পড়িয়া থাকিল কলংকিত ভৈরব পোল ও একটা ভয়ংকর পরিপূর্ণ স্তব্ধতা।

রমা তখন জ্ঞানশূণ্য। পেটিকোটের ভিতরে হাওয়া ঢুকিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি না তলাইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছেন। জ্ঞান যখন হইল। চক্ষু মেলিয়া দেখেন অদুরে চার বছরের কন্যা সাথিও ভাসিতেছে। একমুহূর্ত্তে তাহার বল ফিরিয়া আসিল। সাঁতরাইয়া যাইয়া কন্যাকে ধরিলেন ও ভাসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিলেন। চারিদিকে কত নৌকা যাতায়াত করে, মাঝিরা মুসলমান। অস্ফুট কণ্ঠে প্রাণপণে রমা চ্যাটার্জি ডাকেন, কেহ উঠাইয়া লয় না, ফিরিয়াও চায় না। মানুষ কী সব পাথর হইয়া গিয়াছে? পৃথিবীটা কি সব পশুতে ভরিয়া গিয়াছে? এক মাছধরা মুসলীম বেদের নৌকা কাছে আসে, মা-মেয়েকে উঠাইয়া লয়। ধীরে ধীরে তীরের দিকে যায়। রমা চ্যাটার্জি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। চারিদিকে তখন চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া দেখেন।

কিন্তু কী বিভৎস দৃশ্য! মেঘনার দুই পারে অগণ্য মুসলমান। ভাসিয়া সাতরাইয়া কত হতভাগ্য হিন্দু তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। আর সেই মানবনামধারী পশুর দল তাদের ইটপাটকেল ছুড়িয়া নদীজল রক্তাক্ত করিতেছে। যাহারা তীর পর্যন্ত পৌঁছাইতেছে তাদের লাঠী বা ছুরিকা দিয়া খুন করিয়া আবার জলে ফেলিয়া দিতেছে। নদীর জলে অনেক লোক ভাসিতেছে। মনে পড়িয়া যায় অরুণের কথা, মনে পড়ে কচি মেয়ে পাখির মিষ্টি মুখখানির কথা, যুবক নিখিলের কথা! তারা কোথায়! মাথা ঝিমাইয়া আসে, সব ঘোলাইয়া যায়।

বেদের নোকা তখন তীরে লাগিবে। কিন্তু তীরের মুসলমানরা বেদেকেই তেড়ে আসে, মুসলমান হইয়া সে হিন্দুকে-বাঁচায়, এত বড় স্পর্দ্ধা! বেদে নৌকা থামায় না, আবার চলে। কিছুদুরে গিয়া ইহাদের পাড়ে ফেলিয়া দিয়া প্রাণভয়ে পালাইয়া যায়। রমা চ্যাটার্জি শিশু কন্যা সাথী সহ মুক্ত আকাশের নীচে পড়িয়া থাকেন। শীতে কাঁপিতে থাকেন। অদুরে ভাগ্যক্রমে এক হিন্দুবাড়ী। ভদ্রলোক দৈবাৎ আসিয়া ইহাদের দেখেন, ঘরে লইয়া যান, বস্ত্র ছিড়িয়া ব্যাণ্ডেজ করেন। সেখানে যতক্ষণ থাকেন মর্মবিদারী দৃশ্য চোখের উপর আরো দেখিতে পান, দূরে ভৈরব পোলের উপরে আসিয়া থামিল অপর এক খানা ট্রেণ থেকে মেঘনার জলে নিক্ষেপ্ত হইল। ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিড়ম্বনার কি শেষ হইবে না? সমস্ত বুদ্ধি যেন আড়ষ্ট হইয়া আসে। অনেকক্ষণ সেখানে থাকার পরে ভৈরব বাজারের হরি পোদ্দারের গদিতে আসিয়া আশ্রয় পান ভাগ্যহত নারী ও শিশু কন্যা। সেখানে আরো এমনি অনেক আহত হিন্দুকে মেঘনার জল হইতে উঠাইয়া রাখা হইয়াছে। ভাঙ্গা মন, আহত দেহ লইয়া তিনদিন সেখানে কাটাইয়া ১৫ আসিয়া পৌঁছেন কিশোরগঞ্জ। টেলি পাইয়া যতীন্দ্র রায় ও সুধাংশু কর কিশোরগঞ্জ থেকে এস-ডি-ওর দাক্ষিণ্যে ভৈরব আসেন প্রাতে এবং বিকালে ইহাদের লইয়া যান।

আবার কিশোরগঞ্জে! এইতো তিনদিন হইল স্বামী পুত্র কন্যা সহ সুখী পরিবার এখান হইতেই রওনা হইয়াছিলেন, চারদিন পরে সেইখানেই ফিরিয়া আসিতে হইল! অথচ কত পার্থক্য। আজ আর সে দিনের মধ্যে যেন একটা অনন্ত অন্ধকার অতলে চিরদিনের জন্য সব প্রিয়জন তলাইয়া গিয়াছে। রিক্ত হস্তে একমাত্র শিশু সাথীকে লইয়া রমা চাটার্জি আবার লোকারণ্যের তটে ফিরিয়া আসিলেন। মৌখিক সান্ত্বনা অনেকেই দিতে পারিবে, দিবেও। ডাঃ সীতারামিয়াও কিশোরগঞ্জে আসিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যে আগুন জ্বলিতে থাকিল বুকের ভিতরে, অন্ধকারে, সেখানে সীতারামিয়ার দুটা ফাঁকা কথায় কী হইবে?

আরো কত!

কত লোক যে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে কে বলিবে? অধ্যাপক দীনেশ সেন ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ার। পাকিস্তান কোর্টের সমন গেল তার কাছে, কুমিল্লায় আসিতে হইবে তাহাকে জুরির কাজ করিতে। নিশ্চিন্তমনে পত্নী সুরবালা দেবীকে, চার ছেলেমেয়েকে ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া রাখিয়া কুমিল্লা রওনা হইলেন ১২ই ফেব্রুয়ারী ট্রেনে। গঙ্গাসাগরের কাছে গাড়ি আসিতেই কামরার মধ্যে আক্রমণ করিয়া তাহার ছুরিকাহত রক্তাক্ত দেহ ট্রেণের বাহিরে ফেলিয়া দিল দুর্বৃত্তেরা। সেখানে লাইনের ধারে পড়িয়া থাকেন। পরদিন কুমিল্লা হাসপাতালে আনা হইল কিন্তু মৃত্যু

হইতে বাঁচান গেল না। পূর্বপাকিস্তান পরিষদের বিরোধী দলের নেতা শ্রীবসন্ত দাস মহাশয়ের শ্যালক শ্রীকিরণেন্দু শ্যাম একজন মুসলীম মক্কেলের কাজে ঢাকায় গিয়া বসন্ত বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। চারদিকে হামলা লাগায় সিলেটে যে পরিবারবর্গকে রাখিয়া আসিয়াছেন তাহাদের জন্য অস্থির হইয়া ওঠেন, হাঙ্গামা অগ্রাহ্য করিয়া সিলেট রওনা হইবেন। শেষে কাহারো নিষেধ না মানিয়া ঢাকা রেল ষ্টেশনে চলিয়া যান। তাহার পরে আর খোঁজ খবর নাই। পরে জানা গিয়াছে, নৃশংস ভাবে তাহাকে তেজগাঁ ষ্টেশনের কাছে হত্যা করা হইয়াছে ট্রেনের ভিতরে।

১৩ই গঙ্গাসাগরের রমণী রায়চৌধুরী ও তার ভাতিজা হরলাল দেবনাথ ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলিয়াছেন। আখাউরা ও পাঘাচর ষ্টেশনের মাঝমাঝি স্থানে গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন ট্রেনের ভিতরে। হরলালকে চাকু মারিয়া লাথি দিয়া চলন্ত ট্রেনের বাহিরে ফেলিয়া দিল।। রমণী ও অন্য হিন্দুরা ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ বাঁচাইল এবং আখাউরার দিকে হাঁটিয়া রওনা হইলেন। পথে আবার বিপদ। গ্রামবাসী মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া আক্রমণ করিল। সব লুঠিয়া লইল। শ্যামগাঁতে রমণী দাসের বাড়ীতে আহত হরলাল পড়িয়া থাকিল। পরে ২২শে আখাউরা হাসপাতালেই মৃত্যু হইল।

ঢাকার শ্রীঅবিনাশ সেন বরিশালে হেডমাষ্টার। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নারায়ণগঞ্জ চলিয়াছেন, ট্রেনে খুন হইলেন। এমই কত শত সহস্র।

পূর্ববাংলায় হত্যালীলার মর্মন্তুদ কাহিনী

।। ২ ।।

ঢাকা ও বরিশালের মুসলিম লীগ নেতারা হিন্দু নিপীড়ন ও নির্যাতনে রেকর্ড সৃষ্টি করে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক নিয়ে গেল। তা দেখে চট্টগ্রামের লীগ নেতা ও গুণ্ডারা পিছিয়ে থাকবে কেন? তারা তৃতীয় স্থান অধিকার করে তাম্র পদকের অধিকার পেতে চট্টগ্রাম শহর ও গ্রামাঞ্চলে তান্ডবলীলা শুরু করল। জয়ন্ত দাশগুপ্তের রচনায় তার কিঞ্চিৎমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামে

প্রকৃতির লীলা নিকেতন সুন্দর চট্টল! দক্ষিণে নীল সমুদ্র, পূর্বে-উত্তরে ঢেউখেলানো পাহাড় ও বন। ভারত-সভ্যতার প্রাচীন ক্ষেত্র, ইতিহাসের হাজার অতীত স্মৃতির পীঠভূমি চট্টল। এখানে বাইশ লক্ষ লোক—১৬ লক্ষ মুসলীম এবং ৫।০ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ—চিরদিন এক সঙ্গে, সুখে-দুঃখে একত্র দাঁড়াইরা, মিলিয়া-মিশিয়া বাস করিয়াছে। যখন ১৯২৬ সন হইতে ভারতের সর্বত্র হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা বাধাইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মজা দেখিয়াছে, যখন ঘরের কাছে ঢাকা, কলিকাতা, কুমিল্লায় রক্তারক্তি চলিয়াছে, এমন কি পাকিস্তান হইবার সামান্য আগে, ১৯৪৬ সালে, কলিকাতায় ও সংলগ্ন নোয়াখালিতে উন্মত্ততা চূড়ান্ত সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখনও চট্টলের হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি-বন্ধন শিথিল হয় নাই। এখানে শতকরা ৭৫ জন মুসলীম। এখানে সামান্য কিছু শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধ নির্বিবাদে জীবন কাটাইয়া আসিয়াছে আবহমান কাল হইতে।

কিন্তু হঠাৎ এখানে কী ঘটিয়া গেল? হাজার বছরের ইতিহাসে যাহা ঘটে নাই তাহাই ঘটিল। ঘটিল নয়, ঘটান হইল। জিন্না সাহেবের দুইজাতি-তত্ত্ব এবং "পাকিস্তান"-প্রতিষ্ঠার বিষক্রিয়া হিন্দু-বিদ্বেষকে তিন বৎসরের মধ্যেই ফেনাইয়া তুলিয়া এই কাণ্ড ঘটাইল। ঢাকার পরেই চট্টগ্রামের স্থান। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হইবে, এখানে সমুদ্র বন্দর হইবে, এখানেই তো মুসলীম-রাজের দ্বিতীয় পীঠভূমি হওয়া চাই। তাই ঢাকার পরেই চট্টলের স্থান। এখানে হিন্দু-উৎসাদনের মারণ-যজ্ঞকে বিপুলায়িত না করিলে চলিবে কেন? পিছন হইতে যাহারা কলকাঠি নাড়িয়া সারা পূর্ববাংলায় নরমেধ-আয়োজন করিলেন, তাহারা এখানেও সক্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং প্ল্যান অনুযায়ী একই পথে দাঙ্গা বাঁধাইয়া দিলেন।

একই কৌশল এখানেও অবলম্বিত হইল। কিছুদিন হইতেই গোপনে গোপনে গুজব ছড়ান হইতে লাগিল যে কলিকাতায় মুসলমান ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। শিয়ালদা স্টেসনে মৃতদেহের স্তূপ জমিয়া উঠিয়াছে। মুসলমান পশ্চিম বঙ্গে প্রায় নিঃশেষ হইতে চলিল। ১০ই ফেব্রুয়ারি (১৯৫০) এই গুজব, বিশেষতঃ জনাব ফজলুল হকের হত্যার গুজব, হঠাৎ খুব বেশী রকম প্রবল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ঢাকায় ঐ দিন প্রাতঃকাল হইতেই দাঙ্গা শুরু হইয়া গিয়াছে। ১১ই তারিখে আবহাওয়া অসম্ভব উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। দু তিনজন ছুরিকাহতও হইল।

১২ই হইতে শুরু

তারপর ১২ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম শহরের সকল পাড়ার পথে ঘাটে ছুরিকা হাতে গুণ্ডাদের আক্রমণ শুরু হইয়া গেল। হিন্দু ও বৌদ্ধ নরনারী প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিলেন। অফিসে আদালতে যাহারা গিয়াছিলেন তাহারা বাড়ী ফিরিতে পথেই আক্রান্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে শহরের পথঘাট হিন্দু-শূন্য হইয়া উঠিল, কেবল মুসলীম গুণ্ডার জনতা প্রকাশ্যভাবে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঘোরাঘুরি ও উন্মত্ত কোলাহল ও উদ্দাম আক্রমণ চালাইতে লাগাইল। সন্ধ্যার পরে এই উদ্দামতা চূড়ান্ত সীমায় আসিয়া পৌছিল। চাটগাঁতে নূতন কৌশলে হিন্দু-নিধন চলিল। প্রাণভয়ে অর্ধমৃত হিন্দুরা ঘরে ঘরে স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়া আছে, কখন দুর্বৃত্তেরা আসে, কখন প্রাণ যায়। এমন সময়ে দুর্বৃত্ত-দল আসিয়া বাহির হইতে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শিশু ও নারীরা চেচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘরের ভিতরে থাকা অসম্ভব। মরিয়া হইয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রাণ বাঁচাইতে বাহির হওয়া মাত্র দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাদের হত্যালীলা চালাইল। অসহায় নরনারীকে ফাঁদে ফেলিয়া হত্যা করা চলিল। ১২ই তারিখেই শ্রীপূর্ণ চৌধুরীর ভাই শ্রীহীরেন্দ্র লাল চৌধুরী ছুবিকাঘাতে প্রাণ হারাইলেন। শহীদ সূর্যসেনের ভাই শ্রীফণী সেনের প্রাণ গেল ঘাতকের হাতে, এ খবর ১৩ই শহরে ছড়াইয়া পড়িল। চারদিকে যখন মহামারী কাণ্ড চলিতেছে, তখন কোথায় গেল পুলিশ? কোথায়ই বা পাকিস্তান-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট? কলিকাতা হইতে যে সব বাটানগরের মুসলমান আসিয়া গুজব ও উত্তেজনা ছড়াইতেছিল, স্থানীয় নেতা যাহারা গুণ্ডাদলকে উস্কানী দিয়া দাঙ্গা চালাইতে ছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকিলেনই বা কেন?

১৩ই তারিখের ভোর হইল। একটা রাত্রির নারকীয় স্মৃতি লইয়া রাত্রিজাগা হিন্দু নরনারীরা ভোরের আলোর সঙ্গে আশায় বুক বাঁধিল যে হয়ত দুঃস্বপ্ন শেষ হইয়াছে, হয়ত এবার রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু, না। ১৩ই শহরে দাঙ্গা আরো ব্যাপক হইয়া দেখা দিল। কলিকাতার মেইলট্রেন আসিয়া চাঁটগাঁ ষ্টেশনে পৌছিল। ট্রেনের হিন্দুযাত্রীদের উপর বর্বর আক্রমণ চলিল। হত্যা করিয়া তাদের দেহ ট্রেণের জানালা দিয়া বাহিরে ফেলা হইতে লাগিল। মালপত্র লুট হইয়া গেল। ঐ গাড়ীতে যাত্রী ছিলেন শ্রীযদু দাশগুপ্ত ও তাহার ছেলে মলয়। যদুবাবুর প্রাণহীন দেহ রক্তের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল। মলয় ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত।

শাম্পানে কর্ণফুলিতে

আর এক বীভৎস ঘটনাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শহর ছাড়িয়া হিন্দুরা শাম্পান-নৌকায় প্রাণভয়ে দলে দলে গ্রামের দিকে ছুটিল। মনে করিয়াছিল হতভাগ্যরা যে, গ্রামে হয়ত বর্বরতা নাই, দাঙ্গা নাই, সেখানে যাইয়া বাঁচিতে পারিবে। কিন্তু কর্ণফুলীর প্রশান্ত বুকের ওপরেও বর্বরেরা হত্যা চালাইল। নৌকা আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল। কর্ণফুলির সাদা জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল। গ্রাম্য খালে-বিলেও এই নৃশংসতা চলিল। আর্ত চীৎকারে আকাশ ভরিয়া উঠিল।

শত শত হিন্দু প্রাণ হারাইল ঐ দিন। জে, এম, সেন ইনষ্টিট্যুট স্কুলের মাষ্টার শ্রীচন্দ্র সেনের ছেলে ধীরেন্দ্র সেন, মার্কেনাটাইল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার এসিঃ ক্যাশিয়ার শ্রীঅনিল শীল প্রভৃতির হত্যা সংবাদ সকলেই শুনিল। শ্রীপ্রফুল্ল শীল, ব্যাঙ্ক একাউন্টেন্ট, টিফিন খাইবার জন্যে চায়ের দোকানে ঢুকিয়াছিলেন। পথেই দুর্বৃত্তেরা তাহাকে আক্রমণ করিল, দেখিতে দেখিতে তাহার জ্ঞানহীন দেহ লুটাইয়া পড়িল।

পটিয়া থানার কচুয়াই গ্রামের শ্রীবিনোদবিকাশ পুরোহিত (৪৪বৎসর) যাইতেছিলেন ট্রেনে, সঙ্গে শিবশংকর পুরোহিত। কিন্তু চাটগাঁর দুই ষ্টেশন পরে ফৌজদারহাট ছাড়াইতেই মুসলীম জনতা ট্রেনের কামরায় উঠিয়া আক্রমণ চালাইল। শিবশংকর জানলা দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন কিন্তু বিনোদের অস্তিত্ব মুছিয়া দিল ঘাতকের ছুরিকা।

শোনা গেল কুমীরা গ্রামের এক মুসলীম ছাত্র স্কুলের হেড মাষ্টারকে ডাকিয়া লইয়া বলে, 'স্যার, আপনি শিক্ষা দান করিয়াছেন, গুরুদক্ষিণা দিতে পারি নাই, আজ দিব'। এই বলিয়া হতভাগ্য মাষ্টারকে হত্যা করে। বিষ কতখানি সর্বনাশা ও তীব্র হইলে তরুণ যুবকের মনও বিষাইয়া এতখানি দানবীয় হইয়া উঠিতে পারে তাহা ইহা হইতেই দেখা যায়।

১৩ই রাত্রি ১১টার পরে শহরে কারফিউ জারী হইল। কিন্তু কারফিউ তো দুর্বৃত্তদের জন্য নয়। অবলীলাক্রমে বর্বরতা সমানেই ঘটিয়া চলিল। ১৩ই অনেকেই পুলিশের ভরসায় আশা করিয়া অফিসে-কাচারিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকেই ফিরিতে পারেন নাই। চাটগাঁ কলেক্টরীর মোক্তার ও রেভেনিউ বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীরোহিনীরঞ্জন দাস ১০ই বিকালে ৪টার সময়ে বাসায় ফিরিতেছিলেন। স্বগৃহ হইতে মাত্র ৩০০ হাত দুরে দুর্বৃত্তগণ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। পৃষ্ঠদেশে তিন স্থানে ছুরি প্রবেশ করানোতে তিনি অজ্ঞান হইয়া লুটাইয়া পড়েন। জ্ঞান ফিরিবার পূর্বেই আবার এক গুণ্ডা তাহার পেটের উপরে বসিয়া নির্বিবাদে তাহার মুখে আটটী স্থানে ছুরির আঘাত করে। রক্তের মধ্যে রোহিনীর অজ্ঞান দেহ পথে পড়িয়া থাকিল। অদুরে তাহার বাড়ীতে তাহার স্ত্রী এ খবর পাইয়া আকুলভাবে পাড়ার লোকেদের সাহায্য চাহিলেন। অনেক কষ্টে তাহার মৃতকল্প দেহ ঘরে আনা হইল। সন্ধ্যায় ৭টাতে তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হইল। দুদিন পরে রোহিনীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন। তখন আহত হিন্দু নারী, পুরুষ ও শিশুতে হাসপাতাল ভরিয়া উঠিয়াছে। ঐ আহতের ভীড়ে চাটগাঁ জেটির বিখ্যাত শ্রীধীরেন্দ্র দাসও ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছিলেন ও ঘরে ফিরিবার আয়োজন করিতেছেলেন; কিন্তু হঠাৎ একদিন হাসপাতালের অপর আহত রোগীরা জানিল যে ধীরেন্দ্রবাবু আর নাই। এই হঠাৎ মৃত্যু অতি রহস্যময় ও সন্দেহজনক। এই মৃত্যুর রহস্য আজো ভেদ হয় নাই। হিন্দুদের সন্দেহ ও আতংক ইহাতে বাড়িয়াই গেল।

কুমীরা গ্রামের মোক্তার শ্রীদক্ষিণা ভৌমিক ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করেন ও প্রতিদিন চাটগাঁ কোর্টে আসেন। ১৫ই বিকাল ৩টায় ফিরিবার পথে শহরে প্রাণহরি সেনের স্ত্রী অর্থাৎ তার মাসীমার বাড়ীতে যান। মাসীমা অনুরোধ করেন, সীতাকুণ্ড লইয়া চলো। কারণ সীতাকুণ্ডর বিখ্যাত মেলা পরদিন ১৫ই। রিক্সা করিয়া মাসীমাসহ দক্ষিণা রওনা হইলেন রেল ষ্টেশনের দিকে।

স্টেশনের আধ মাইল বাকি আছে, রিক্সা এনায়েৎ বাজারে আসিয়া পৌঁছিল। চক্ষের পলকে অপেক্ষমান গুণ্ডার দল ঝাঁপাইয়া পড়িল। দক্ষিণা রিক্সা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কিন্তু পলাইবেন কোথায়? এক নিমিষে তাহার ছিন্নমুণ্ড দেহ পথে লুটাইয়া পড়িল। মাসী অজ্ঞান হইয়া পথে পড়িয়া রহিলেন। পরে প্রাণহরি সেনের গৃহে তাহাকে কোনমতে আনা হয়। কেবল পথেই নয়। ঘরে ঘরেও আক্রমণ সমানে চলিল। কবিরাজ সুরেন্দ্র সরকারের গৃহে রাত ৮টায় সবাই এক মুসলীম ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে মুসলীম যুবকরা ছড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। মুসলীম ভদ্রলোকটীর অনেক চেষ্টায় পরিবার সেদিন রক্ষা পাইল। সারা রাত উক্ত হৃদয়বান মুসলীম ভদ্রলোক সেই হিন্দু পরিবারের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া তাদের প্রাণ বাঁচান। কিন্তু পার্শ্বেই উকীল শ্রীজ্ঞান দত্তের বাড়ীতে তখন হাহাকার উঠিয়াছে। কান্নার রোলের মধ্যে জ্ঞানবাবুর মুহরী ছুরিকাহত হইলেন। কে তাহাদের বাঁচাইবে?

১৫ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারি হাঙ্গামা গ্রামে গ্রামে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল। গৃহ লুট, অগ্নিকাণ্ড, হত্যা ও নারী হরনের সংবাদ চারদিক হইতে আসিতে লাগিল। শহরে মিলিটারির প্যারেড, পিকেটদের উপস্থিতি, গ্রামে থানাপুলিশ—সবই 'নামকাওয়াস্তে' এবং হাস্যকর প্রহসন মাত্র। পতেঙ্গা গ্রামই দৃষ্টান্ত। হিন্দুদের বাড়ী জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া অত্যাচার করিয়া যখন শেষ করিতেছিল, পুরুষরা অনেকে জঙ্গলে, নারীরা অসহায় ভাবে গৃহে বন্দী তখন পুলিশ-মিলিটারি কোথায় ছিল?

চন্দ্রনাথের মেলা

১৫ই বুধবার চন্দ্রনাথের মেলা। জেলা জেলা হইতে হিন্দু তীর্থযাত্রী ভীড় করিয়া ট্রেনে সীতাকুণ্ড স্টেশনে নামিয়া পাহাড় বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল। কিন্তু চারদিক হইতে ট্রেনে আক্রমণ হইল। রেল-লাইনের দু'পাশে ও কামরায় মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইরা উঠিল। চন্দ্রনাথের মেলায় কী ঘটিয়াছে ১৯৫০ সালে, সেখানকার তীর্থ যাত্রীদের কী নৃশংস পরিণতি হইয়াছে, সে কাহিনীর সঠিক বৃত্তান্ত আজো অজ্ঞাত। ১২ই থেকে ১৮ই পর্যন্ত এক সপ্তাহ ধরিয়া চট্টলের সর্বত্র যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার পরিমাণ, ব্যাপকতা ও নৃশংসতার কাহিনী কোনদিনই কেহ সম্পূর্ণভাবে জানিবে না। প্রকৃত তথ্যের উদঘাটনের আন্তরিক চেষ্টা আজ কে করিবে? সূর্যসেন ও তাঁহার বীর বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র, শহীদদের রক্তসিঞ্চনে চিরপবিত্র স্বাধীনতার অমরতীর্থ চট্টগ্রাম আজ সাম্প্রদায়িকতার নরককুণ্ড।

পূর্ববাংলায় হত্যালীলার মর্মন্তুদ কাহিনী

॥ ৩ ॥

জেলার পর জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ও বর্বরতার লেলিহান শিখা। জেলায় জেলায় মুসলিম লীগ নেতা ও গুণ্ডাদের মধ্যে চলছে যেন বর্বরতার কম্‌পিটিশান। কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। হিন্দুদের উপর যে যত বীভৎস অত্যাচার করতে পারবে, সে তত বেশী খোদাতালার মেহেরবাণী লাভ ও বেহস্তে স্থায়ী আসন পাবে। সুতরাং ঢাকা-বরিশাল-চট্টগ্রামের পর এবার শ্রীভ্রষ্ট সিলেটের হিন্দুদের পালা।

সিলেটে — শ্রীহীন শ্রীহট্ট

গোলমাল যে হইবে এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার ব্যাপকভাবে করিলে দোষ হইবে না, এই ধরণের পূর্বাভাস সিলেটের মুসলীম সম্প্রদায় কোথাও হইতে পাইয়াছিল। নতুবা ঢাকায় দাঙ্গা শুরু হইবার আগেই সিলেটে মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দুদের উপরে ব্যাপক আক্রমণ ও জুলুম কী করিয়া অনুষ্ঠিত হইল? ডেপুটী কমিশনার মিঃ নোমানী এবং হবিগঞ্জের এস-ডি-ও এই অত্যাচারের প্রতি কেবল উদাসীন ছিলেন না, বরং প্রকারান্তরে অনুপ্রেরণাই দান করিয়াছিলেন।

হবিগঞ্জের ঘটনা

২২শে জানুয়ারি (১৯৫০) হবিগঞ্জ ফৌজদারি আদালত গৃহে রহস্যজনকভাবে আগুন লাগে। কে বা কাহারা লাগাইয়াছে তাহা জানার উপায় নাই। হিন্দুরা পাকিস্তানে যে রকম ভাবে অর্ধমৃত ও অসহায় হইয়া দিন কাটাইতেছিল, তাহাতে হিন্দু কেহ পাকিস্তানী আদালতে আগুন দিবে ইহা কল্পনা করাও হাস্যকর। কিন্তু দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানরা প্রচার করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল যে ইহা হিন্দুদেরই কাজ এবং হিন্দুরা পাকিস্তান ধ্বংস করিতে চাহে। পরদিন ২৩শে এক সভা ডাকা হয়। ঐ সভায় কয়েকজন মুসলীম নেতা প্রকাশ্য ভাবেই হিন্দুর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেন এবং মুসলীমদের উত্তেজিত করিতে থাকেন, হিন্দুরক্তে প্রতিশোধ লইতে হইবে, হিন্দুরা দুযমন, পাকিস্তানের সর্বনাশ করিতেছে। এইসব বক্তৃতা শুনিয়া সভায় সে সব হিন্দু ছিলেন তাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। উত্তেজনা চরমে উঠিয়াছে, সভার আবহাওয়ায় কী একটা থম্‌থমে ভাব। কিন্তু ভাবিবারও সময় পাওয়া গেল না। সভা শেষ হইতে না হইতে সশস্ত্র আনসার ও মুসলীম জনতা হিন্দুদের উপরে পড়িল এবং নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ চলিল। বর্বরেরা কাহাকেও রেহাই দিলনা। হিন্দু মহিলাদেরও নয়।

হবিগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি ভূতপূর্ব পৌরসভাপতি প্রবীণ নেতা শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বস এম-এল-এ গত ২৫ বছর যাবৎ অক্লান্ত দেশসেবা করিয়া এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন। দুর্বৃত্তেরা তাহাকে-ও নির্মম ভাবে আক্রমণ করে। কোমরে মারাত্মক ছুরিকাবিদ্ধ করা হয়। হাতের তিনটি আঙ্গুল একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়, মাথার বহুস্থানে আহত হন। তার মুমূর্ষু দেহ তার নিজের বাড়ীতে আনা হয়। দীর্ঘকাল

ভুগিয়া কোনরকমে প্রাণে বাঁচিয়াছেন। সভাস্থলে হিন্দুপ্রহার শেষ করিয়া দুর্বৃত্ত জনতা সহরের পথে পথে ছড়াইয়া পড়িল। যাহাকেই সমুখে পাইল তাহাকেই নির্মম প্রহারে জর্জরিত করিল। ৯২ বৎসরের বৃদ্ধ শহরের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্র দত্তের মত ব্যক্তিও ইহাদের হাতে ছাড়া পান নাই, তাকে রাস্তায় ফেলিয়া ভীষণ ভাবে প্রহার করে। তিনি শয্যাশায়ী হন। ঘরে ঘরে হিন্দুদের মনে আতংক। কখন আক্রমণ হয়, কখন দুর্বৃত্তেরা আসে! কিন্তু পরদিন হইতে বিপদ নূতন রূপে দেখা দিল, পুলিসের ও সরকারি অত্যাচার শুরু হইল। হিন্দুদের বাড়ীতে নির্বিচারে খানাতল্লাসী এবং গ্রেপ্তার চলিল। অচিরে ৩০০ হিন্দু গ্রেপ্তার হইয়া গেল। যুবক কেহ বাদ যায় নাই, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার অধিকাংশই গ্রেপ্তার। বাড়ীতে বাড়ীতে পুরুষেরা নাই, মহিলারা ভয়বিহ্বল। কেহ কেহ মহিলাদের নিরাপদ স্থানে সরাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তার পথ অনেক আগেই বন্ধ করা হইয়াছে। হবিগঞ্জ হইতে বাহিরে যাইবার একটী মাত্র রাস্তা, সেই পথ আগলাইয়া মোটর স্ট্যান্ডে আনসার বাহিনী ক্যাম্প করিয়া আছে। কেহ বাহিরে যাইতে চাহিলে অশেষ নির্যাতন করা হইতেছে। ২৩শে জানুয়ারির ঘটনা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখিবার জন্য এক লৌহযবনিকা উঠাইয়া সব সংবাদকে চাপিয়া রাখা হইল। প্রতিকার নাই, বিচার নাই, বিচার পাইতে হইলে পাকিস্তানী সরকারের রাজধানী ঢাকা যাওয়া দরকার।

এদিকে আহত শয্যাশায়ী সুরেশ বাবু সর্বাঙ্গে জখম ও ব্যান্ডেজ লইয়াই ঢাকায় যাইবার মতলব করিতেছেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আইন পরিষদের সভা আরম্ভ হইবে, পরিষদসদস্য সুরেশ বাবু পরিষদে হিন্দুদের অবস্থা জানাইয়াই প্রতিকার চাহিবেন, এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইবার নয়। ষড়যন্ত্র হইয়াছে তাহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না, হবিগঞ্জের অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করিতে দেওয়া হইবে না। হইলও তাহাই। এস্.ডি.ও তাহাকে বাধা দিলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারি পরিষদ মিটিং এর পূর্বদিন রাত্রি ১০টার সময় আহত অবস্থায়ই সেই বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে সরাইয়া নেওয়া হইল। বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া তাঁর বন্দুকটী বাজেয়াপ্ত করা হইল। যারা রক্ষা করিবে তারাই অত্যাচার শুরু করিল। এছাড়া ধীরেন্দ্র দত্ত, হীরেন্দ্র লাল দাসচৌধূরী, বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী, অরুণ দাসচৌধুরী প্রভৃতি ৩০০ হিন্দুই গ্রেপ্তার হইয়া পাকিস্তানী জেলে পচিতে লাগিলেন। কিন্তু হবিগঞ্জের ঘটনা আসন্ন বৃহত্তর হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতি মাত্র। দেশজোড়া বর্বরতা কিছুদিনের মধ্যেই বিস্ফোরণের মত ফাটিয়া পড়িল।

সিলেট সহরে

রেফারেণ্ডাম' এর সময় হইতেই হিন্দুবিদ্বেষকে মুসলীমসমাজের মধ্যে কাঁপাইয়া তোলার চেষ্টা চলিয়াছে। পাকিস্তান ভুক্তির বিপক্ষে হিন্দুরা ভোট দিয়াছে, তারা পাকিস্তানের শত্রু, এই প্রচার জীবনকে বিষাইয়া দিয়াছিল। যে সব হিন্দু ও মুসলমান মুসলীম লীগবিরোধী ও প্রগতিশীল তাদের উপর নানা নির্যাতন চলিয়াছে। 'কম্যুনিষ্ট' আখ্যা দিয়া নানা স্থানে পুলিস ও জনতার যুক্ত অত্যাচার চলিয়াছে। ইহার পর বাগে (Bage) সীমানা কমিশনের রায় ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫০) বাহির হওয়ায়ও মুসলীমসমাজের বিদ্বেষ বাড়িয়া গেল। করিমগঞ্জ

শহর পাইবে বলিয়া পাকিস্তান বিশ্বাস করিয়াছিল। না পাওয়ায় উত্তেজনা দেখা দিল। সিলেট বারের কোন কোন মুসলীম উকীল ও করিমগঞ্জের বাস্তত্যাগী মোক্তার গুজব ছড়াইতে লাগিল যে সিলেটে ভীষণ কাণ্ড হইবে, দাঙ্গা হইবে।

১০ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সিলেটে বাজার দিবস। ঐদিন বন্দরবাজারের মধ্যস্থলে দেখা গেল এক বিরাট পোষ্টার-ছবি ঝুলান রহিয়াছে। শিরোনামায় লেখা রহিয়াছে "হিন্দুস্থানে হিন্দুকর্তৃক মুসলমানের উপর জুলুম" এবং ছবি আঁকা রহিয়াছে ঃ গলায় দড়ি বাঁধিয়া মুসলমানদের টানিয়া নেওয়া হইতেছে, হিন্দুদের হাতে রহিয়াছে লাঠী, দা ও অন্যান্য অস্ত্র, এবং লামডিং, কলকাতায় মুসলীম-হত্যার ফলে রক্তের নদী বহিতেছে। সেই ছবির কাছে মুসলমানগণ ভীড় করিয়া অপর মুসলীমদের কাফেরদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। ১১ই সহরের মধ্যস্থলে গোবিন্দ পার্কে এক মুসলীম জনসভায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় ঘোষণা করা হয়, সিলেটে শীঘ্রই 'রক্তগঙ্গা বইবে'। ১১ই গুজব উঠিল যে ফজলুল হক কলিকাতায় নিহত হইয়াছেন এবং সন্ধ্যার দিকে মুসলীম নেতারা হিন্দু প্রতিবেশীদের গোপনে বলিতে শুরু করিল যে, পরিস্থিতি হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ১৩ই শহরে ১৪৪ ধারা জারি হইল, ঢাকায় চীফ সেক্রেটারিদ্বয়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। কিন্তু এই দিনই প্রাতে অত্যাচার আরম্ভ হইয়া গেল। শ্রী প্রহ্লাদ দাসের ছেলে যুবক পৃথ্বীশ দাসকে জিন্দাবাজারে স্বগৃহের সম্মুখে ছুরি মারা হইল। তার মৃত্যু হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারি করিমগঞ্জের (ভারতে) মুসলীম নিধনের গুজব চারিদিকে ছড়ান হইল। ডি সি স্বয়ং জেলার উকীলদের এক ডেপুটেশনে বলিলেন করিমগঞ্জে অকথ্য অত্যাচার হইয়াছে, ৫০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হইয়াছে এবং 'মুহাজরীন'-রা ভারত হইতে দলে দলে সিলেটে আসিতেছে, আর ভারতে মুসলীম দলনের প্রতিবাদ না করিয়া পাকিস্তানী হিন্দুদের কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিয়া কোন ফল হইবে না। সন্ধ্যার দিকে শহরে জল্লার পারে মতি দাসকে হত্যা করা হয় এবং তিনজন মনিপুরীও ছুরিকাহত হয়। দুজন মারা যায়।

১৫ই বন্দর বাজার হইতে ফিরিবার পথে একটি বালক ছুরিকাঘাত হইয়া পরদিন মারা যায়। ইহা ছাড়া পুরাণ লেনের উকীল চারুচন্দ্র সরকার, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ভট্টাচার্য্য, বিকাশ দত্ত, বিনয় রায় প্রভৃতিও গুণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে আহত হন। বহু লোকের মৃত্যুও হয়। শহরের হিন্দুরা প্রাণ ভয়ে করিমগঞ্জের দিকে যাইতে চেষ্টা করে কিন্তু চারিদিকে আনসারদের ও জনতার দেয়াল, গুণ্ডারা সতর্ক পাহারা দিতেছে, পথে অত্যাচার উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, পলাইয়া প্রাণ বাঁচানও সম্ভবপর নয়। সামান্য দুচার জন সীমান্ত পার হইয়া আসিয়া বাঁচিল এবং সংবাদ দিতে পারিল।

এদিকে ১৫ই হইতেই হত্যা ও লুণ্ঠন দ্রুত গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল। শহরের সংলগ্ন লালাবাজার, মূর্তি, জালালপুর, নোয়াগ্রাম, মহেশপুর প্রভৃতি বহু স্থানে হিন্দু বাড়ীতে লুঠ ও মারপিট চলিল, জোর করিয়া মুসলমান করা হইতে লাগিল, রাখালগঞ্জ বাজার লুঠ হইয়া গেল। সিলানে নন্দী ধরের বাড়ী লুঠ হইল। জনতা ঐ অঞ্চলের বড় জমিদার প্রবীর চক্রবর্ত্তীর বাড়ীকে ঘিরিয়া ফেলিল। অবশ্য সেদিন কয়েকজন মুসলমানের চেষ্টায় লোকজন রক্ষা পাইল।

নওয়াগ্রাম সিলেট শহর হইতে ৬ মাইল মাত্র দূরে। ১৪ই বিকালে নিকটবর্ত্তী নামাবাজার মুসলীম জনতা কর্ত্তৃক লুঠ হইয়া গেল। ঐ দিন রাত্র ৮টার সময় নওয়াগ্রামের উত্তর পাড়ায় গুরুচরণ ধরের বাড়ী লুঠ হয়। পরদিন ১৫ই সকাল ৭টায় সমগ্র মুসলীম জনতা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রসহ নানা ধ্বনি করিয়া সমস্ত গ্রাম বেষ্টন করিয়া চারিদিকে হইতে একসঙ্গে আক্রমণ করে। প্রায় দেড় হাজার হিন্দুর বাস ঐ গ্রামে। হিন্দুরা প্রাণভয়ে নারী ও শিশু সহ জঙ্গলে পলাইয়া যায়। এদিকে জনতা যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া প্রত্যেক বাড়ীর তুলসীমঞ্চ ও গৃহদেবতার বিগ্রহ চূরমার করিয়া রাখিয়া যায়। কোন কোন বাড়ীতে আগুন দেয়। দু একটি গৃহ প্রচুর অর্থ ও ধান্য ঘুষ দেওয়ায় রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু পুলিশ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন সাহায্য ৬ মাইল দূরের সিলেট সহর হইতেও আসে নাই। জনতার উদ্দাম গুণ্ডামি অবাধে চলিয়াছে।

মামরথপুর পাশের গ্রাম। সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তি মহেন্দ্র চন্দ্র দে, কামকান্ত ধর, অশ্বিনী কুমার দে প্রভৃতি বহুলোকের বাড়ী ব্যাপাকভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের একটি যুবতী কন্যাকে দিনের বেলায় দুর্বৃত্তেরা লইয়া যায়। পিতা থানায় এজাহার দেয় কিন্তু কোন তদন্তই পুলিশ করে নাই। পরদিন দেখা গেল হতভাগিনী কন্যাকে অজ্ঞান অবস্থায় দুর্বৃত্তেরা পিতৃগৃহের কাছে রাখিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে তার গুরুতর জখম। যেদিন পুলিশ আসিল তাহারা মেয়েটিকে পিতৃগৃহে আছে দেখিতে পাইয়া উল্টা চাপ দিয়া শাসাইতে লাগিল, কেন অশ্বিনী থানায় মিথ্যা এজাহার দিয়াছে, তাহার সাজা হইবে। প্রাণভয়ে পিতা এজাহার প্রত্যাহার করিতে ও কন্যার চরম অপমানকে নীরবে চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইল।

ঢাকাদক্ষিণ দক্ষিণভাগ গ্রামের ভারতচন্দ্র দত্তের বাড়ী হইতে দুইজন অবিবাহিত কন্যাকে গুণ্ডাদল রাত্রিতে ছিনাইয়া লইয়া যায়। বাড়ীর লোকেরা শিরে করাঘাত করিতে থাকে। কিছু করিবার উপায় নাই। দুদিন পর্য্যন্ত হতভাগিনীদের কোন সংবাদ নাই। দুদিন পরে শেষরাত্রি প্রায় ৪টার সময়ে দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর পুকুরের পারে মেয়ে দুটিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফেলিয়া যায়। কিছুক্ষণে মেয়েদের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তাহারা দেখে নির্জন পুকুর পারে তাহারা পড়িয়া আছে। গোঙরাইয়া গোঙরাইয়া তাহারা চিৎকার দিতে থাকে। রাত্রির নির্জনতায় এই আর্তনাদ শুনিয়া বাড়ীর লোকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় ও লইয়া আসে। পরে স্থানীয় দুজন সহৃদয় মুসলীম ভদ্রলোককে অনুনয়বিনয় করিয়া তাহাদের সহিত সিলেট শহরে যাইতে রাজি করায় এবং তাদের সাহায্যে মেয়েদের শহরে নিবার ব্যবস্থা হয়। ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প ছিল, স্থানীয় হিন্দুদের রক্ষার্থে তাহাদের রাখা হইয়াছিল। এত বড় ঘটনা হইয়া গেল নিকটবর্ত্তী পুলিশেরা টু শব্দও করিল না। এমন কি ঘটনার সংবাদ পুলিশ ক্যাম্পে যখন ভয়ার্ত বাড়ীর লোকেরা যাইয়া জানাইল পুলিশ কোন তদন্ত না করিয়া এক হাজার টাকার বিনিময়ে মামলাটী আপোষে মিটাইবার চাপ দিয়া ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করে। ইহারই নাম পাকিস্তানী পুলিশ! নারীর সতীত্ব ও মানুষের সর্ব্বনাশের মূল্য ইহাদের কাছে টাকাপয়সার হিসাবে নির্ধারিত হয়, ইহারাই হিন্দু নারীকে রক্ষা করিবে পূর্ববাংলায়! ভারতদত্ত মহাশয় পুলিশের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সিলেট হাসপাতালে মেয়েটিকে লইয়া যান। মেয়েটির মৃত্যু হয়।

সদর থানায় ছনকাইড ও শিলেটের নিকটে শিবগঞ্জ, ঢাকাদক্ষিণ, ঢাকাউত্তর প্রভৃতি স্থানে

বহু নারী ধর্ষিতা হইয়াছিল। ঢাকা-দক্ষিণ ও বাহুবল থানার কুচুয়াদি গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে যুবতী মেয়ে অপহৃতা হইয়াছেন। কানিসাইল-নিবাসী অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ীর একটি কন্যা দুর্বৃত্তেরা ছিনাইয়া লইয়া যায়। পরে মেয়েটিকে বাড়ীর কাছে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া যায়। দত্তরাইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাস্টার ক্ষিরোদ বাবুর বাড়ী তিলপাড়া—ঐ অঞ্চলের শ্রদ্ধেয় লোক তিনি। তার বাড়ীও লুণ্ঠিত হয়।

বাহুবল থানায় (করিমগঞ্জ মহকুমার) সিলামী গ্রাম ১৫ই সকাল ৯টা সশস্ত্র জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়, উত্তেজনামূলক ধ্বনি করিয়া হিন্দুগৃহে আগুন দেওয়া হয়। অনেকে জঙ্গলে পলাইয়া বাঁচে! বহু লোককে জোর করিয়া মুসলমান করা হয়। যারা প্রতিবাদ বা আপত্তি করে তাদের হত্যাও করা হয়। হবিগঞ্জের চুনার ঘাট থানার কেতন দাস, অশ্বিনী নাথ, বীরেন্দ্র নাথ প্রভৃতি বহু পরিবারের সকলকে জোর করিয়া ইসলাম ধর্ম নিতে বাধ্য করা হয়।

ফেঞ্চুগঞ্জ থানায় ষ্টিমার-কোম্পানীর কারখানা লুঠ ও দগ্ধ হয়। বাজারের পুলিন দে'কে ইলাসপুরের কাছে হত্যা করা হয়। মাইজগাঁও'র অম্বিকা কবিরাজের বাড়ী লুণ্ঠিত এবং মাখন সোমের বাড়ী লুঠ করিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়। বালাগঞ্জ থানায় রুকনপুরের দিগেন্দ্র সেন, গোপেশ সেন, শিবচরণ দাসের বাড়ীতে লুট ও মারপিট চরমে ওঠে। মধুরাই ও কঠলখয়ের গ্রামে সার্বজনীন ভাবে মারপিট ও মুসলমান করা হয়। গোপালগঞ্জ থানায় ফুলসাইন গ্রামে ধনী বৈকুণ্ঠ রায় ও রাসবিহারী রায়ের বাড়ী লুণ্ঠিত হয়। বিশ্বনাথ থানায় জঘন্যতম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। দণ্ডপানিপুর গ্রামের সব হিন্দুবাড়ীই লুঠ হয়। গরু জবাই করা এবং হিন্দুদের জোর করিয়া 'কলমা' পড়াইয়া মুসলমান করা হইল। তুকেরকান্দিতে ঘোষেদের বাড়ী লুঠ হয়, যোগেন্দ্র ঘোষকে হত্যা করা হয় ও বহু লোককে ছুরিমারা হয়। মিঃ বি,এল, সেন আই-এ এস'এর ভাই দ্বিজেন সেন প্রহৃত হয়। যোগেন্দ্রের ছিন্নমুণ্ড মৃতদেহ পড়িয়াই থাকে, এর পরে শৃগালকর্তৃক ভক্ষিত হয়। বিশ্বনাথ থানার সিজেরকাছ গ্রামে পাল চৌধুরীদের ও ব্রাহ্মণদের বাড়ী লুঠ করিয়া সবাইকে 'কলমা' পড়ান হয়। বিমলা স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ইসলাম নিতে অস্বীকার করায় তার পৈতা ছিড়িয়া পায়ে মাড়াইয়া তাকে গুরুতরভাবে ছুরি দ্বারা মারপিট ও জখম করা হয়। দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া পুকুরে ফেলা হয় এবং ব্রাহ্মণদের শিখা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

১৬।২ তারিখে প্রায় ৩০০ সশস্ত্র মুসলীম গুণ্ডা গ্রামে আখড়া আক্রমণ করিয়া বিগ্রহ ধ্বংস করে। পুরোহিতকে হত্যা করিতে চায়। তিনি ভয়ে পলাইয়া বাঁচেন। জনতা বর্ধিত হইয়া সমস্ত গ্রাম লুঠ করে। জমিদার হরিপদ চৌধুরী ও বিমলা ভট্টাচার্যের বাড়ী লুঠ করে। মেয়েরা কিছু আগে বিপদের লক্ষণ দেখিয়া মর্যাদা রক্ষার্থে জঙ্গলে পলাইয়া যান। পরদিন ১৭ই সমবেতভাবে জনতা বাড়ী বাড়ী গিয়া ব্রাহ্মণ দেখিয়া প্রত্যেককে আক্রমণ করে। গলা হইতে পৈতা ছিড়িয়া পায়ে মাড়ায়, নিজেদের হাতে ছিড়িতে বাধ্য করে, পরে প্রত্যেককে মুসলমান করে। পাশের সুনাইতা গ্রামেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপক অত্যাচার হয়। মেয়েদের হাতের শাখা ভাঙ্গিয়া সিন্দুর মুছিয়া ফেলে, যারা প্রতিবাদ করে তাদের অত্যাচারের ভয় দেখাইতে তারাও নিজ নিজ শাখা ভাঙ্গে সিন্দুর মোছে। কূর্ম গ্রামেও ঠিক এই একই রকম অত্যাচার হয়। রাজাগঞ্জ আখরা, নীর ভট্ট ও রামচন্দ্র ভট্টের বাড়ী লুঠ হয়। ছাকর থানার,

জগন্নাথপুর অঞ্চল উন্মত্ত জনতা ঘিরিয়া চরিদিক হইতে লুঠ করে।

১৭ই ফেব্রুয়ারি ছাতকের লাকেশ্বর গ্রাম ৫/৬ শত সশস্ত্র মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রথমেই তারা নীরোদ রঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়ী লুঠ করিয়া অলংকার, বাসনপত্র, নগদ টাকা সব লইয়া যায়। তৎপর পর পর রমণী ভট্টাচার্য্য, নলিনী, অমরচন্দ্র, রবীন্দ্রচন্দ্র, কেদার ভট্টাচার্য্য এবং পরে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণদের বাড়ী লুঠ করে। রমণী ও অমর ভট্টাচার্যকে নির্দয় প্রহার করে। সমস্ত ব্রাহ্মণদের পৈতা ছিড়িয়া 'কলমা' পড়িতে বাধ্য করে এবং টিকি কাটিয়া পা দিয়া মাড়ায়। সব হিন্দুকেই মুসলমান করে। পার্শ্বের মারকুল গ্রামেও অনুরূপ লুঠ ও ব্যাপক ধর্মান্তর হয়।

জাকিগঞ্জ থানার সদরপুর গ্রামে ১৯।২ তারিখে আক্রমণ হয়। সশস্ত্র গুণ্ডারা শুকলাল নমশূদ্রের বাড়ী লুঠ করে কিন্তু গুরুলাল থানায় গিয়া অত্যাচার কাহিনী জানাইলে পুলিশ ছুরি বাহির করিয়া কাটিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া বন্দুকের কুঁদা দিয়া মারিতে থাকে। পরে অকথ্য গালি দিয়া তাকে তাড়াইয়া দেয়। গুণ্ডাদের নাম বলা সত্ত্বেও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। গুণ্ডারা শাসায় রাত্রিতে খুন করিবে বলিয়া। গ্রামের বহু লোকে সর্বস্ব ফেলিয়া রাখিয়া নদী সাতরাইয়া গোপনে পলাইয়া আসে। পিরখালের পারগ্রামের অক্রুর নমশূদ্র, রমেশ নমশূদ্র প্রভৃতির বাড়ী আক্রমণ ও লুন্ঠন করিয়া বাড়ী মুসলমানরা দখল করিয়া বসে। গঙ্গাজল গ্রামে দিনেন্দ্রচন্দ্র দেব পুরকায়স্থের বাড়ী ১৫ই লুণ্ঠিত হয় এবং মুসলমান কর্তৃক জবরদখল হয়।

মূর্তি গ্রামে ১৫ই আক্রমণ হয়। বেলা নয়টায় শত শত মুসলমান শ্লোগান দিতে দিতে আসিয়া প্রথমেই সেনাপতি বাড়ী আক্রমণ করে। লুঠপাট মারপিট অত্যাচার দেববিগ্রহ ধ্বংস করিয়া হিন্দুদের মুসলমান করে। মূর্তিগ্রাম ধ্বংস করিয়া এই জনতা দাসপাড়া, আজমৎপুর, নসিয়াঞ্জি দিয়া মহেশপুর পর্যন্ত যায়। সারাদিন অত্যাচার চলে। পরদিন স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়াছে বলিয়া গ্রামের হিন্দুদের নিকট হইতে জোর করিয়া স্বাক্ষর আদায় করে।

এইরূপ শত শত গ্রামে অকথ্য অত্যাচার চলিতে থাকে। এই অত্যাচারের পশ্চাতে ডেপুটী কমিশনর মিঃ নোমানীর উস্কানী এবং মিঃ আজমল আলি ও করিমগঞ্জের প্রাক্তন মোক্তার বদরুল হক প্রভৃতির নেতৃত্ব রহিয়াছে বলিয়া হিন্দুদের অভিমত। সিলেটের অত্যাচারের একটা বিশেষত্ব হইয়াছিল নারীহরণ, নারীধর্ষণ এবং ব্যাপক ধর্মান্তর। দিনের পর দিন এই বর্বর কাণ্ড চলিয়াছে। এমন কি এই বর্বরতার ভয়াবহ রূপ দেখিয়া সিলেটের মুসলীম লীগ-মুখপত্র 'নও বেলালে'র সম্পাদক পর্যন্ত প্রতিবাদ ও নিন্দা করিতে বাধ্য হন; কিন্তু দুর্বৃত্তেরা সম্পাদককে পর্যন্ত শাসাইয়া দিয়াছিল। সর্বত্রই একই সুপরিকল্পিত নীতি অনুসৃত হইয়াছে। প্রত্যেক সশস্ত্র জনতার সহিত কয়েকজন মোল্লা মৌলভি রাখা হইত যাহাতে সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্তরকরণ সম্পন্ন হইতে পারে। পুলিশের-এস-পি এবং কোন কোন অফিসার দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। একথা সত্য। কিন্তু উন্মত্ততার বন্যার সম্মুখে তাহাদের অকিঞ্চিৎকর প্রভাব ভাসিয়া গিয়াছে।

পূর্ববাংলায় হত্যালীলার মর্মন্তুদ কাহিনী

।। ৪ ।।

পদ্মা মেঘনার ওপারে ঢাকাগামী বা ঢাকা থেকে বহির্গামী ট্রেনেই শুধু নয়, পাকিস্তানী পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র ট্রেনে স্টীমারে নৌকায় লঞ্চে হিন্দুদের উপর নির্বিচার আক্রমণ ও অত্যাচার চলে। টাকাকড়ি ছাড়াও মূল লক্ষ্য ছিল যানবাহনের যাত্রী হিন্দু মেয়েদের উপর। মর্মবিদারক ঘটনার কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশিত হয়েছে জয়ন্ত দাশগুপ্তের রচনায় 'জয়শ্রী'র পাতায়।

ঢাকা মেল ট্রেন

২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ১৪ ফাল্গুন, রবিবার। কলিকাতা সহরময় উত্তেজনা ও আশংকা। শিয়ালদহ স্টেশনে দিনরাত ভীড়; অপেক্ষমান পূর্ববাংলার হাজার হাজার লোক স্টেশনে হত্যা দিয়া পড়িয়া আছেন কখন কোন ট্রেন আসে তাহার জন্য। ট্রেনে হয়তবা আত্মীয়-স্বজন প্রাণে বাঁচিয়া কোনমতে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিতেও পারেন, কিংবা অন্ততঃ প্রতিবেশীর কাছে খবরটুকুও পাওয়া যাইবে। কিন্তু ট্রেন আর আসে না। ঢাকা মেলে পূর্ববাংলার বহু জেলার লোক আসিয়া থাকে। মেল ট্রেন প্রাতে ৭টায় শিয়ালদহ পৌঁছে। কিন্তু সেদিন ট্রেন আসিল না। ট্রেনের চিহ্নও নাই। সারাদিন গেল। লোকজন নিরাশ হইয়া কিছু কিছু ফিরিয়া গেল। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় একখানা ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। জনতার ভীড় আগাইয়া গেল। প্ল্যাটফর্মে দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি, ডাকাডাকি, কোলাহল। কিন্তু কই? যাত্রী অতি নামমাত্র সংখ্যায় নামিল। তাদের মুখে ভয়, উদ্বেগ ও অসহায়তার ছাপ, চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। অস্ফুট কণ্ঠে বলে, ট্রেন আক্রান্ত হইয়াছিল। কোথায় কে গেল জানিনা। রাত্রির অন্ধকারে ভীষণ কাণ্ড হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ট্রেন প্রায় শূন্য আসিয়াছে, বহু কামরা ভাঙ্গা, বাথরুম দরজা জানালা চূর্ণবিচূর্ণ, বহুস্থানে রক্তের দাগ, শূন্য কামরায় কামরায় লোক নাই, কিন্তু বিছানা পাতা, জুতা স্লিপার স্যাণ্ডেলের স্তূপ, শাঁখা ভাঙ্গা ছড়ানো, ট্র্যাংক ও অন্যান্য মালপত্র। যাত্রী নাই, কিন্তু মালিকহীন এইসব মালপত্র একটা ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের নীরবসাক্ষ্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এ কী কাণ্ড! স্টেশনের ভীড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কামরায় কামরার যাইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। রেল-পুলিশ মালিকহীন মালপত্র স্টেশনের পুলিশ-অফিসে নামাইয়া রাখিল। বড় কর্তারা আসিলেন, কিন্তু যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তখন প্রতিকার কোথায়? উত্তেজিত জনতা দাবি করে, এই ট্রেন লইয়া 'দর্শনা' স্টেশনে, (প্রথম পাকিস্তানের ঘাঁটি) যাইব, সেখানে হিন্দুযাত্রী নামাইয়া রাখিয়াছে, নিহতদের শবদেহ নামাইয়া রাখিয়াছে, উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু কে শোনে এ দাবি? এই ট্রেনখানিই রাত দশটায় সেদিনই ঢাকা (আপ) মেল হইয়া গোয়ালন্দে ফিরিয়া যাইবার কথা। কর্তৃপক্ষ ট্রেন বন্ধ করিলেন, কারণ ভাঙ্গাচোরা গাড়ী দেখাইয়া উল্টা পাকিস্তানি সরকারই মিথ্যা কথা বলিয়া বসিবে, দেখ, দেখ, হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া ট্রেনের মুসলমান হত্যা করিয়াছে। কলিকাতাময় সে রাত্রি উত্তেজনা ও আতংক। ঘটনাটা এইরূপ ঘটিয়াছিল।

২৫ শে ফ্রেব্রুয়ারি রাত্রিতে যে সব হিন্দু-যাত্রী ষ্টীমারে গোয়ালন্দ পৌঁছিল তাহারা

হন্তদন্ত হইয়া ট্রেনে উঠিতে গেল। আনসার কুলীদের অত্যাচার, প্রতি মালপিছু অসম্ভব হারে টাকা ঘূষ দেওয়া, অপমান, সব পার হইয়া যারা ট্রেনে উঠিয়াছে, তাহার নিশ্চিন্ত হইল, বিপদ পার হইয়াছে।

সকলেই গাদাগাদি হইয়া ট্রেন ছাড়িবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যত শীঘ্র ছাড়ে ততই মঙ্গল। যাত্রিদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি। ১০-১৫ মিঃ এর সময়ে ট্রেন ছাড়িবার সময়, ছাড়িল রাত ১২টায়। রাত প্রায় ১টায় রাজবাড়ী পৌঁছিল। রাজবাড়ী হইতে গাড়ি ছাড়িয়া ২০ মিঃ পরেই হঠাৎ গাড়ি এক বিস্তীর্ণ মাঠে জঙ্গলের ধারে থামিয়া গেল। মিনিট কয়েক সব চুপচাপ। যাত্রিদের ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, কী সর্বনাশ! মাঠের মধ্যে গাড়ি থামিল কেন? কিন্তু হঠাৎ নিঃশব্দতা ভেদ করিয়া একটা কোলাহল আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সাথে সাথেই যাত্রিদের কান্নাকাটি ফাটিয়া পড়িল। গোলমাল ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। কামরায় কামরায় দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ট্রাংক বিছানাপত্র প্রভৃতি দিয়া চাপা দেওয়া হইল। দুর্বৃত্তদের একদল গোয়ালন্দ হইতে পিছু লইয়া ট্রেনেই আসিতেছিল। নির্দিষ্ট স্থান সূর্যনগরের কাছে আসামাত্র শিকল টানিয়া গাড়ি থামাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের জঙ্গলে অপর দল যাহারা অপেক্ষা করিয়া ছিল, তাহার দৌড়াইয়া আসিয়া ট্রেন আক্রমণ করিল। মেয়ে-গাড়ী এবং যে সব কামরায় স্ত্রীলোক বেশী ছিল, সেই সব কামরারই আক্রমণ বেশী হইল। অস্ত্রশস্ত্র তরবারি দিয়া কাচ, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল, পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কামরায় হিন্দুরা ভিতর হইতে সকাতরে বলিতে লাগিল, এ কামরায় সব মুসলমান। এখানে আসিও না।' কোন কামরায় সহৃদয় মুসলমান দু'একজনও সদয় হইয়া বলিল, হা, এখানে মুসলমান সব। হাতে-পায়ে ধরিয়া হিন্দুরা এই সব মুসলমানদের ভিতর হইতে কোরাণ পাঠ করিতে মিনতি করিল, যাহাতে বাহিরের দুর্বৃত্তরা মুসলমান মনে করিয়া ফিরিয়া যায়। কোরাণ পাঠ হইল, হিন্দুরাও মুখে মুখে বলিতে লাগিল। হিন্দু নারীরা ভয়ে শাখা ভাঙ্গিয়া সিন্দুরও মুছিয়া ফেলিল, পুরুষরা লুঙ্গি পাজামা পরিল। কিন্তু হায় সবই বৃথা হইল। অষ্টমী রাতের আবছা চাঁদের আলোতে তখন দলে দলে দুর্বৃত্তেরা বলপূর্বক গাড়ী হইতে যাত্রিদের নামাইতেছে, দূরে কোন নির্দিষ্ট স্থানে হাঁটাইয়া নিয়া যাইতেছে। অনেককে আঘাত করিয়া খুন করিয়া ফেলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মালপত্র গহনা টাকাকড়ি লুঠ করিতেছে। কেহ কেহ প্রাণভয়ে জানলা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া অদূরে জঙ্গলে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিল। কত পরিবারের পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক শিশু পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মুসলমান দুর্বৃত্তেরা লুঠতরাজ হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বলাবলি করিতেছে, হিন্দুস্থানে আমাদের সব মুসলীম ভাইদের মারিয়া ফেলিল, আমরা একটা হিন্দুকেও যাইতে দিব না, সব মারিয়া ফেল, ইত্যাদি। আধ ঘণ্টা ধরিয়া এই নৃশংস কাণ্ড চলে। তারপরে সব শান্ত হয়। মৃতদেহ নিশ্বাস বায়ু এবং আহতদের কাতরোক্তি শূন্যে মিলাইয়া যায়। লুণ্ঠিত মাল ও অপহৃত নারীদের লইয়া দুর্বত্তেরা পলাইয়া যায়। গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু দুই মিনিট পর আবার গাড়ি থামিয়া গেল। আবার চলে সেইরূপ অত্যাচার। পাঁচ মিনিট পরে আবার গাড়ী ছাড়িল। পরবর্তি স্টেশন কালুখালিতে আসিয়া পৌঁছিল। এত বড় কাণ্ড দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ করিল না, রেল বা পুলিশ কর্মচারিরা নীরব। গাড়ীর সঙ্গে

পূর্ববঙ্গ সরকার জাঁক করিয়া গার্ড দিয়াছেন, হিন্দুদের রক্ষার্থে। এই গাড়ীতেও গার্ডের কামরায় তিনটি বাঙালী মুশ্লীম পুলিশ ছিল। আক্রমণ শেষ হইয়া দুর্বতেরা নিরাপদে চলিয়া যাওয়ার পরে এই পুলিশ পুঙ্গবত্রয় মাত্র দুবার ফাঁকা আওয়াজ করিয়া পূর্ববঙ্গ সরকারের মুখরক্ষা করিল। তিনজন বন্দুকধারী যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দুর্বৃত্তদের বাধা দিয়া গুলি ছুড়িত, তবে লাঠী-তরবারধারী দুবৃত্তেরা ব্যর্থমনোরথ হইত, হিন্দুরাও রক্ষা পাইত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। পুলিশ, আনসার, রেল কর্মচারি এই ষড়যন্ত্রে অংশী ছিল বলিয়াই এইরূপ কাণ্ড সম্ভব হইয়াছিল। পরে পুলিশ-ত্রয় এই হাস্যকর জবাবদিহি করিয়াছিল যে গাড়ী হইতে যাত্রীরা নামিয়া ভীড় হওয়ায় দুর্বৃত্তদের চিনিতে পারে নাই। রাত্রি ২।।০টা হইতে পরদিন রবিবার প্রাতঃকালে ৬, ৬।।০টা পর্যন্ত আক্রান্ত মেল ট্রেনখানিকে কালুখালিতে থামাইয়া রাখা হয়। ট্রেন ছাড়িবার আগে ভোরবেলা দেখা গেল কয়েকজন হিন্দু যাত্রি ভীতত্রস্ত হইয়া ট্রেণের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। তাহারা রাত্রিতে জঙ্গলে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া এক্ষণে আবার ট্রেণে উঠিল। এদিকে কালুখালির স্থানীয় মুসলমানবর্গ, চেকার, গার্ড, পুলিশ সকলে আসিয়া হিন্দু-যাত্রিদের বুঝাইতে চেষ্টা করে, মাত্র ৪।৫ জন ডাকাত ডাকাতি করিয়াছে, কোন লোক হত্যা, অপহরণ করে নাই, লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে, আর মুসলমানের মালও লইয়া গিয়াছে ইত্যাদি। ইহারা এই মর্মে—অর্থাৎ সাধারণ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া—হিন্দুদের বিবৃতি লিখিয়া দিতেও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ভয়ে কেহ বিবৃতি দিয়াছে কিনা, জানা যায় নাই।

বেলা ১২টায় দর্শনায় গাড়ি পৌঁছিল। এখানে পাক কর্মচারিরা মালপত্র তল্লাসী করিল। মালিকহীন মালপত্র শুল্ককর্মচারিরা অনেক নামাইয়া রাখিল। কিছু মাল গোলমালের সুযোগে আবার চুরি ও লুঠ হইয়া যায়। গাড়ির গার্ড বলেন, গাড়ী ভারতে যাইবে না, সুতরাং সকলের গোয়ালন্দে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। শোনা গেল, কলিকাতা হইতে আসাম মেল নিরাপদে না আসিয়া পৌঁছিলে, এই ঢাকা মেলকে কলিকাতা যাইতে দেওয়া হইবে না। ইহার পর আসাম মেল (কলিকাতা হইতে) বেলা ৩টায় পাস করিয়া গেল। ঢাকা মেলকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বেলা ৩।।০ টায় ছাড়িয়া গাড়িখানি বেলা ৫টা ৫।।০টায় শিয়ালদহ পৌঁছিল।

ঐদিনের ঢাকা মিক্সট = ট্রেনও দুর্বৃত্তদের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। প্রায় রাত্রি ১টায় (২৫ ফেব্রুয়ারি) গোয়ালন্দ হইতে ছাড়িয়া মিক্স্‌ট্ ট্রেনখানি রাত্রি ৩টায় কালুখালি আসিয়া পৌঁছে। তখন লুণ্ঠিত পূর্বোক্ত ঢাকামেল কালুখালিতেই দাঁড়াইয়া ছিল, মিকস্ট-যাত্রিরা দেখিতে পাইল। কিছুক্ষণ আগেই সূর্যনগরে মেলট্রেন আক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। মিক্‌স্ট যাত্রিরা রাত্রি ২।টায় সূর্যনগর (ঘটনাস্থলে) ছাড়াইয়া যাইবার কালে তাহাদের ট্রেনের সব বাতি হঠাৎ নিবাইয়া দেওয়া হয়। পরে বেলগাছি স্টেশনে ট্রেন থামিলে পাঁচজন মহিলা ও দুজন পুরুষ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া মিক্স্‌ট্ ট্রেনে ওঠে। ইহারা কিছু আগে ঢাকা মেল হইতে পলাইয়া জঙ্গলে প্রাণ বাঁচায়, পরে কালুখালিতে এই গাড়িকে ব্যাক করিয়া ভাটিয়াপাড়া লাইনে সকাল ৭টা পর্যন্ত (অর্থাৎ ঢাকা মেলখানি ছাড়িবার পর পর্যন্ত) আটকাইয়া রাখা হয়। প্রাতে ৮টায় কুষ্ঠিয়া পৌঁছিয়া ইহারা দেখিল, ঢাকা মেল তখনো দাঁড়াইয়া আছে, কামরায় রক্তাক্ত বস্ত্রে ব্যাণ্ডেজবাধা বহু যাত্রি বসিয়া আছে। মুসলমানরা

চেঁচাইয়া বলিতেছে, প্রাণের ভয় থাকিলে মুসলমানরা যেন কলিকাতা না যায়। মুসলমান নামিয়া পড়। অনেক মুসলমান যাত্রি ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িল। দর্শনায় গাড়ি আসিলে দেখা যায় দুজন কর্মচারি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যজ্ঞেশ্বর রায় ও দুজন মেয়ে নিখোঁজ, তাহারা মিক্স্ট-ট্রেনে আছে কি? দর্শনায় আসিয়া আরো দেখা গেল, মিক্স্ট গাড়ির একখানা কামরা রাত্রিতে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কামরায় যাত্রিরা নিখোঁজ ও কামরায় স্তূপীকৃত পড়িয়া রহিয়াছে ট্রাংক, বিছানা, মেয়েদের শ্লিপার, বাসনপত্র প্রভৃতি মালিকহীন অবস্থায় পড়িয়া। পরে এসব মালিকহীন মালপত্র পুলিশ নামাইয়া রাখে। সন্ধ্যা ৭টায় মিক্স্ট গাড়ি শিয়ালদহ পৌঁছে। শূন্য কামরায় যাত্রিরা কোথায়, নারীদের কি হইল, কেহ জানেনা। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কে বলিবে?

সেদিন মেল ট্রেনের (এবং মিকস্ট ট্রেনের) ঘটনার পূর্ণ ও সঠিক বিবরণ কে বলিতে পারিবে? প্রাণ বাঁচাইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা কেহ জানে না, কত লোককে ও কাহাদের কোন কামরা হইতে নামাইয়া হত্যা করিয়াছে, কে কাহাকে চিনে? এক কামরার খবর অন্য কামরার যাত্রি বলিতে পারে না। অন্ধকারে নির্জন মাঠে ও জঙ্গলের মধ্যে কে কোথায় ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে কেউ জানেনা। কান্না হাহাকার ও হট্টগোলের মধ্যে সেদিনকার সব কথাই চিরদিনের জন্য অন্ধকারে চাপা পড়িয়া থাকিল। সামান্য দু-একটী খবর কেবল বহির্জগতে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছে।

আসাম মেইল—সান্তাহার হত্যাকাণ্ড

ইঃ বিঃ রেলওয়ের অনেক মুসলীম ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গার্ড পার্বতীপুরে হেড কোয়াটারে স্থানান্তরিত হইয়া বসবাস ও কার্য করিতেছে। ইহারা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে গুপ্তচরবৃত্তি করিতে প্রায়ই কলিকাতা হইতে খবর সংগ্রহ করিয়া পাকিস্তানে গিয়া বিকৃত সংবাদ ছড়াইয়াছে। এই সব গার্ড ও রেলকর্ম্মচারির সহায়তা ব্যতীত রেলপথে ব্যাপক হত্যালীলা কখনো হইতে পারিত না। রেলকর্মচারিরাও অনেকেই এইসব হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশী ছিল। মহম্মদ শরীফ নামে জলন্ধরনিবাসী এক পাঞ্জাবী মুসলমান সান্তাহারে ক্রু-ইন্সপেক্টর পদে বহাল ছিল। এই ব্যক্তি স্থানীয় আনসার বাহিনীরও নেতা। বিভিন্ন ট্রেনের গার্ডগণ কলিকাতা হইতে আসিয়া এই মঃ শরীফের কাছে খবরাখবর সরবরাহ করিত। গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম হইতেই শরীফকে আনসার-কার্য্যে ভারি ব্যস্ত দেখা যাইতে লাগিল। তাকে রেলপুলিশের ও-সি সাহেবের সহিতও প্রায়ই পরামর্শরত দেখা যাইত। সান্তাহার লাইনের হত্যায় ইহার কারসাজিই প্রধান, এই বিশ্বাস বহু স্থানীয় হিন্দুর মনে দৃঢ়মূল।

সেদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৫০)। প্রাতঃকালে ৮টায় কলিকাতাগামী ডাউন আসাম মেইল ট্রেনখানা সান্তাহার আসিয়া পৌঁছিল। পার্ব্বতীপুর হইতে সেই সময়ে শরীফকে একদল সঙ্গী সহ প্ল্যাটফর্মে খুব ব্যস্ত দেখা গেল। যাত্রিরা উঠিয়া পড়িলে ৮।টার ট্রেন ছাড়িল। কিন্তু স্টেশন হইতে মাত্র দুই ফারলং দূর যাইতেই ট্রেনকে শিকল টানিয়া থামান হইল। স্থানটী পূর্বথেকেই নির্দিষ্ট ছিল নিশ্চয়। ট্রেন লাইনের পাশে ঐস্থানে বহু মুসলমান ৮।১০ হাত দূরে দূরে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছে, হিন্দুরা গাড়ী হইতে নামিয়া যাও। কিছু না বুঝিতে

পারিয়া কতক হিন্দু হতভম্ব হইয়া নামিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে লাইনের পাথর কুড়াইয়া মুসলমান দুর্বত্তেরা তাহাদের মারিতে লাগিল। ইহার পরই দলে দলে দুর্বৃত্তেরা ট্রেনে উঠিয়া পড়িয়া কামরায় কামরায় হত্যা চালাইল। হাহাকার উঠিল, কেহবা জানলা দিয়া লাফাইয়া পড়িল। দুর্বত্তেরা কাহাকেও রেহাই দিল না। দুবৎসরের শিশু বক্ষে এক সাঁওতালী রমণী দৌড়াইয়া আসিয়া এক হিন্দু যাত্রীর কাছে দাঁড়াইল। ভয়ে ব্যথায় সে থরথর কাঁপিতেছে ও হাঁপাইতেছে। শিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া অবিরল কাঁদিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মাটীতে লম্বা হইয়া পড়িল, তার পিছনে এক গভীর ছুরিকা ক্ষত। যাত্রিটী শিশুটীকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিলে তরুণী প্রাণপণ শক্তিতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া রাখিল। নারীর প্রাণ স্তব্ধ হইয়া আসিল। শিশু তখনো স্তনলগ্ন হইয়া স্তন্য পান করিতেছে, আর তার ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়া প্রবহমান রক্তধারাকে সরাইয়া দিতেছে। যাত্রীটী ইহা দেখিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে দৌড়াইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঢুকিয়া মুসলমান যাত্রিদের পায়ে পড়িয়া প্রাণভিক্ষা করিল। তাহারা বলিল, বাথরুমে লুকাও। একজন দুর্বৃত্ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, হিন্দু আছে এগাড়ীতে? ইহারা বলে নাই। দুর্বৃত্ত একখানা রক্তমাখা ছোরা ছুড়িয়া কামরার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তখন চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে। নর নারী ও শিশুর কান্না। আধ ঘণ্টার মধ্যে লাইনের দুই পাশে নর নারী ও শিশুর মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল।

হীরেন চাকির হত্যা

এই ট্রেনে শহীদ প্রফুল্ল চাকির ভ্রাতুষ্পুত্র হীরেন চাকিও তাহার পরিবারবর্গ সহ আক্রান্ত হন। কামরায় উঠিয়া প্রথমে হীরেন বাবুকে আক্রমণ করে। তিনি জানলা দিয়া লাফাইয়া পড়েন। কিন্তু দুর্বৃত্তেরা নৃশংসভাবে তাহাতে হত্যা করে। পরে হীরেন বাবুর ভ্রাতৃবধূকে এবং এই মহিলার একটী ছেলে ও মেয়েকে ছুরি দিয়া রক্তাক্ত করে। তাহারা পরে হাসপাতালে নীত হন ও মারা যান। অসহায় নির্বিবাদী নারী ও শিশুর কাতরোক্তি এই বর্বরদের পাষাণহৃদয়কে স্পর্শ করিল না।

ডাঃ সুধীর চ্যাটার্জীর হত্যা

৭৫ বৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ বগুড়ার বিখ্যাত ডাক্তার সুধীর চট্টোপাধ্যায়ও এই ট্রেনে উঠিয়াছেন। বগুরা জেলায় সাত্তাহারে পরহিতব্রতের জন্য মুসলীমদের মধ্যেও তিনি লোকপ্রিয়। স্টেশনে তাহাকে যাইতে মানা করিয়া অনেকেই নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তেজস্বী বৃদ্ধ কাহারও মানা শুনিলেন না। কিন্তু ভাগ্য তাহাকে আত্মদানের জন্য টানিতেছিল। হঠাৎ ট্রেন থামিবার সঙ্গেই তাহাদের কামরার দুর্বৃত্তেরা উঠিয়া পড়িল। কামরায় এক মাড়োয়ারি পরিবার সহযাত্রী। তিনটী মাড়োয়াড়ী মহিলাকে দুর্বৃত্তেরা আক্রমণ করিতেই বৃদ্ধ সুধীর চট্টোপাধ্যায় সিংহবিক্রমে দুর্বৃত্তদেরে বাধা দিলেন। কিন্তু ছুরিকাহত হইয়া তাহার রক্তাক্ত দেহ লুটাইয়া পড়িল। আজীবন মুসলমানের উপকার ও সেবা করিয়াছেন তাহাতে কি? তিনি হিন্দু, ইহাই বর্বরদের পক্ষে যথেষ্ট।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরিয়া এই হত্যা ও লুণ্ঠন চলিল। পরে দেখা গেল তিন জন

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা ও দুজন পুরুষ রেল ডাক্তার ও সুপার ভাইজিং স্টেশন মাস্টার এদিকে আসিতেছেন। ঐ সময় লাইনের দুদিকে ও ট্রেনের মধ্যে শত শত মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। দুর্বৃত্তেরা তখন স্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কর্মচারিরা ট্রলী আনাইলেন এবং মেথরদের হুকুম দিলেন মৃতদেহ ট্রলীতে উঠাইতে ও বস্ত্রদিয়া ঢাকিয়া দিতে। মনে হয় ট্রলী ও ওয়াগন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। ট্রলীতে মৃতদেহ লইযা স্টেসনে গেল এবং একটা ওয়াগনের ভিতরে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হইল। তখন বেলা ১০।টা হইয়াছে। বগুড়ার জেলা ম্যাজেষ্ট্রেট খবর পাইলেন। এক ঘণ্টা পরে সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া স্টেশনে পৌঁছিল। মাথার উপরে সূর্য জ্বলিতেছে। প্রখর দিবালোকে যেসব ভাগ্যহত যাত্রিকে বলির পশুর মত হত্যা করিল তাহাদের কথা কেহ জানিলনা। কেবল অন্ধকার ওয়াগনের মধ্যে তাহাদের শীতল প্রাণহারা দেহগুলি কবরস্থ হইবার জন্য গাদাগাদি করিয়া পড়িয়া রহিল।

গোয়ালন্দ-শিলিগুড়ি ট্রেনে

উক্ত ঘটনার কিছু পরে গোয়ালন্দ হইতে শিলিগুড়িগ্রামী ট্রেনখানি বেলা একটায় আসিয়া সান্তাহার পৌঁছিল। ১টা ২০ মি কালে ঐ ট্রেন সান্তাহার হইতে ছাড়িল। হিন্দু যাত্রীরা নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে। মনে মনে ভয় থাকিলেও মাত্র তিন ঘণ্টা আগে যে হত্যাকাণ্ড সেখানে হইয়া গিয়াছে তাহার বীভৎসতা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা যে ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিল তাহারা দ্রুতগতিতে তাহাতে পড়িল। স্টেশন থেকে এক ফার্লং চলিবার পরই তেমনি চেইন টানিয়া গাড়ি হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যা। তেমনি শত শত মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল, তেমনি দিনে দুপুরে অসহায়ের আর্তনাদ আকাশে উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। এবারের বিশেষত্ব, স্টেশনে সারি বাঁধিয়া সশস্ত্র পুলিশ বন্দুক ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিকটে শত শত নরনারীর ক্রন্দনে স্টেশন মুখরিত হইলেও তাহারা পাথরের মত দাঁড়াইয়াই রহিল, নড়িল না।

বগুড়ার ট্রেনে

এর পরে ২টা ১০ মিনিটে বগুড়ার ট্রেন সান্তাহার ছাড়িল। তেমনি হত্যালীলা এবারও ঘটিল। এবারও শত শত হিন্দু পথপার্শ্বে মরিয়া পড়িয়া রহিল।

সান্তাহারে গোপাল সেনের হত্যা

আপ আসাম মেল

টাঙ্গাইলের গোপান সেন মালাকার আসামে কবিরাজি করেন। টাঙ্গাইলের পরিস্থিতি আশংকাজনক হইয়া ওঠায় তিনি পরিবারবর্গকে কর্মস্থলে লইয়া যাইবার জন্য দেশে আসেন। সিরাজগঞ্জ হইয়া ঈশ্বরদি আসিয়া আপ আসাম মেলে উঠিয়া সান্তাহার পৌঁছেন ২৮ শে ফেব্রুয়ারী বিকালে। সান্তাহার হইতে ছাড়িয়া ট্রেন আধ মাইল যাইতেই গাড়ি দাঁড়াইয়া পড়িল। কামরায় গোপাল, স্ত্রী রাজলক্ষ্মী, তিনমেয়ে ও দুই ছেলে। হঠাৎ গাড়ি থামায় ইহারা

ভীত হইয়া দেখে একজন মুসলমান গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। গাড়ির হিন্দুরা নানা বিপদ আশংকা করিতে লাগিল। আধ ঘন্টা চলিয়া যায় গাড়ী ছাড়ে না। ভয় পাইয়া কেহ কেহ নামিয়া গ্রামের দিকে ছুটিয়া যাইতে থাকে। এমন সময় চারিদিক হইতে চিৎকার আরম্ভ হইল। গাড়ীতে উঠিয়া দুর্বৃত্তেরা মারিতে কাটিতে সুরু করিল। নীচে যারা নামিয়াছিল তাহাদেরও মারিল। উপায় না দেখিয়া গোপাল যেদিকে গোলমাল বেশী হইতেছিল সেদিকে না নামিয়া অন্যদিকে পরিবার সহ নামিতে গেল। কিন্তু দরজার কাছে যাইতেই গোপালকে হাতে ধরিয়া টানিয়া নামায় এবং পিঠে ছোরা বসাইয়া দেয়। চিৎকার করিয়া নামিতে গিয়া স্ত্রী রাজলক্ষ্মী পড়িয়া যান। তখন গোপালকে আবার ছোরা বসাইয়াছে। রাজলক্ষ্মী পড়িয়া গেলে দুইজনে তার গহনা-পত্র খুলিয়া নেয়। ইতিমধ্যে গোপালকে আরো আঘাত করিয়া উলঙ্গ করিয়া কাপড় পর্যন্ত খুলিয়া গহনা টাকাকড়ি সব লইয়া যায়। স্বামীর রক্তাক্ত দেহ কোলে লইয়া রাজলক্ষ্মী কাঁদিতে থাকেন। অদূরে গাড়ির ড্রাইভার, গার্ড প্রভৃতি দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছে। রাজলক্ষ্মী তাদের পায়ে ধরিয়া সাহায্য চান, কেউ শোনেও না। কাছে মাটিকাটা খাদ হইতে নিজের শাড়ি ভিজাইয়া জল আনিয়া স্বামীর মুখে দিতে থাকেন। হতভাগিনীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তার স্বামী কিছুক্ষণেই স্তব্ধ হইয়া গেল। স্টেশন হইতে তিন জন পুলিশ তখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাদের হাতে পায়ে ধরিয়া স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য কাকুতি করিতে থাকে। তারা বলে, কি আর করিব! পরে গোপালের অসাড় দেহ হাসপাতালে লইয়া যাইবার অছিলায় ট্রেনে উঠাইয়া রাখে এবং রাজলক্ষ্মীকে তাদের সঙ্গে স্টেশনে যাইতে বলে; বলে, কোনদিকে তাকাইয়ো না। রাজলক্ষ্মী ভয়ে অর্ধমৃত হইয়া চলিতে চলিতে চারিদিকে অনেক মৃতদেহ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে থাকে। রাজলক্ষ্মী স্টেশনে রাত্রি কাটান। পরদিন ভোরে একজন আসিয়া ভাঁওতা দেয়, হাসপাতালে স্বামী ভাল আছে, দেখা করিলে ক্ষতি হইতে পারে। দেখা করিতে ব্যর্থ হইয়া রাজলক্ষ্মী পুলিশ সাহায্যে দেশে ফিরেন। যতবার খবর নিতে লোক গিয়াছে, মাঝপথেই মিথ্যা আশ্বাস দিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। প্রায় ২কি ৩ মাস পরে একজন সত্যিকথা বলে যে ঘটনাস্থলেই গোপাল মারা যায়। ইহার পর রাজলক্ষ্মীর দুই মেয়ে ও এক ছেলে উক্ত হত্যাকাণ্ড চক্ষে দেখিয়া ভয়ে জ্বর হইয়া মারা যায়। নিরুপায় মহিলা আজ সর্বহারা হইয়া পশ্চিমবঙ্গে দৈন্যলাঞ্ছিত জীবন কাটাইতেছেন।

বাহাদুরাবাদ, জগন্নাথগঞ্জ, চাটগাঁ

সর্বত্রই ১১ই ফেব্রুয়ারি হইতে ট্রেনগুলি আক্রমণ করিয়া যাত্রিদের হত্যা করিয়া লাইনের ধারে লাস ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহাদুরাবাদ ময়মনসিংহ জগন্নাথগঞ্জ লাইনেও কদিন ট্রেনে ট্রেনে হত্যা চলিয়াছে। চাটগাঁ-চাঁদপুর লাইনেও কতলোক হত্যা করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

১১ই তারিখের সন্ধ্যাবেলা। টঙ্গি স্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া দৌঁড়াইয়া ৮।৯ জন হিন্দু পুরুষ ও নারী দত্তপাড়ায় গোঁসাইবাড়ী যাইয়া উপস্থিত। রাত্রির জন্য আশ্রয় চায় তাহারা। ভৈরবের দিক হইতে ঢাকা যাইতেছিল, পথে ট্রেনের মধ্যে কামরায় কামরায় হত্যা করিয়া মৃতদেহ বাইরে ফেলিয়া দিতে দেখিয়া আতংকিত হইয়া টঙ্গিতে নামিয়া পড়িয়াছে। তাহারা

টঙ্গি স্টেশনে দেখিয়াছে, এক মুসলেম যুবকের নেতৃত্বে একদল মুসলমান ট্রেন হইতে হিন্দুদের টানিয়া নামাইয়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রি-কামরায় পুরুষ ও নারীদের আটকাইয়া রাখিতেছে। ভিতর হইতে আসিতেছে গোঙরানী ও আর্তনাদ। ইহারা দ্রুত স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল। কিন্তু বিহারী স্টেশন-মাষ্টার বলে, 'শালা হিন্দুলোক; তোমরা দুষমণ। দাঁড়াও তোমাদের শেষ করিতেছি।' শুনিয়া প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া ইহারা দত্তপাড়ায় আসিয়া পড়িল। ১২ই প্রাতেও এমনি ১০।১২ জন হিন্দুপুরুষ স্ত্রী, শিশু টঙ্গি হইতে দত্তপাড়া আসিল। তারা আশ্রয় চাহে। ময়মনসিংহ হইতে ঢাকার পথে ট্রেনে বীভৎশ হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন দেখিয়া, টঙ্গিতেও নামিয়া সেই একই দৃশ্য দেখিয়া, তাহারা পালাইয়াছে। ইহা নমুনা মাত্র। সীতাকুণ্ডে শিবচতুর্দশীর (১৫ই) মেলার ট্রেনে অগণিত নরনারী আক্রান্ত হয়। দুই পাশে রেলপথে সংখ্যাহীন মৃতদেহ পড়িয়াছিল। ইহাদের কাহিনী চিরদিন অজ্ঞাত থাকিবে—সংখ্যাও।

ষ্টীমারে—'নাগা', সীতাকুন্ড, অষ্ট্রীচ

ষ্টীমারে ষ্টীমারেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। পূর্ববাংলা নদীবহুল দেশ। বাহির হইতে হইলে নৌকা ষ্টীমারে ছাড়া উপায় নাই। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা হইতে বরিশালগামী 'নাগা' ষ্টীমারের যাত্রিদের হত্যা করিয়া মৃতদেহ জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর-এস-এন কোং-র সীতাকুন্ড ষ্টীমার ১৬ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের পথে ভোলা হইতে ৭ মাইল দূরে ইলশাঘাটে ছিল। রাত ৮।।০ টায় শত শত মুসলমান আক্রমণ করে এবং ৩০ জন হিন্দুযাত্রিকে হত্যা করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। পরদিন প্রাতে দেখা যায় মাত্র ৩জন যাত্রি প্রাণে বাঁচিয়া আছে। ঐদিন ইলশাঘাটে 'উইভগন' ষ্টীমারের যাত্রিদের উপর খালাসীদের জুলুম হওয়ায় যাত্রীরা পারে নামিয়া পরে সীতাকুণ্ডু ষ্টীমারে উঠিয়াছিল।

ষ্টীমার 'অষ্ট্রিচ' ২৭ ফ্রেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দের পথে ভাগ্যকূলে থামিলে তীর হইতে শত শত মুসলমান ও আনসার হিন্দু-যাত্রীকে তীরে নামিতে বাধ্য করে, বলে আমরা এখান থেকে যাইতে দিব না। জনৈক এডভোকেট ও তীরস্থ কিছু লোকের হস্তক্ষেপে পরে যাত্রীদের ষ্টীমারে উঠিতে আবার দেয়। পরবর্ত্তী স্টেশন 'রাজখারা' সন্ধ্যায় পৌঁছিলে ১নং ড্রাইভার আহমদ সোভান ও সারেং ষ্টীমারের উপর হইতে ঈশারা করিলেন পাড়ে অপেক্ষমান ২ জন আনসার-ক্যাপ্টেনকে। তারা আসিলে সোভান ও সারেং ভাগ্যকুলের ঘটনা বলে, 'এখন তোমরা যা ইচ্ছা করিতে পার।' আনসাররা বলে, কতক্ষণ ষ্টিমার ঘাটে থাকিবে?' সারেং—যতক্ষণ তোমাদের প্রয়োজন।' আন্সার ক্যাপ্টেনরা দেড়শত লাঠিধারী গুণ্ডাসহ আসিয়া হিন্দুযাত্রীদের নামিবার জন্য জেদ ও জুলুম করিতে থাকে। যাত্রিরা অস্বীকার করিলে ৪।৫ জন লোক পাঠাইয়া কাছের গ্রাম হইতে হাজার মুসলমান আনাইয়া লুঠতরাজ ও মারপিট শুরু করে। মেয়েপুরুষ সকলের উপর অসম্ভব অত্যাচার চলে এবং টানিয়া তীরে নামান হয়। রাত ৮টায় সমস্ত হিন্দুকে নির্জন পদ্মার তীরে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া শুধু ২৫ জন মুসলেম যাত্রিসহ 'অষ্ট্রীচ' রওনা হইল। পদ্মার জলকল্লোলকে ছাপাইয়া দু হাজার হিন্দুর, স্ত্রীলোক ও শিশুদের, ক্রন্দন সেই ফাঁকা মাঠে আকাশে উঠিল। মণীন্দ্র

ভট্টাচার্য নামক যাত্রি লুঙ্গি পরিয়া মুসলমান বেশে ষ্টিমারে থাকিয়া গেলেন। ষ্টিমার রওনা হইতেই পায়খানায় দুজন হিন্দুকে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেল। খালাসীরা তাদের মিনিত অগ্রাহ্য করিয়া তাদের পদ্মার জলে ফেলিয়া দিল। সারেং চেঁচাইয়া বলে, ভাই সব, ষ্টিমারে আর হিন্দু পাইলে তক্ষণি হত্যা করিবে।

গোয়ালন্দ রাত ১০টায় পৌঁছিয়াও একই কাহিনী। ক্রন্দনরত লুণ্ঠিতসর্বস্ব নারীদের চিৎকারে স্টেশন মুখরিত। মণীন্দ্রের কানে তখন পদ্মাতীরে পরিত্যক্ত দুহাজার অসহায় নরনারীর আর্তনাদ বাজিতেছে, তাহার পরিবারের বার জন আত্মীয়ও সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। ষ্টীমার সারেং ড্রাইভার খালাসী ও পারের আনসার ও ক্ষিপ্ত জনতা মিলিয়া পূর্ববাংলার নদীতে নদীতে কত হিন্দু নর-নারীর জীবন নিয়াছে কে তার সংখ্যা নির্ধারণ করিবে? কলিকাতার বুকের উপরে আই-জি-এন, আর-এস-এন কোম্পানীর বিরাট হেড্ অফিসে ইংরাজ কর্মচারিরা নিরাপদে লক্ষ লক্ষ টাকা শোষণ করিতেছে; কিন্তু তাদের নিযুক্ত মুসলমান সারেং খালাসীদের বর্বরতা ও পশুত্বের কোন প্রতিবিধান বা প্রতিকার না করিয়া তাহারা চোখ বুজিয়া উদাসীন হইয়া আছে। ভারত সরকার এ সম্বন্ধে নির্বিকার। শিরে করাঘাত করিয়া হিন্দুযাত্রিরাও তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা কেবল বিধাতার কাছেই তাদের নালিশ পৌঁছাইয়া দিল।

পরিশিষ্ট

(ক)

১৯৪৬ - ৪৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে এবং দেশভাগর সময় বাংলার তপশীলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলিম লীগের পাকিস্তান ও ভারতভাগের দাবীর কট্টর সমর্থক ছিলেন। তিনি ও তার দল মুসলীম লীগের দাবীর সমর্থনে দাঁড়াইবার ফলে পাকিস্তান দাবী জোরদার হয়েছিল, এবং বাংলার নমঃশূদ্র অধ্যুষিত জেলাগুলি খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল — সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির পথ প্রশস্ত করেছিল।

"যোগেনবাবুর নিজস্ব একটা তত্ত্ব ছিল। তাঁর মতে পাকিস্তান হাসিল করার জন্য মুসলিম লীগ লড়াই করছে কেবল বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধেই, তফশীলী বা দলিতদের বিরুদ্ধে নয়। তাই বর্ণ হিন্দুদের শত্রু মুসলমানগণ তফশীলী হিন্দুগণের পরম মিত্র। কাঙ্খিত ভূমি পাকিস্তানে মুসলমান ভাইদের সাথে সাথে তফশীলীদেরও সার্বিক অভ্যুদয়ের নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। দলিতদের স্বার্থ পাকিস্তানেই সুরক্ষিত থাকবে, হিন্দুস্থানে নয়। এই স্বরচিত তত্ত্বের বশবর্তী হয়ে হিতাহিত ও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে নিজ অনুগামীগণ সহ তিনি Scheduled Caste Federation-কে মুসলিম লীগের পাশে দাঁড় করালেন এবং পাকিস্তান অর্জ্জনের পবিত্র যুদ্ধে সহযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

(দেবজ্যোতি রায়–দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কেন পদত্যাগ করেছিলেন)

"দেশ বিভাগের সময় তপশীলী হিন্দুদের মধ্যে–বিশেষ করে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে— মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীযুক্ত যোগেন মণ্ডলের নেতৃত্বে তপশীলী হিন্দুদের একটা অংশ, মুসলিম শাসনে তপশীলী হিন্দুদের কোন অসুবিধা হবে না—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হবে, এই ধারণা পোষণ করে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। দেশ বিভাগের পর তারা পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে গেল ও শ্রীযুক্ত যোগেন মণ্ডল স্বয়ং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান পেলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে সব তপশীলী নেতার সহমত ছিল না। শ্রীযুক্ত পি. আর. ঠাকুর পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন ও তাঁর নেতৃত্বে নমঃশূদ্র সম্পদায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ভারত বিভাগ হ'লে বঙ্গ বিভাগ করতে হবে-এই দাবীতে তাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর ১৯৫০ সালে মুসলিমরা পূর্ব পাকিস্তানে যে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করেছিল, তা অতিক্রুত হিন্দুদের Genocide বা গণহত্যায় পরিণত হয়েছিল। সেই অগ্নিপরীক্ষার সময় দেখা গেল যে বর্ণ-হিন্দু ও তপশীলী হিন্দু যুগপৎ মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা নিহত ও ধর্ষিত হয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত যোগেন মণ্ডল দাঙ্গা হাঙ্গামার পর পূর্ব পাকিস্তান পরিদর্শনে গিয়ে যে বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তার ফলশ্রুতি হল পাকিস্তানের মন্ত্রীসভা থেকে তাঁর পদত্যাগ ও পাকিস্তান পরিত্যাগ।"

(ভূমিকা—ঐ: শ্রীঅমিতাভ ঘোষ)

১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গে হিন্দু গণহত্যার ফলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিণতিতে ভারত ও পাকিস্তান মন্ত্রীসভা থেকে দু'জন মন্ত্রীর পদত্যাগে প্রবল হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচারে নেহেরুজীর নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা ও পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে অবমাননাকর চুক্তি সম্পাদনের প্রতিবাদে। উক্ত চুক্তিপত্রে ভারতের মুসলমানদের নিরাপত্তাদানে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে নেহরুজী তাদের জান মালের নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে হিন্দুদের নিরাপত্তা বিধানের ভার অত্যাচারী মুসলমান শাসকদের হাতেই তুলে দিয়ে নিজেদের দায়দায়িত্ব থেকে সরে এলেন। নেহরুর এই ক্লৈব্য নীতি এবং নেকড়ের মতো হিংস্র পাকিস্তানীদের হাতে অসহায় হিন্দুদের নিক্ষেপ করে বীরত্বের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ শ্যামাপ্রসাদ মনেপ্রাণে মেনে নিতে না পেরে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

অন্যদিকে পাকিস্তান মন্ত্রীসভার আইন মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল তাঁর সাধের ও স্বপ্নের পাকিস্তানে হিন্দুদের, বিশেষ করে তার স্ব-সম্প্রদায় নমঃশূদ্র শ্রেণীর উপর যে অবর্ণনীয় অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার জন্য নিজের অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতাই যে বহু পরিমাণে দায়ী, সে অপরাধবোধ ও মর্মবেদনা তার পদত্যাগ পত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছিল। তিনি অগাধ বিশ্বাস নিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন, কিন্তু মুসলিম লীগের কার্যোদ্ধার হতেই কিভাবে পদেপদে প্রতারিত ও অপদস্থ হয়েছেন এবং তাঁরই অপরিণামদর্শিতার খেসারত স্ব-সম্প্রদায়কে নরের রক্তে ও নারীর ইজ্জত দিয়ে দিতে হয়েছে, সেসব করুণ কাহিনী কোনও লুকোছাপা না করে যোগেনবাবু বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। বিভাগোত্তর বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পর্যালোচনায় দুখানি পদত্যাগ পত্রেরই তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে রয়েছে—বিশেষ করে মুসলমানদের সঙ্গে বা মুসলমানদের নিয়ে রাজনীতি করলে আখেরে হিন্দুদের যে চরম মূল্য দিতে হয়, প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের পদত্যাগ পত্রের ছত্রে ছত্রে তা প্রকাশ পেয়েছ। বর্তমান কালের মুসলিম তোষামোদকারী সেকুলার হিন্দু রাজনীতিকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে সেই অমোঘ পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলেই বিশ্বাস।

নেহরু লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫০-এর ৮ এপ্রিল ঐদিনই বিকাল বেলায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অপর বাঙালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী চুক্তির প্রতিবাদে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। আর ১৪ই এপ্রিল পার্লামেন্টে তাঁর পদত্যাগের উপর ভাষণে এই চুক্তির অসারতা ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষৎ সম্পর্কে ড. মুখার্জী যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

এদিকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মশাই পাকিস্তান ত্যাগ করে চুপিসারে কলকাতা এসে ৯ অক্টোবর ১৯৫০ তারিখে এখান থেকেই পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন। তাঁর পদত্যাগপত্রের বঙ্গানুবাদ এবং ড. মুখার্জীর ইংরেজী বক্তৃতা পরপর প্রকাশ করা হল, বাঙালী হিন্দুর বিপর্যস্ত জীবনের প্রামাণ্য ও অকাট্য দলিল হিসাবে।

(ক) যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগপত্র থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি : লিয়াকতআলি খানকে উদ্দেশ্য করে লিখিত ঃ—

বাংলা ভাগ

আমি বাংলা ভাগের বিপক্ষে ছিলাম। আমার মতের সপক্ষে আন্দোলন পরিচালিত করতে গিয়ে আমি যে কেবল সকল দিক থেকেই প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছি তা নয়, অনেক অকথ্য গালিগালাজ অপমান এবং অসম্মানও সহ্য করতে হয়েছে। সেই দিনগুলির কথা ভাবলে আজ বড় ব্যথা পাই, যখন পাক-ভারত উপমহাদেশের ৩২ কোটি হিন্দু অনীহাবশত আমার প্রতি পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল এবং আমাকে হিন্দু ও হিন্দুত্বের শত্রুরূপে আখ্যা দিয়েছিল, কিন্তু তবুও পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যে আমি ছিলাম অদম্য ও অবিচলিত। পাকিস্তানের ৭০ লক্ষ তপশীলী জাতির মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যে উৎসাহব্যাঞ্জব সাড়া পেয়েছিলাম, তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা, সহানুভূতি ও উৎসাহ জুগিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর আপনি (লিয়াকত আলিখান) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করে আমাকেও তার অন্তর্ভুক্ত করলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি অস্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। ১০ই আগষ্ট করাচীতে আমি খাজা নাজিমুদ্দীনকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, তিনি যেন পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভায় তপশীলী জাতির সদস্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে মন্ত্রীর পদে গ্রহণ করেন। পরে কোন এক সময় দু'জন মন্ত্রী নেবার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে যা ঘটল, তা খাজা নাজিমুদ্দীন ও নুরুল আমিনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও দরকষাকষির এক নিদারুণ নৈরাশ্যজনক খতিয়ান ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন বুঝলাম, খাজা নাজিমুদ্দীন একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, তখন আমি প্রায় অধৈর্য ও হতাশ হয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা নিয়ে আমি পাকিস্তান মুসলিম লীগ ও তার পূর্ববঙ্গ শাখার সভাপতিদের সঙ্গে ফের আলোচনা করলাম; শেষমেশ আপনার নজরে আনলাম। বিষয়টি নিয়ে আপনি নিজ বাসভবনে আমার সামনেই খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে আলাপ করবেন কথা দিলেন। ঢাকা ফিরে গিয়ে তপশীলী সম্প্রদায় থেকে একজন মন্ত্রী গ্রহণ করতে সম্মত হলেন নাজিমুদ্দীন। যেহেতু কাজা নাজিমুদ্দীনের আশ্বাসের উপর আমি আগে থেকেই বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছিলাম, তাই আমি একটা নিশ্চিত সময়সীমা দাবী করলাম। আমি চাপ দিলাম, আগামী এক মাসের মধ্যেই তিনি এই উদ্দেশ্যে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন; নইলে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার অধিকার পাব। খাজা নাজিমুদ্দীন এবং আপনি, উভয়ই এই শর্ত মেনে নিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! আপনাদের মুখের ভাষা ও মনের কথা সম্ভবত এক ছিলনা। খাজা নাজিমুদ্দীন তার কথা রাখলেন না। নুরুল আমিন মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ব্যাপারটি আমি পুনরায় তাঁর নিকট উত্থাপন করলাম। তিনিও এড়িয়ে যাওয়ার সেই পরিচিত পুরনো কৌশলই অনুসরণ করলেন। ১৯৪৯ সালে আপনার ঢাকা সফরের প্রাক্কালে যখন আমি বিষয়টির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, তখন যেন খুশী মনে আপনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে একজন মন্ত্রী

নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে আমার কাছ থেকে ২/৩ জন যোগ্য ব্যক্তির নাম চেয়ে পাঠান। আপনার ইচ্ছামত আমি পূর্ববঙ্গ বিধানসভার ফেডারেশান গ্রুপের বিধায়কগণের মধ্য থেকে তিন জনের নাম প্রস্তাব করে আপনার কাছে একটি নোট পাঠাই। ঢাকা থেকে আপনার প্রত্যাবর্তনের পর এ বিষয়ে কদ্দুর কি অগ্রগতি হল তা জানতে চাইলাম। অত্যন্ত নিরাগ্রহ ও নিরুত্তাপ কণ্ঠে আপনি বললেন, 'দেখা যাক নুরুল আমিন দিল্লী থেকে ফিরে এসে কি করেন।'' কিছুদিন যাবার পর ব্যাপারটি নিয়ে আমি আবার চাপ দিলাম। কিন্তু আপনি বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। তখন আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম যে, না আপনি, না নরুল আমিন কারুরই মনে কোন সদিচ্ছা নেই পূর্ববঙ্গ মন্ত্রীসভায় তপশীলী জাতি থেকে কোন মন্ত্রী নেওয়ার প্রশ্নে। এছাড়া আমি লক্ষ করছিলাম যে, নুরুল আমিন এবং অন্য আরও কিছু লীগ নেতা সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশানের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ -বিসংবাদ ও ঝগড়া সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আমার নেতৃত্ব ও বিপুল জনপ্রিয়তাকে তাঁরা ভাল চোখে দেখছেন না, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে তপশীলী জাতির লোকদের সৎ প্রচেষ্টা, সতর্ক নজরদারী এবং সোচ্চার প্রতিবাদ পূর্ববঙ্গ সরকার ও কিছু লীগ নেতার কাছে এক প্রকার অস্বস্তিকর উপদ্রবের হীন মর্যাদাই লাভ করছে। এতৎ সত্ত্বেও আমি দমলাম না। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আমি দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম।

হিন্দু-বিরোধী নীতি

বাংলা ভাগের প্রশ্ন যখন বড় আকার ধারণ করে সামনে উপস্থিত হল, তখন তপশীলী জাতির লোকেরা এই বিভাজনজনিত সম্ভাব্য ভয়ঙ্কর কুফলগুলির কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। তাঁদের পক্ষ থেকে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর কাছে আর্জি পেশ করা হল। সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে তপশীলী জাতির মানুষেরা এতাবৎকাল পর্যন্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে আসছেন। বিভাজনের পর তাঁরা অবশ্যই সেগুলি ভোগ করবেন, কিছুই হ্রাস করা হবে না, অধিকন্তু বাড়তি সুযোগ সুবিধাও তাঁরা প্রাপ্ত হবেন। এই অঙ্গীকার শুধুমাত্র মিঃ সুরাবর্দ্দীর ব্যক্তিগত অঙ্গীকার নয়, লীগ মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গীকারও বটে। গভীর পরিতাপের বিষয় এই, দেশভাগের পর, বিশেষ করে কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর, তপশীল জাতির মানুষেরা কোন ব্যাপারেই সুবিচার পেল না। তপশীলীদের অভিযোগসমূহ কত সময়, কতবার আমি আপনার কাছে উথাপন করেছি, হয়তো আপনার মনে পড়ে। পূর্ব বাংলার প্রশাসনে কি ধরনের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা বিরাজ করছে তা আমি বিস্তারিতভাবে অনেকবার আপনার কাছে তুলে ধরেছি। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সাঙ্ঘাতিক সব অভিযোগও আমি দায়ের করেছি। ছুতোনাতা নিয়ে, সামান্য কারণে সাধারণ মানুষের উপর কত অত্যাচার তারা চালিয়ে যাচ্ছে তাও আমি আপনার নজরে এনেছি। পূর্ববঙ্গ সরকার বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন এবং লীগ নেতৃত্বের একাংশ প্রকৃতপক্ষে হিন্দু–বিরোধী নীতিই অনুসরণ করছে। এই তথ্যও আমি নির্দ্বিধায় আপনাকে জানিয়েছি।

কিছু ঘটনা

প্রথম যে ঘটনা আমাকে মর্মাহত করল তা ঘটেছিল গোপালগঞ্জের নিকটবর্তী দিঘরকুল গ্রামে। জনৈক মুসলমানের মিথ্যা অভিযোগে কান দিয়ে স্থানীয় নমঃশূদ্রদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার সংঘটিত করা হল। সত্য ঘটনা এইরূপ—নদীর বুকে নৌকা বেয়ে যেতে যেতে এক মুসলমান, জনৈক নমঃশূদ্র যেখানে মাছ ধরছিল সেখানে তার সামনেই জাল ফেলতে উদ্যত হল। নমঃশূদ্র তাকে বাধা দিল। ফলে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হল। নিজের জেদ বজায় রাখতে না পেরে মুসলমানটি নিকটবর্তী মুসলমান গ্রামে দিয়ে রটনা করল যে, সে এবং তার নৌকার আরোহী এক মহিলাকে নমঃশূদ্ররা আক্রমণ করেছে। সেই সময় গোপালগঞ্জের এস.ডি.ও.সাহেব নৌকাযোগে ঐখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই মিথ্যা অভিযোগকে তিনি সত্য ঘটনা বলে গ্রহণ করলেন এবং নমঃশূদ্রদেরকে শায়েস্তা করার জন্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করলেন। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এলে স্থানীয় মুসলমানরাও তাদের সঙ্গে যুক্ত হল। তারা কেবল নমঃশূদ্রদের বাড়ীঘরের উপর চড়াও হয়ে ক্ষান্ত হল না, নির্মমভাবে প্রহার করল নারী ও পুরুষদের। তাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করল এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করল। নির্মম প্রহারের ফলে ঘটনাস্থলেই এক গর্ভবতী রমণীর গর্ভপাত ঘটল। স্থানীয় প্রশাসনকৃত এই পৈশাচিক অত্যাচারে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মানুষের মনে ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার হল।

১৯৪৯—এর প্রথম দিকে বরিশালের গৌরনদী থানা এলাকায় অত্যাচারের দ্বিতীয় ঘটনা সঙ্ঘটিত হল। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডে দু'টি গোষ্ঠির মধ্যে এক কলহ হয়। বিবদমানগোষ্ঠি দুটির একটি পুলিশের নেক নজরে ছিল। কমুনিষ্ট ভাবাপন্ন হওয়ার অভিযোগ এনে তারা প্রতিপক্ষ গোষ্ঠিকে শায়েস্তা করার মতলব আঁটতে লাগল। গৌরনদী থানার উপর কমুনিষ্টরা আক্রমণ করতে পারে, এইরূপ মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে ভীতির পরিবেশ রচনা করে সদর থেকে সশস্ত্র বাহিনী আনানো হল। সশস্ত্র সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে পুলিশ বাহিনী ঐ অঞ্চলের বহু বাড়ি আক্রমণ করল এবং মূলবান জিনিসপত্র লুট করল। এমনকি যেসব বাড়ীর মালিক কমুনিষ্ঠ হওয়া দূরের কথা, রাজনীতিই করেন না, এমনকি বাড়ীতেও থাকেন না, তাঁদের বাড়ীঘর থেকেও জিনিসপত্র লুট করা হল। এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহুসংখ্যক মানুষকে গ্রেপ্তার করা হল। অনেক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষককে কমুনিষ্ট সন্দেহে অযথা হয়রানি করা হল। এই এলাকাটি আমার নিজ গ্রামের অতি নিকটবর্তী; ফলে পুরো ঘটনাটি আমার গোচরে আনা হয়। আমি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারকে ঘটনাটির যথাযথ তদন্ত করবার জন্য লিখলাম। স্থানীয় জনগণের একাংশ এস.ডি.ও.কর্তৃক ঘটনাটির তদন্তের আর্জি জানাল। কিন্তু কোন রকম তদন্তেই করা হল না। এমন কি জেলা কর্তৃকপক্ষের কাছে লেখা আমার চিঠিগুলির প্রাপ্তি—স্বীকারও করা হল না। তারপর আমি বিষয়টি আপনি সহ পাকিস্তানের সর্ব্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির গোচরীভূত করলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হ'ল না।

মিলিটারীর জন্য মেয়ে মানুষ

সিলেট জেলার হবিগঞ্জের নিরপরাধ হিন্দুদের, বিশেষত তপশীলী জাতির হিন্দুদের উপর পুলিশ ও মিলিটারীর সম্মিলিত বর্বর অত্যাচারের কাহিনী এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অসহায় নিরপরাধ নারী–পুরুষের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাবার পর বেশ কিছু নারীর সতীত্ব হরণ করা হয়, তাদের সম্পত্তি লুট করে। এরপর এলাকায় মিলিটারী চৌকি বসান হয়। সৈন্যরা কেবল হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে এবং তাদের ঘরবাড়ী থেকে খাদ্য জোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়েই ক্ষান্ত থাকল না, রাতের বেলায় তাদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য হিন্দুবাড়ীর মেয়েদেরকে মিলিটারী ক্যাম্পে পাঠাতে বাধ্য করল। এই ঘটনাটিও আমি আপনার দৃষ্টিগোচর করেছি। এবিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন চাইবেন, এ আশ্বাস আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এর উপর কোন প্রতিবেদনই তৈরী হল না।

১৪. তারপর ঘটল রাজশাহী জেলার নাচোলের সেই ঘটনা, সেখানে কমুনিষ্ট দমনের নাম করে পুলিশরা এবং তাদের সাহায্যে নিয়ে তাদেরই মদতকারী স্থানীয় মুসলমানরা স্থানীয় হিন্দুদের উপর অত্যাচার করল ও সম্পত্তি হরণ করল। এরপর সাওতালরা সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। স্থানীয় মুসলমান ও পুলিশ কর্তৃক সঙঘটিত এই বর্বর নারকীয় অত্যাচার কাহিনী তাদের মুখ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

১৫. ১৯৪৯-এর ২০ শে ডিসেম্বর খুলনা জেলার মোল্লারহাট থানার অন্তর্গত কালশিরা গ্রামের ঘটনা ঠান্ডা মাথায় সংঘটিত করা ন্যক্কারজনক নৃশংস পাশবিকতার আর এক উদাহরণ। ঘটনা এইরূপ—একদিন শেষরাতে চারজন কনস্টেবল কমুনিষ্ট পাকড়াও করার নাম করে জনৈক জয়দেব ব্রহ্মের বাড়ী খানা-তল্লাসী করতে যায়। পুলিশের গন্ধ পেয়েই কয়েকজন সম্ভাব্য কমুনিষ্টসহ জনা ছয় যুবক ঐ বাড়ী থেকে পালাল। এই দেখে পুলিশের লোকেরা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে জয়দেব ব্রহ্মের স্ত্রীকে প্রহার করতে লাগল। তার আর্ত চিৎকার শুনে জয়দেব ও তার সঙ্গীরা, যারা একটু আগেই ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা মরীয়া হয়ে পুনরায় ঘরে এসে ঢুকল এবং দেখতে পেল চারজন কনষ্টেবলের মধ্যে মাত্র একজনের হাতেই একটা বন্দুক রয়েছে। হয়তো এতেই উৎসাহিত হয়ে তারা একজন সশস্ত্র কনষ্টেবলকে সজোরে আঘাত করল। সে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারাল। যুবকেরা তখন দ্বিতীয় কনষ্টেবলকে আঘাত করল। ইত্যবসরে বাকী দুজন কনষ্টেবল দৌড়ে বেরিয়ে এসে চিৎকার জুরে দিল। চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে প্রতিবেশী লোকজন তাদেরকে সাহায্যে করার জন্য এগিয়ে এল। যেহেতু সূর্যোদয়ের পূর্বে রাতের অন্ধকারে থাকতে থাকতেই ঘটনাটা ঘটেছিল, তাই গ্রামবাসীরা এসে পৌঁছবার আগেই হত্যাকারীরা লাশ নিয়ে পালিযে যেতে সক্ষম হয়। পরদিন অপরাহ্নে খুলনার পুলিশ সুপার একদল সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যেই আক্রমণকারীরা এবং প্রতিবেশী বুঝদার লোকেরা সবাই এলাকা ত্যাগ করে সরে পড়েছে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামবাসী, যাঁরা পুরোপুরি নিরপরাধ, তাঁরা সবাই বাড়ীতেই ছিলেন। এই ঘটনার ফলাফল কি হতে পারে তা তাঁরা মোটেই বুঝে উঠতে পারেননি। এরপর পুলিশ সুপার নিজে, সৈন্যরা এবং সশস্ত্র পুলিশের লোকেরা একত্রে মিলে সারা গাঁয়ের নিরপরাধ মানুষগুলোকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে শুরু

করল, এবং প্রতিবেশী মুসলমানগণকে এদের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে লাগল। বেশ কিছু লোক প্রাণ হারাল, অনেক নারী ও পুরুষকে ধর্মান্তরিত করা হল, গৃহদেবতার মূর্তি ভেঙে চুরমার করা হল এবং দেবস্থান কলুষিত করে ধ্বংস করা হল। পুলিশ, মিলিটারি ও স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা অনেক নারী হলেন ধর্ষিতা। এইভাবে কেবল দেড় মাইল লম্বা কালশিরা গ্রাম নয়, নিকটবর্তী আরো অনেক নমঃশূদ্র গ্রামে সত্যি সত্যি এক বীভৎস নারকীয়পরিবেশ রচনা করা হল। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে কালশিরা গ্রাম কখনোই কমুনিষ্টা উপদ্রুত এলাকারূপে চিহ্নিত ছিল না। কালশিরা থেকে তিনি মাইল দূরে অবস্থিত ঝালরডাঙ্গা কমুনিষ্ট ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। যে রাতে কালশিরা গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছিল, ঐদিনই এক বিরাট পুলিশ বাহিনী এই ঝালরডাঙ্গা গ্রামে অভিযুক্ত কমুনিষ্টদেরকে খুঁজে বার করার জন্য এক অভিযান চালায়। বেশ কিছু কমুনিষ্ট যুবক এখান থেকে পালিয়ে নিরাপদ স্থান কালশিরায় উক্ত জয়দেব ব্রহ্মের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল।

১৬. ১৯৫০–এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী আমি কালশিরা ও তৎপার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করলাম। খুলনার পুলিশ সুপার ও কয়েকজন বরিষ্ঠ লীগ নেতা আমার সঙ্গে ছিলেন। কালশিরায় এসে দেখলাম গ্রামটি জনশূন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। পুলিশ সুপারের সমক্ষেই আমাকে বলা হয় যে এই গ্রামে মোট ৩৫০টি বাড়ী ছিল। তন্মধ্যে তখন মাত্র ৩টি বাড়ী অক্ষত অবস্থায় ছিল। বাকি সব বাড়ী গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নমঃশূদ্রদের দেশী নৌকা, গরু-ছাগল সব লুটে নেওয়া হয়েছে। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্য সচিব, মুখ্য পুলিশ অধিকর্তাএবং আপনাকেও আমি এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ পাঠিয়েছি।

১৭. এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ঘটনার বৃত্তান্ত পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রে খবররূপে প্রকাশিত হবার পর সেখানকার হিন্দুরা বিচলিত হয়ে উঠেন। কালশিরার অনেক অত্যাচারিত, গৃহহীন পথের ভিখারিতে পর্যবসিত নরনারী কোলকাতায় পালিয়ে এসে তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কাহিনী শোনাল। ফলে, জানুয়ারীর শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে কিছু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটল।

ফেব্রুয়ারীর গোলযোগের কারণ

১৮. একথা মনে রাখতে হবেই যে, কালশিরার ঘটনার প্রতিক্রিয়ারূপে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘটিত কিছু হাঙ্গামার খবর পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রে অতিরঞ্জিত করে ছাপানো হয়। ১৯৫০--এর ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ বিধান সভায় বাজেট অধিবেশন চলাকালীন কংগ্রেস বিধায়করা কালশিরা ও নাচোলের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার অনুমতি চেয়ে দু'টি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু প্রস্তাব দু'টি নাকচ করে দেওয়া হয়। প্রতিবাদে কংগ্রেস বিধায়করা সভাকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। হিন্দু বিধায়কদের এই আচরণে প্রদেশের মন্ত্রীগণ শুধু নয়, মুসলিম নেতৃবর্গ এবং আমলাবৃন্দও বিরক্ত ও রুষ্ট হয়ে উঠলেন। ১৯৫০ স্যালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা–পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার এটাই সম্ভবত প্রধান কারণ।

১৯. একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটানো হল১৯৫০–এর ১০ই ফেব্রুয়ারী। একটি মেয়েছেলেকে লাল রঙ্ মাখিয়ে এমনভাবে দেখানোর চেষ্টা হয় যেন কলকাতায় দাঙ্গায় তার স্তন দুটি কেটে ফেলা হয়েছে। সকল দশটার সময় তাকে ঢাকাস্থ পূর্ববঙ্গ সচিবালয়ের অফিসে ঘোরানো

হ'তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ববঙ্গ সচিবালয়ের সমস্ত কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়ে হিন্দুদের উপর বদলা নেওয়ার স্লোগান দিতে দিতে মিছিল করে পথে বেরিয়ে পড়ল। এক মাইলের কিছু বেশী দূরত্ব অতিক্রম করতে না করতেই মিছিলের আকার ও আয়তন বৃদ্ধি পেতে লাগল। বেলা ১২টায় ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত গিয়ে মিছিল শেষ হল। সেখানে এক জনসভায় আমলাগণসহ কতিপয় বক্তা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষণ দিলেন। পুরো খেল্টার মজা এইখানে যে যখন গোটা সচিবালয়ের সমস্ত কর্মী কাজ ফেলে রেখে মিছিলে যোগদান করার জন্য বেরিয়ে পড়ছিল, তখন ঐ বাড়ীরই একটি কক্ষে পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব তাঁর প্রতিপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের সঙ্গে বসে, কিভাবে উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করা যায় তারই পন্থা-পদ্ধতি নিরুপণ করতে ব্যস্ত ছিলেন।

সরকারী কর্মীরা মদত দিল লুটেরাদের

২০. বেলা প্রায় ১টার সময় ঢাকা শহর জুড়ে দাঙ্গা—হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। শহরের সবখানেই হিন্দুর ঘর-বাড়ী ও দোকান লুট ও অগ্নিসংযোগ পুরোদমে চলল। যেখানেই পেল হিন্দুদেরকে ধরে ধরে হত্যা করতে লাগল। এমনকি মুসলমানদের কাছ থেকেই আমি সাক্ষ্য পেলাম যে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের চোখের সামনেই অবাধে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতেই সোনার দোকানগুলি লুট হল। লুটতরাজ বন্ধকরার চেষ্টা না করে তারা শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল তা নয়, দুষ্কৃতিকারীদের বুদ্ধি জুগিয়ে, কৌশল শিখিয়ে, লুটতরাজের অভিযান পরিচালনা করল। আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে; ঐদিন অর্থাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০—এর বিকেল পাঁচটার সময় আমি ঢাকায় পৌঁছালাম। আপন মহলের লোকজনের নিকট সান্নিধ্য থেকে নানা দুঃখজনক ঘটনা স্বচক্ষে দেখলাম, স্বকর্ণে শুনলাম। বড়ই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। নিজের চোখে দেখা, অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা অত্যাচারের সেসব, বীভৎস কাহিনী বড়ই হৃদয়বিদারক।

দাঙ্গার পশ্চাদপট

২১. ঢাকার দাঙ্গার কারণ মুখ্যত পাঁচটি

(১) নাচোল ও কালশিরা কান্ডের উপর আনা মুলতুবি প্রস্তাব দুটি নাকচ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে হিন্দুদের প্রতিনিধিগণ বিধানসভার কক্ষ ত্যাগ করে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে তার সমুচিত শাস্তি হিন্দুদেরকে দেওয়া।

(২) লীগ সংসদীয় দলের ভেতর সুরাবর্দ্দী ও নাজিমুদ্দীন গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনায়মান তীব্র মতবিরোধ ও বিবাদ।

(৩) হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার পুনর্মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য কোন আন্দোলনের প্রতি মুসলিম লীগের ভীতি ও স্নায়ুদৌর্বল্য। এরকম যে কোন আন্দোলনের সম্ভাবনাকে তারা রুখে দিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সঙ্ঘটিত করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিতরূপে তার প্রতিক্রিয়া হবে এবং কিছু মুসলমান নিহত হবে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে এধরনের দাঙ্গা ঘটলে পরে দুই বঙ্গের মিলন ঘটানোর জন্য আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস।

(৪) পূর্ববঙ্গে বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষের মনোভাব বেড়েই উঠছিল। কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করেই এই বিরূপ মনোভাবে নিরসন সম্ভব ছিল। তদুপরি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল ভাষা নিয়ে বিরোধের প্রশ্নটাও।

(৫) মুদ্রার অবমূল্যায়ন না করা ও ভারত–পাক বাণিজ্যে অচলাবস্থা পূর্ববঙ্গের অর্থনীতির উপর তীব্র আঘাতে হানছিল এবং যে অনিবার্য অর্থনৈতিক ভগ্নদশার দিকে তাকে ঠেলে দিচ্ছিল, সেই শোচনীয় দৃশ্য থেকে প্রথমত শহরের, পরে গ্রামাঞ্চলের মুসলমান জনতার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমলারা এবং মুসলিম লীগ কর্তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটা জেহাদের জিগির তুলে দিলেন।

বিচিত্র তথ্য—প্রায় ১০,০০০মৃত

২২. ঢাকায় নয়দিন অবস্থানকালে আমি ঢাকা ও তার সন্নিহিত এলাকার প্রায় সব দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করি। ঢাকা–নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা–চট্টগ্রাম রেলপথে শতশত নিরপরাধ হিন্দুর হত্যালীলার সংবাদ আমাকে যৎপরোনোস্তি ব্যথিত করল। ঢাকা দাঙ্গার ২য় দিনে আমি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। জেলা সহরগুলিতে, মফস্বলে এবং গ্রামাঅঞ্চলে যাতে দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে না পড়তে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে তৎক্ষাণাৎ জরুরী নির্দেশ পাঠাতে অনুরোধ জানালাম তাঁকে। ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ আমি বরিশাল পৌঁছালাম এবং সেখানকার দাঙ্গার ঘটনাবলী জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেই জেলা সহরে প্রচুর হিন্দু বাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। এই জেলার প্রায় প্রত্যেকটি দাঙ্গা–বিধ্বস্ত এলাকা আমি পরিদর্শন করি। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না কি করে জেলা শহর থেকে মাত্র ৬মাইল পরিধির মধ্যে মোটর রাস্তা দ্বারা যুক্ত কাশীপুর, মাধবপাশা এবং লাকুটিয়ার মত স্থানেও মুসলিম দাঙ্গাবাজরা বীভৎস তান্ডব সৃষ্টি করতে পারে! মাধবপাশার জমিদার বাড়ীতে প্রায় ২০০ জনকে হত্যা ও ৪০ জনকে আহত করা হয়। মূলাদি নামক একটি স্থানে নরকের বিভীষিকা নামিয়ে আনা হয়। স্থানীয় মুসলমান এবং অফিসারদের বক্তব্য অনুযায়ী একমাত্র বন্দরেই ৩০০ জনের বেশী লোককে হত্যা করা হয়। মূলাদি গ্রাম পরিদর্শনকালে আমি স্থানে স্থানে মৃত বক্তিদের পড়ে থাকতে দেখেছি। দেখলাম নদীর ধারে ধারে কুকুর–শকুনেরা মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমি জানতে পারলাম, সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে পাইকারীভবে হত্যা করার পর সব [illegible]তী নারীকে দুষ্কৃতকারীগণের সর্দারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। রাজপুর থানার [illegible] কৈবর্তখালি গ্রামে ৬৩ জনকে হত্যা করা হয়। ঐ থানা অফিসের অনতিদূরে অবস্থিত হিন্দুর বাড়ীগুলি লুট করে জ্বালিয়ে দিয়ে গৃহবাসীগণকে হত্যা করা হয়। বাবুগঞ্জ বাজারের সমস্ত হিন্দুর দোকান প্রথমে লুট করে পরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণ যা হাতে এসেছে, তা থেকে খুব কম করে ধরলেও একমাত্র বরিশাল জেলাতেই হত্যা করা হয়েছে ২৫০০জনকে। ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার বলির সংখ্যা মোট ১০,০০০হাজারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। এক সত্যিকারের গভীর দুঃখে আমি কাতর হয়ে

পড়লাম। প্রিয় পরিজন—স্বজন হারানো নারী—পুরুষ ও শিশুদের সব—হারানোর কান্না—বেদনা—বিলাপে আমার ভগ্ন হৃদয় হাহাকার করে উঠল। আমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম,"পাকিস্তানে ইসলামের নামে এসব কি চলছে!"

দিল্লী-চুক্তি কার্যকর করার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না

২৩. মার্চের শেষভাগে হিন্দুরা ব্যাপক হারে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। অবস্থা দৃষ্টে মনে হলো অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত হিন্দু পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেবে। ভারতে হিন্দুদের মধ্যে একটা রণংদেহী মনোভাব সৃষ্টি হল। পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। একটা জাতীয় দূর্যোগ যেন অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য এই সম্ভাব্য দুর্বিপাক এড়ান গেল। আটই এপ্রিল দিল্লী চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ভগ্নহৃদয় হিন্দুদের মনে সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য আমি সারা পূর্ববঙ্গে ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি ঢাকা,বরিশাল,ফরিদপুর খুলনা ও যশোর জেলায় বহু জায়গায় ভ্রমণ করলাম। ডজন ডজন জনসভায় বিশাল জনতার কাছে আবেদন রাখলাম তাঁরা যেন সাহস অবলম্বন করেন এবং পিতৃ-পিতামহের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশত্যাগী না হন। আমার আশা ছিল পূর্ববঙ্গ সরকার এবং মুসলিম লীগ নেতারা দিল্লী চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর করবেন। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই আমি বুঝতে পারছিলাম, কি পূর্ববঙ্গ সরকার,কি মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ,কারুরই দিল্লী চুক্তির শর্তাবলী রূপায়নের জন্য কোন সদিচ্ছা নেই। চুক্তি রূপায়নের উদ্দেশ্যে তথায় বর্নিত একটি প্রশাসনিক পরিকাঠামো গঠন করার প্রতি পূর্ববঙ্গ সরকার শুধুমাত্র অতি ধীর গতিতে চলছিলেন তা নয়, কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণেও ইচ্ছুক ছিলেন না। দিল্লী চুক্তির অব্যবহিত পরে যে বহু সংখ্যক হিন্দু পূর্ববঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন,তাঁদের কে তাঁদের বাড়ি-ঘর জমি-জমা ইত্যাদির, যেসব ইতিমধ্যে মুসলমানরা জবরদখল করে নিয়েছে তার দখল নিতে দেওয়া হল না।

মৌলানা আক্রাম খানের উস্কানি

মাসিক পত্রিকা মোহাম্মদীতে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খানের লেখা সম্পাদকীয় পাঠ করে মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের অভিসন্ধি সম্পর্কে আমার সন্দেহ বদ্ধমুল হল। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী ডাঃ এ.এম.মালিক ঢাকা বেতার থেকে তাঁর প্রথম ভাষণে বললেন,"স্বয়ং পয়গম্বর মোহাম্মদও আরবের ইহুদি-দিগকে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছিলেন।" এই ভাষণের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মৌলানা আক্রাম খাঁ লিখলেন,ডাঃ মালিক তার ভাষণে আরবের ইহুদিদের কথা উল্লেখ না করলেই ভালো করতেন। একথা ঠিক যে পয়গম্বর মহম্মদ আরবের ইহুদিগণকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সে তো ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগে। শেষ অধ্যায়ে তাঁর অমোঘ নির্দেশ হলো,আরবের বুক থেকে সব ইহুদিদেরকে তাড়িয়ে দাও।" মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির এহেন সম্পাদকীয় মন্তব্য সত্ত্বেও আমি কিছু আশা তখনও পোষণ করতাম যে নুরুল আমিন মন্ত্রীসভা হয়তো অতটা

সহানুভূতিহীন হবে না। কিন্তু নুরুল আমিন যখন ডি.এন.বারুড়িকে সংখালঘুদের প্রতিনিধিরূপে চয়ন করে মন্ত্রী সভায় নিলেন,তখন আমার সেই ক্ষীণ প্রত্যাশাও ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। দিল্লী চুক্তির্র শর্তে পরিস্কার উল্লেখ ছিল যে, সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁদের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজন করে মন্ত্রী পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করতে হবে।

নুরুল আমিন সরকারের মতলব

২৫. এক প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে আমি এই মত ব্যক্ত করলাম যে, সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি হিসাবে ডি.এন. বারুড়ির নিয়োগ সংখ্যালঘুদের মনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে তো আনেই নি,উপরন্ত নুরুল আমিন সরকারের সদিচ্ছা বিষয়ে সবরকম স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার নিজের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া হল যে, নুরুল আমিন সরকার শুধু কেবল সহানুভূতিহীন নয়, দিল্লী–চুক্তির মূল লক্ষ্যগুলি যাতে অর্জিত না হয় সে বিষয়ও যথেষ্ট যত্নবান। আমি আবারও বলছি যে ডি.এন.বারুড়ি নিজেকে ছাড়া আর কারুরই প্রতিনিধিত্ব করেন না। কংগ্রস টিকিটে, কংগ্রেসের খরচে এবং কংগ্রেস সংগঠনের জোরেই ডি.এন.বারুড়ি পূর্ববঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তিনি সিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশানের প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। নির্বাচিত হবার কিছুদিন পরে তিনি কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেডারেশনে যোগদান করেন। যখন তাঁকে মন্ত্রীরূপে নিয়োগ করা হচ্ছিল, তখন তাঁর ফেডারেশনের সদস্যপদও খারিজ হয়ে গেছে। আমি জানি, কি গুণমান, কি কুশলতা, কি চরিত্রবল এবং কি মানসিক উৎকর্ষতা, কোন কিছুর বিচারেই বারুড়ী যে দিল্লী চুক্তির শর্তমাফিক মন্ত্রীর পদ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না, সে বিযয় পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা আমার সঙ্গে একমত।

২৬. এই মন্ত্রিপদের জন্য আমি নুরুল আমিনের কাছে তিনজনের নাম প্রস্তাব করেছিলাম। তন্মধ্যে একজন এম. এ. এল. এল. বি.ঢাকা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠিত এডভোকেট। তিনি প্রথম ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় চার বছর ধরে মন্ত্রীত্ব করেছেন। ছয় বৎসর যাবৎ কোলকাতায় কোল মাইনস্ ষ্টোইং বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি সিডিউলড কাস্ট ফেডারেশানের একজন বরিষ্ঠ সহ-সভাপতিও ছিলেন। আমার সুপারিশ করা দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন বি.এ.এল.এলবি। তিনি সংস্কারপূর্ব আমলে সাত বছর ধরে বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। আমি জানতে চাই, কি এমন মহা যুক্তি ছিল যার বলে এই দুজন ভদ্রলোকের মধ্য থেকে কাউকেই চয়ন না করে নুরুল আমিন এমন একজনকে নিয়োগ করলেন, খুব সঙ্গত কারণেই যার নিযুক্তির খুব কড়া আপত্তি আমি করেছি। দিল্লী–চুক্তির শর্তের নাম করে ডি.এন.বারুড়ির নিয়োগ এটাই প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, দিল্লী-চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের জন্য জান মালের নিরাপত্তা, মান–মর্যাদা প্রাপ্তি ও স্বধর্ম পালনের স্বাধীনতা সহ শান্তিতে বসবাস করার উপযোগী পরিবেশ ও পরিস্থিতি রচনা করা, সেই লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে তারা না তৎপর, না আগ্রহী।

চাপ সৃষ্টি করে হিন্দু বিতাড়নের সরকারী পরিকল্পনা

২৭. এই বিষয়ে আমি জোর গলায় বলতে চাই যে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস পূর্ববঙ্গ সরকার সুপরিকল্পিত সরকারী নীতি অনুসারে এখনো পর্যন্ত এই প্রদেশ থেকে হিন্দুদের নিংড়ে বের করে দেওয়ার কাজ করে চলেছে। আপনার সাথে আলাপ–আলোচনার সময় আমি একাধিকবার এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার কাছে আমার বক্তব্য রেখেছি। বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে, পাকিস্থান থেকে হিন্দু বিতাড়নের এই নীতি পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানেও এই কাজ সমাপ্তির পথে। ডি.এন.বারুড়িকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ এবং এই উদ্দেশ্যে মৎকৃত সুপারিশের প্রতি পূর্ববঙ্গ সরকারের তাচ্ছিল্যপূর্ণ অবজ্ঞা ও আপত্তি প্রদর্শন, যাকে ওরা ইসলামী রাষ্ট্র বলে ঠিক তারই মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত কাজ বটে। পাকিস্তান সমস্ত হিন্দুকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি এবং পরিপূর্ণ সুরক্ষা দান করেনি। তারা হিন্দু বুদ্ধিজীবিগণকে দেশছাড়া করতে চায়, যাতে পাকিস্থানের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন তাদের দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হয়।

যৌথ নির্বাচন এড়িয়ে যাবার অপকৌশল

২৮. আমি বুঝতে পারছি না, কেন এখনো পর্যন্ত নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল না। সংখ্যালঘু উপসমিতি নিযুক্ত হয়েছে আজ তিন বৎসর হয়ে গেল। তিনবার তার বৈঠকও হয়েছে। নির্বাচন যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা, না পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মতদানের ভিত্তিতে হবে, এই বিষয়ে বিচার–বিবেচনার জন্য গত ডিসেম্বর মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পাকিস্তানের সব স্বীকৃত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিরা যৌধ নির্বাচকমন্ডলীর পক্ষে রায় দেন এবং পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের পক্ষেও মত প্রকাশ করেন। তপশীলী জাতিদের পক্ষ থেকে আমরা সংরক্ষণের যৌথ নির্বাচকমন্ডলীর পক্ষে দাবী পেশ করি। গত আগষ্ট মাসে এই বিষয়টি নিয়ে আবার বিচার-বিবেচনা করারজন্য বসা হয়। কিন্তু কোনরূপ আলাপ–আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বেই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী হয়ে যায়। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার পিছনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির মনে কোন্ মনোভাব কাজ করছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

২৯. দিল্লী- চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের জন্য বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যা সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্যই আমার বলা উচিত যে, তাদের বর্তমান কেবল অসন্তোষজনক নয়, পুরোপুরি হতাশাব্যঞ্জক এবং ভবিষ্যৎ গভীর তমসাচ্ছন্ন ও নৈরাশ্যময়। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের মনে মোটেই আস্থা ফিরিয়ে আনা হয় নি। পূর্ববঙ্গ সরকার এবং মুসলিম লীগ উভয়েই এই চুক্তিকে একটা ছেঁড়া কাগজের চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয় না। দেশত্যাগী কৃষিজীবি হিন্দুরা, যাঁরা বেশীরভাগই তপশীলী জাতিভুক্ত, তাঁরা প্রচুর সংখ্যায় পূর্ববঙ্গে ফিরে আসছেন। এই ফিরে আসা এমন কোন লক্ষণ নয় যা থেকে বোঝা যাবে যে তাদের মনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বা ভারত যুক্তরাজ্যের অন্যত্র তাদের অবস্থান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়নি। এই করুণ সত্যের মধ্যেই

নিহিত আছে তাদের ঘরে ফেরার করাণ। উদ্বাস্তু জীবনের দুঃখ- দুর্দশা ও পীড়ন সহ্য করতে না পেরে তারা বাধ্য হচ্ছে ঘরে ফিরে আসছে। এছাড়া এমনও অনেকে আছেন যাঁরা ফিরে আসছেন স্থাবর সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে আবার চলে যাওয়ার জন্য। সাম্প্রতিক কালে পূর্ববঙ্গে কোন বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক উৎপাত যে ঘটেনি তাও দিল্লী-চুক্তির দৌলতে নয়। যদি এ ধরনের কোন চুক্তি বা সমঝোতা নাও হ'ত, তবু একসময় দাঙ্গা থেমে যেত; কেননা, দীর্ঘদিন ধরে এসব কান্ডকারখানা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

একথা কিছুতেই মানা যায় না যে, একটা চুক্তি করতে হবে, কেবল এই জন্যেই দিল্লী-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান অনেক ঝগড়া ও বিবাদের সুমীমাংসার পথে কার্যকরী সাহায্য যোগাতে সক্ষম হবে এমন পরিবেশ রচনার দিকে নজর রেখেই এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এই যে ছয়মাস সময় অতিবাহিত হল, এই কালের মধ্যে কোন একটি বিবাদ বা বিরোধের সরাসরি মীমাংসা হল না। এর বিপরীতে দেশে-বিদেশে পাকিস্তান পুরোদমে ভারত–বিরোধী অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম লীগ কর্তৃক সারা পাকিস্থান জুড়ে কাশ্মীর দিবস পালন সাম্প্রদায়িক ও ভারত–বিরোধী প্রচারণার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্প্রতি পাক–পাঞ্জাবের রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেছেন, ভারতস্থ মুসলমানদের নিরাপত্তাবিধানের জন্য পাকিস্থানের হাতে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী থাকা অতি প্রয়োজন। ভারতের প্রতি পাকিস্থানের প্রকৃত মনোভাব এই উক্তিতেই প্রতিফলিত। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে বৈরীতাই শুধু বাড়বে।

আজকাল কি ঘটে চলেছে পূর্ববঙ্গে?

৩০. আজকাল পূর্ববঙ্গে পরিস্থিতি কিরূপ? দেশ ভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৫০লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেছে। গত ফেব্রুয়ারীর পূর্ববঙ্গ–দাঙ্গা ছাড়াও যে সব কারণে এতসব লোক দেশত্যাগী হল তার আরো নানা কারণ আছে। মুসলমানরা হিন্দু আইনজীবি, হিন্দু চিকিৎসক, হিন্দু দোকানদার, হিন্দু ব্যাপারী ও হিন্দু ব্যবসায়ীদের বয়কট করল। ফলে বাধ্য বয়ে রুজি–রুটির সন্ধানে, জীবিকার অন্বেষণে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে পাড়ি জমাল। অনেক ক্ষেত্রেই আইনসংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ না করে ব্যাপক হারে হিন্দুর বাড়ী-ঘর অধিগ্রহণ করা হল মালিককের কোন ভাড়া বা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে। ফলতঃ এইসব লোক বাধ্য হল ভারতে আশ্রয় নিতে। হিন্দু জমিদারকে খাজনা প্রদান বহুপূর্ব থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, যাদের বিরুদ্ধে আমি সর্বত্রই অভিযোগ শুনতে পেয়েছি, সেই আনসাররা হিন্দুদের নিরাপত্তার পক্ষে এক স্থায়ী বিভীষিকারূপে বিরাজ করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, শিক্ষার ইসলামীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা অধিকর্তার গৃহীত নানা পদক্ষেপ ও ব্যবস্থায় সন্ত্রস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা তাদের চিরপরিচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলির বন্ধন থেকে বিচ্যুত হলেন। তাঁরা সবাই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছেন। ফলে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে গেছে। আমার কাছে খবর আছে যে কিছুকালপূর্বে শিক্ষা অধিকর্তা এক সার্কুলার জারী করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রতিদিন বিদ্যালয়ের

পঠন পাঠন শুরু করে হওয়ার পূর্বে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক—শিক্ষিকাগণকে কোরাণ পাঠের অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্য এক সার্কুলারে প্রধান শিক্ষকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন স্কুলের প্রতিটি অংশ বারজন বিশিষ্ট মুসলিম নেতা, যথা—জিন্নাহ্, ইকবাল, লিয়াকত আলী, নাজিমুদ্দিন প্রভৃতির নামে নামাঙ্কিত করা হয়। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক শিক্ষাসম্মেলনে প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, পূর্ববঙ্গে মোট ১৫০০টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৫০০টি কার্যরত। আরগুলো সব বন্ধ হয়ে আছে। চিকিৎসকরা দেশত্যাগী হওয়ার ফলে অসুখ—বিসুখে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা বিশেষ কিছু করা যায় না বললেই চলে। হিন্দু যজমানের বাড়ীতে গৃহদেবতার পূজো-অর্চনায় রত প্রায় সব পুরোহিত দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। বিশেষ বিশেষ দেবস্থান প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, বর্তমানে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পক্ষে পুরোহিত নিয়োগ করে ধর্মকর্ম বজায় রাখা এবং বিবাহাদির মত সামাজিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দেবদেবীর প্রতিমা তৈরী করত যেসব শিল্পীরা, তারাও চলে গেছে। সার্কেল অফিসার ও পুলিশের যোগসাজস এবং সক্রিয় সহযোগিতায় জোর-জবরদস্তি করে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিতে যেখানে যেখানে হিন্দু প্রেসিডেন্ট আছে, সেখানে সেখানে তাদেরকে পদচ্যুত করে মুসলমান প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। যে কয়জন হিন্দু সরকারী চাকুরিয়া আছেন তাঁদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে। কেননা, তাদের অনেককেই হয় যথেষ্ট কারণ না দর্শিয়ে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে, নয়তো তাঁদেরকে ডিঙিয়ে অধস্তন মুসলমান কর্মীদের পদোন্নতি করা হয়েছে। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, যাঁর বিরুদ্ধে অন্ধ মুসলিম বিদ্বেষ, ঘৃণা ও কুসংস্কারের কোন অভিযোগই খাটে না, সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়ে খোলাখুলি জানিয়েছেন যে চট্টগ্রামে এক হিন্দু পাব্‌লিক প্রোসিকিউটারকে একতরফাভাবে স্বৈরাচারী কায়দায় কর্মচ্যুত করা হয়েছে।

৩১. হিন্দু হত্যা এবং হিন্দুর বাড়ীতে চুরি-ডাকাতি পূর্বের মতই মহোল্লাসে ঘটে চলেছে। হিন্দুদের আনা অভিযোগের অর্ধেকও থানার দারোগারা লিপিবদ্ধ করে না। হিন্দু ঘরের মেয়ে অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনা যে কমে এসেছে তার প্রকৃত কারণ হল, পূর্ববঙ্গে বর্ণহিন্দু পরিবারে ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সী যুবতী মেয়ে বর্তমানে আর কেউ নেই। গ্রামাঞ্চলে দলিত শ্রেণীর মানুষদের ঘরে কিছু মেয়ে এখনো আছে, মুসলমান গুণ্ডারা এমনকি তাদেরকেও অব্যাহতি দেয় না। মুসলমানগণ কর্তৃক তপশীলি জাতির কন্যাদের উপর ধর্ষণের ঘটনার অনেক সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁচেছে। হাটে—বাজারে হিন্দুরা পাট বা অন্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রী করতে নিয়ে গেলে মুসলমান ক্রেতারা মালের পুরো দাম প্রায় কখনোই দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্থানে হিন্দুদের জন্য আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা মোটেই নেই।

পশ্চিম পাকিস্তানে জবরদস্তি ধর্মান্তরণ

৩২. পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলীর কথা স্থগিত রেখে এখন আমি পশ্চিম পাকিস্তানের, বিশেষ করে সিন্ধু প্রদেশের অবস্থার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। দেশ ভাগের পরে

পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রায় একলক্ষ তপশীলী জাতির লোক ছিল। আপনার অবহতির জন্যে জানাচ্ছি যে, তাদের মধ্যে থেকে বিরাট এক অংশকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। কর্তৃকপক্ষের কাছে বার বার আবেদন-নিবেদন জানানো সত্ত্বেও অপহৃতা ১২জন তপশীলী জাতির কন্যার মধ্য থেকে মাত্র ৪জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অপহরণকারীদের নাম সহ এইসব ভাগ্যহীনাদের নাম ঠিকানা সরকারের কাছে জানানো হয়েছে। অপহৃতা কন্যাদের উদ্ধারের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তি সম্প্রতি তাঁর সর্বশেষ পত্রে জানিয়েছেন যে তাঁর কাজের এক্তিয়ার অপহৃতা হিন্দু মেয়েদের উদ্ধার করা, "অচ্ছ্যুৎরা তপশীলী জাতি নয় কারণ তারা হিন্দু নয়।" সিন্ধু প্রদেশে এবং পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে যে অল্প সংখ্যক হিন্দু এখনো বাস করছেন তাঁদের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। সিন্ধু ও করাচীতে এখনো মুসলিমদের জবরদখলে আছে এরকম ৩৬৩ টি হিন্দু মন্দির ও গুরুদ্বারের তালিকা (যা কোনমতেই সর্বতো সম্পূর্ণ নয়) আমার কাছে এসে পৌঁচেছে। কিছু কিছু মন্দিরকে কসাইখানা, মুচির দোকান ও হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এসব মন্দিরের কোনটিই হিন্দুরা ফেরৎ পায় নি। কোন রকম নোটিশ ছাড়াই হিন্দুদের ভূসম্পত্তির মালিকানা কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং সে সব জমিজমা স্থানীয়মুসলমান ও উদ্বাস্তু মুসলমানদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ২ থেকে ৩শ এমন লোকের কথা জানি, সম্পত্তি গচ্ছিত রক্ষণ অধিকর্তা (Custodian) যাঁদেরকে অনেক আগেই বাস্তত্যাগী নয় বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁদের কাউকেই সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। এমনকি কিছুকাল পূর্বে অবাস্তুত্যাগী বলে ঘোষিত করাচি পিঁজরাপোলের দখল ঐ সংস্থার অছিদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। করাচীতে থাকাকালীন প্রধানত তপশীলী জাতিভুক্ত অনেক অপহৃতা হিন্দু রমণীর হতভাগ্য পিতা ও স্বামীদের আবেদনপত্র আমি পেয়েছিলাম। এসব ঘটনার প্রতি আমি সিন্ধুর প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু কোন প্রতিকারই তারা করেনি বা অতি সামান্যই করেছে। অত্যন্ত দুখঃজনক এক সংবাদ অবগত হলাম, সিন্ধু প্রদেশে বসবাসকারী তপশীলী জাতির মানুষদের একটা বিরাট অংশকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে।

হিন্দুদের জন্য পাকিস্তান এক অভিশপ্ত ভূমি

৩৩. হিন্দুদের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি যখন সংক্ষেপে এরূপ দাঁড়িয়েছে; তখন যদি বলি পাকিস্তানে হিন্দুদেরকে সবদিক থেকেই বিড়ম্বিত করে নিজ দেশের মধ্যেই রাষ্ট্রহীন নাগরিকে পর্যবসিত করা হয়েছে, তাহলে কিছু অন্যায় বলা হবে না। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, এই তাদের বড় অপরাধ। মুসলিম নেতারা বারংবার বিবৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন যে পাকিস্তান মুসলিম রাষ্টরূপে জন্মগ্রহন করেছে এবং মুসলিম রাষ্ট্ররূপেই সে বেড়ে উঠবে। ইসলামরূপী সর্বোষধিকে জগতের যাবতীয় মন্দ নিরসনের একমাত্র নিদান হিসাবে নিবেদন করা হচ্ছে। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের দ্বন্দ্বের যুগে আপনারা ইসলামী গণতন্ত্র, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উদগ্র মিশ্রণ পেশ করছেন। শরীয়ৎ নির্দেশিত সেই জবরদস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা শুধু মুসলমানদেরই হাতে থাকবে। হিন্দু ও অন্যান্য সংখালঘুরা

সেখানে হবে জিম্মি। নিরাপত্তা ও বাঁচার অধিকার রাষ্ট্রের কাছ থেকে মূল্যের বিনিময়ে কিনে নিতে তারা বাধ্য থাকবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়, অন্য যে কোন লোকের চেয়ে আপনিই ভাল জানেন কি সেই মূল্য। অনেক আগ্রহ, অনেক প্রত্যাশা বুকে নিয়ে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করলাম। কিন্তু অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হল যে, পাকিস্থান হিন্দুর বসবাসের স্থান নয় এবং সেখানে তাদের ভবিষ্যৎ ধর্মান্তরণ ও অবলুপ্তির করাল ছায়াপাতে তমসাচ্ছন্ন। রাজনৈতিক বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন তপশীলী হিন্দুরা এবং ভাগ্যবান বর্ণহিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছেন। যেসব হিন্দু এই অভিশপ্ত প্রদেশ তথা পাকিস্তানে থেকে যাবেন, ভাবতে কষ্ট হয়, তাঁরা সবাই ক্রমে ক্রমে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে যাঁতাকলে পড়ে হয় ধর্মান্তরিত হয়ে যাবেন, নয় তো কোত্‌ল হবেন। ভাবলে অবাক লাগে, কি করে আপনার মত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি এমন এক নীতির প্রবক্তা হতে পারলেন যা মানবতার পক্ষে ঘোর বিপদ স্বরূপ এবং সাম্য ও সুবুদ্ধির সর্বদা পরিপন্থী। আমি আপনাকে এবং সহকর্মীগণকে জানাতে চাই যে হিন্দুরা আর কোন ভয় বা প্রালোভনেই নিজ বাসভূমে জিম্মি হয়ে থাকতে রাজী হবে না। আজ হয়তো ভয় বা দুঃখে তারা অনেকেই ঘর—বাড়ীর মায়া ত্যাগ করেছে; কিন্তু আগামী দিনে জাতীয় জীবনের নানা কর্মপ্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে তারা নিজেদের হক্ আদায় করে নিতে এগিয়ে আসবে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুক্কায়িত আছে কে জানে! আমি যখন নিশ্চিৎ হয়েছি যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করা সত্ত্বেও সেখানকার হিন্দুদের কোন কাজেই লাগতে পারব না, তাদের জন্য কোন সুযোগ-সুবিধাই আদায় করতে পারবনা, তখন সব জেনে শুনে পাকিস্তানের হিন্দুদের এবং বিদেশের মানুষের মনে, পাকিস্তানে হিন্দুরা পূর্ণ মান-মর্যাদা-নিরাপত্তা এবং সম্পত্তি ও স্ব-ধর্মাচরণের অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে, এরকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করার মত ভন্ডামি আমার না করাই উচিত বলে মনে করছি। এইতো গেল শুধু হিন্দুদের অবস্থার কথা।

মুসলমানদের জন্যও কোন নাগরিক স্বাধীনতা নেই

৩৪. লীগ নেতারা ও তাঁদের ভ্রষ্টাচারী অপদার্থ আমলাদের দ্বারা রচিত মধুচক্রের পরিধির বাইরে যে সব মুসলমানরা রয়েছেন তাঁদের হাল কি? পাকিস্তানে নাগরিক স্বাধীনতা বলতে কোন কিছু আর অবশিষ্ট নেই। খান আব্দুল গফ্ফর খান, যাঁর মত নিষ্ঠাবান মুসলমান বহু বছরের মধ্যে মাত্র একজনই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যাঁর বীর দেশপ্রেমী ভ্রাতা হ'লেন ডাঃ খান সাহেব, দৃষ্টান্তস্বরূপ এঁদের দুরবস্থার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। পাকিস্থানের উত্তর পশ্চিম এবং পূর্ব অঞ্চলে বহু সংখ্যক প্রাক্তন লীগ নেতা বিনাবিচারে বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়েছেন। মিঃ সুরাবর্দ্দীর মত ব্যক্তি, প্রধানত যাঁর প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ বাংলায় জিতল এবং যে বিজয় গৌরবের সিংহভাগই তাঁর প্রাপ্য, তেমন একজন মানুষও আজ কার্যত পাকিস্তান সরকারের হাতে নজরবন্দী। সরকারী আদেশ মতই তাঁকে চলতে হয়, সরকারী নির্দেশ মতই কথা বলতে হয়। তথাকথিত ইসলামী পরিকল্পনা এতই নির্মম আর অমোঘ, যে, অধুনা প্রসিদ্ধ লাহোর প্রস্তাবের রূপকার, সকলের অতি প্রিয় বাংলার সেই বিখ্যাত প্রবীন মানুষটি, যাঁর নাম মিঃ ফজলুল হক্, তাঁকেও আজ ঢাকার উচ্চ ন্যায়ালয়ের আনাচে কানাচে

একা একা দিনগত পাপক্ষয় করতে হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কথা সাধারণত যত কম বলা যায় ততই ভাল। লাহোর প্রস্তাবে তাঁদেরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পরিবর্তে তাঁরা কি পেলেন? পূর্ববঙ্গকে পরিণত করা হল পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপনিবেশে; যদিও এর জনসংখ্যা পাকিস্তানের সব অঙ্গরাজ্যের মিলিত জনসংখ্যার চেয়ে অধিক। করাচীর ফরমায়েস আর হুকুম তামিলকারী রক্তহীন এক বাড়তি অংশ ছাড়া ইহা আর কিছু নয়। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাতে হাতে অন্ন পেতে চেয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে শরিয়ৎ আর ইসলামী রাষ্টের ভোজবাজী তাদের হাতে পৌঁছে দিল পাঞ্জাব আর সিন্দুর উষর মরু প্রান্তরের প্রস্তরখন্ড।

আমার নিজের দুঃখময় তিক্ত অভিজ্ঞতা

পাকিস্তানের সার্বিক চালচিত্র এবং অন্যদের প্রতি কৃত মোটা দাগের রূঢ় নিষ্ঠুর অবিচারের কথা বাদ দিলে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কম দুঃখজনক নয়। সংসদীয় দলের নেতার এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার জোর খাটিয়ে আপনি আমাকে আদেশ করেছিলেন একটি বিবৃতি দিতে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর আমি সেই বিবৃতি প্রদান করেছি। আপনি জানেন, অসত্য এবং তার চেয়েও ঘৃণ্য অর্ধসত্যের উপর ভিত্তি করে কোন বিবৃতি দান করতে আমি সম্মত ছিলাম না। তথাপি আপনার নেতৃত্বে আপনার অধীনে মন্ত্রীপদে কর্মরত অবস্থায় আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু, সুস্থ বিবেকের মাথায় মিথ্যা ভন্ডামি আর অসত্যের গুরুভার বোঝা চাপিয়ে নিয়ে আমি আর চলতে পারছি না। তাই আপনার অধীনে মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং এতদ্বারা আপনার হাতে আমার পদত্যাগ পত্র অর্পণ করছি। আশাকরি এই পত্র আপনি গ্রহণ করবেন এবং অবিলম্বে কার্যকর করবেন। অবশ্য এই মন্ত্রীপদ বিতরণের কাজ আপনি স্বাধীনভাবেও করতে পারেন, অথবা এমনভাবে সম্পন্ন করতে পারেন যাতে তা আপনার ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ ও কার্যকর হয়।

ইতি

৮ই অক্টোবর, ১৯৫০ বিনীত

স্বাঃ জে. এন. মণ্ডল

(খ)

নেহরু-লিয়াকত চুক্তি ঃ ভারতীয় পার্লামেন্টে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বক্তৃতা ঃ

পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবিতে ও নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিবাদে ১৯৫০ এর ১৪ এপ্রিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পার্লামেন্টে যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন, তা হল এইঃ—

I have never felt happy about our attitude towards Pakistan. It has been weak, halting and inconsistent. Our goodness or inaction has been interpreted as weakness by Pakistan. It has made Pakistan more and more

intrasnsigent and has made us suffer all the greater and even lowered us in the estimation of our own people. On every important occasion we have remained on the defensive and failed to expose or counteract the designs of Pakistan aimed at us. I am not, however dealing today with general India-Pakistan relationship, for the circumstances that have led to my resignation are primarily concerned with the treatment of Bengal problem, is not a provincial one. It raises issues of an all-India character and on its proper solution will depend the peace and prosperity, both economic and political, of the entire nation. There is an important differece in the approach to the problem of minorities in India and Pakistan. The vast majority of Muslims in India wanted the partition of the country on a communal basis, although I gladly recognise there has been a small section of patriotic Muslims who consistently have identified themselves with national interests and suffered for it. The Hindus on the other hand were almost to a man definitely opposed to partition. When the partition of India became inevitable, I played a very large part in creating public opinion in favour of the partition of Bengal, for I felt that if that was not done, the whole of Bengal and also perhaps Assam would fall into Pakistan. At that time little knowing that I would join the first Central Cabinet, I along with others, gave assurances to the Hindus of East Bengal, stating that if they suffered at the hands of the future Pakistan Government, if they were denied elementary rights of citizenship, if their lives and honour were jeopardised or attacked, Free India would not remain an idle spectator and their just cause would be boldly taken up by the Government and people of India. During the last 21/2 years their sufferings have been of a sufficiently tragic character. Today I have no hesitation in acknowledging that inspite of all efforts on my part, I have not been able to redeem my pledge and on this ground alone–if none other–I have no moral right to be associated with Government any longer. Recent happenings in East Bengal have however overshadowed all their past woes and humiliation. Let us not forget that the Hindus of East Bengal are entitled to the protection of India, not on humanitarian consideration alone, but by virtue of their sufferings and sacrifices, made cheerfully for generations, but for laying the foundations of India's political freedom and intellectual progress It is the united voice of the leaders that are dead and of the youth that smilingly walked upon the gallows for India's cause that calls for justice and fairplay at the hands of Free India of today.

"The recent Agreement, to my mind, offers no solution to the basic problem. The evil is far deeper and no patchwork can lead to peace. The establishment of a homogeneous Islamic State is Pakistan's creed and a planned extermination of Hindus and Sikhs and expropriation of their properties constitute its settled policy. As a result of this policy, life for the minorities in Pakistan has become" nasty, brutish and shor" Let us not be forgetful of the lessons of history. We will do so at our own peril. I am not

taking of by-gone times, but if anyone analyses the course of events in Pakistan since its creation, it will be manifest that there is no honourable place for Hindus within that State. The problem is not communal. It is essentially political. The Agreement unfortunately tries to ignore the implications of an Islamic State. But anyone, who refers carefully to the Objectives Resolution passed by the Constituent Assembly of Pakistan and to the speech of its Prime Minister, will find that while talking in one place of protection of minority rights, the Resolution in another place emphatically, freedom, equality, tolerance and special justice as enunciated by Islam shall be fully observed." The Prime Minister of Pakistan while moving the Resolution thus spoke:

"You would also notice that the State is not to play the part of a natural observer wherein the Muslims may be merely free to profess and practice their religion, because such an attitude on the part of the State would be the very negation of the ideals which prompted the demand of Pakistan and it is there ideals which should be the corner stone of the State which we want to build. The State will create such conditions as are conductive to the building up of a truly Islamic Society which means that the State will have to play a positive part in this effort. You would remember that the Quaed-e-Azam and other leaders of the Muslim League always made unequivocal declarations that the Muslim demand for Pakistan was based upon the fact that the Muslims had their own way of life and a code of conduct. Indeed, Islam lays down specific directions for social behaviour and seeks to guide society in its attitude towards the problems which confront it day to day. Islam is not just a matter of private beliefs and conduct."

"In such a Society, let me ask in all seriousness, can any Hindu expect to live with any sense of security in respect of his cultural, religious, economic and political rights. Indeed our Prime Minister analysed the basic difference between India and Pakistan only a few weeks ago on the floor of the House and his words will bear repetition.

"The people of Pakistan are of the same stock as we are and have the same virtues and failings. But the basic difficulty of the situation is that the policy of a religious and communal State followed by the Pakistan Government inevitably produces a sense of lack of full citizenship and a continuous insecurity among those who do not belong to the majority community."

It is not the ideology preached by Pakistan that is the only disturbing factor. Its performances have been in full accord with its ideology and the minorities have had bitter experiences times without number of the true character and functioning of an Islamic State. The Agreement has totally failed to deal with this basic problem.

"Public memory is sometimes very short. There is an impression in many quarters that the Agreement recently made is the first great attempt of its kind to solve the problem of minorities. I am leaving aside for the time being the

disaster that took place in the Punjab; in spite of all assurances and undertakings there was a complete collapse of the administration and the problem was solved in a most brutal fashion. Afterwards we saw the gradual extermination of Hindus from the North Western Frontier Province and Baluchistan and latterly from Sind as well. In East Bengal about 13 millions of Hindus were squeezed out of East Bengal. There were no major incidents as such; but circumstances so shaped themselves that they got no protection from the Government of Pakistan and were forced to come away to West Bengal for shelter. During that period there was no question of any provocation given by India where normal conditions had settled down; there was no question of Muslims being coerced to go away from India to Pakistan. In April, 1948, the First Inter-Dominion Agreement was reached in Calcutta, dealing specially with the problems of Bengal. If anyone analyses and compares the provisions of that Agreement with the recent one it will appear that in all essential matters they are similar to each other. This Agreement, however, did not produce any effective result. India generally observed its terms but the exodus from East Bengal continued unabated. It was a oneway traffic, just as Pakistan wished for. There were exchanges of correspondence; there were meetings of officials and Chief Ministers; there were consultations between Dominion Ministers. But judged by actual results Pakistan's attitude continued unchanged. There was a second Inter-Dominion Conference in Delhi, in December, 1948, and another Agreement was signed, sealed and delivered. It dealt with the same problem–the rights of minorities specially in Bengal. This also was a virtual repetition of the first Agreement. In the course of 1949 we witnessed a further deterioration of conditions in East Bengal and an exodus of a far larger number of helpless people, who were uprooted from their hearth and home and were thrown into India in a most miserable condition. The fact thus remains that inspite of two Inter-Dominion Agreements as many as 16 to 20 lakhs of Hindus were sent away to India from East Bengal. About a million of uprooted Hindus had also to come away from Sind. During this period a large number of Muslims also came away from Pakistan mainly influenced by economic considerations. The economy of West Bengal received a rude shock and we continued as helpless spectators of a grim tragedy.

Today there is a general impression that there has been failure both on the part of India and Pakistan to protect their minorities. The fact however is just the reverse of it. A hostile propaganda has been also carried on in some sections of the foreign press. This is a libel on India and truth must be made known to all who desire to know it. The Indian Government – both at the Centre and in the Provinces and States – generally maintained peace and security throughout the land after Punjab and Delhi disturbances had quietened down, inspite of grave and persistent provocations from Pakistan

by reason of its failure to create conditions in Sind and East Bengal whereby minorities could live there peacefully and honourably. It should not be forgotten here that the people who came from East Bengal or Sind were not those who had decided to migrate to India out of imaginary fear at the time of partition. These were people who were bent on staying in Pakistan, if only they were given a chance to live decent and peaceful lives.

" Towards the end of 1949, fresh events of a violent character started happening in East Bengal. On account of the iron curtain in that area, news did not at first arrive in India. When about 15,000 refugees came to West Bengal in January 1950, stories of brutal atrocities and persecutions came to light. This time the attack was directed both against middle class urban people and selected sections of rural people who were strong, virile and united, to strike terror into their hearts was a part of Pakistan's policy. These startling reports led to some repercussions of a comparatively minor character in certain parts of West Bengal. Although these were checked quickly and effectively, false and highly exaggerated reports of so-called occurrences in West Bengal were circulated in many parts of East Bengal. This was clearly done with official backing and with a sinister motive. In the course of two to three weeks events of a most tragic character, which no civilized Government could ever tolerate, almost simultaneously broke out in numerous parts of East Bengal, causing not only wanton loss of lives and properties, but resulting also in forcible conversion of a large number of helpless people, adduction of women and shocking outrages on them. Reports which have now reached our hands clearly indicate that all these could not have happened as stray sporadic incidents. They formed part of a deliberate and cold planning to exterminate minorities from East Bengal, to ignore this is to forget hard realities. During that period our publicity both here and abroad became hopelessly weak and ineffective. This was partly done in order to prevent repercussions within India. Pakistan however followed exactly the opposite course of action. The result was that we were dubbed as aggressors while the truth was the reverse of it. During these critical weeks – although there were people who were swayed by passions and prejudices – vast sections of India's population were prepared to leave matters in the hands of Government and expected it to take stubborn measures to check the brutalities perpetrated in Pakistan. At that hour of crisis we failed to rise equal to the occasion. Where days – if not hourse – counted, we allowed weeks to go by and we could not decide what was the right course of action. The whole nation was in agony and expected promptness and firmness, but we followed a policy of drift and indecision. The result was that in some areas of West Bengal and other parts of India, people became restive and exasperated and took the law into their own hands. Let me say without hesitation that private retaliation on innocent people in India for brutalities

committed in Pakistan offers us no remedy whatsoever. It creates a vicious circle which may be worse than the disease; it brutalizes the race and lets loose forces which may become difficult to control at a later stage. We must function as a civilsised State and all citizens who are loyal to the State must have equal rights and protection irrespective of their religion or faith. The only effective remedy in a moment of such national crisis can and must be taken by the Government of the country and if Government moves quickly, consistent with the legitimate wishes of the people and with a full sense of national honour and prestige, there is not the least doubt that the people will stand behind the government. In any case, Government acted promptly to re-establish peace and order throughout India. Meanwhile Muslims, though in much lesser number, had also started leaving India, a good number of whom belonged to East Bengal and had come to West Bengal for service or occupation. Pakistan realished the gravity of the situation only when it found that on this occasion, unlike previous ones, there was no question of one way traffic. Since January last at least 10 lakhs of people have come out of East Bengal to West Bengal. Several lakhs have gone to Tripura and Assam. Reports indicate that thousands are on their march to India today and they represent all classes and conditions of people.

The supreme question of the hour is, can the minorities continue to live with any sense of security in Pakistan? The test of any Agreement is not its reaction within India or in foreign lands, but on the minds of the unfortunate minorities living in Pakistan or those who have been forced to come away already. It is not how a few top-ranking individuals in Pakistan think or desire to act, it is the entire set-up of that State the mentality of the official circles high and low-the attitude of the people at large and the activities of organisations such as 'Ansars' which all operate together and make it impossible for Hindus to live. It may be that for some monthss no major occurrences may take place. Meanwhile we may on our generosity supply them with essential commodities which will give them added strength. That has been Pakistan's technique. Perhaps the next attack may come during the rainy season when communications are virtully cut off.

"I have found myself unable to be a party to the Agreement for the following main reasons :

First–we had two such Agreements since Partition for solving the Bengal Problem and they were violated by Pakistan without any remedy open to us. Any Agreement which has no sanction will not offer any solution.

Secondly – the crux of the problem is Pakistan's concept of an Islamic State and the ultra communal Administration based on it. The Agreement sidetracks this cardinal issue and we are today exactly where we were previous to the Agreement.

Thirdly – India and Pakistan are made to appear equally guilty while

Pakistan was clearly the aggressor. The Agreement provides that no propaganda will be permitted against the territorial integrity of the two countries and there will be no incitement to war between them. This almost sounds farcical so long as Pakistan troops occupy a portion of our territory of Kashmir and warlike preparations on its part are in active operation.

"Fourthly – events have proved that Hindus cannot live in East Bengal on the assurances of security given by Pakistan. We should accept this as a basic proposition. The present Agreement on the other hand calls upon minorities to look upon Pakistan Government for their safety and honour which is adding insult to injury and is contrary to assurances given by us previously.

Fifthly – there is no proposal to compensate those who have suffered nor will the guilty be ever punished, because no one will dare give evidence before a Pakistan Court. This is in accordance with bitter experience in the past.

Sixthly – Hindus will continue to come away in large numbers and those who have come will not be prepared to go back. On the other hand, Muslims who had gone away will now return and in our determination to implement the Agreement. Muslims will not leave India. Our economy will thus be shattered and possible conflict within our country will be greater.

Seventhly – in the garb of protecting minorities in India, the Agreement has reopened the problem of Muslim minority in India, thus seeking to revive those disruptive forces that created Pakistan itself. This principle carried to its logical conclusions, will create fresh problems for us which, strictly speaking, are against our very Constitution.

This is not the time nor the occasion for me to discuss alternative lines of action. This must obviously wait until the results of the policy now adopted by Government are known. I do not question the motives of those who have accepted the Agreement. I only hope that the Agreement must not be unilaterally observed. If the Agreement succeeds, nothing will make me happier. If it fails, it will indeed be a very costly and tragic experiment. *I would only respectfully urge those who believe in the Agreement to discharge their responsiblity by going to East Bengal – not alone, but accompanied by their wives sisters and daughters and bravely share the burden of joint living w[illegible] the unfortunate Hindu minorities of East Bengal. That would be a re[illegible]st of their faith.* While I have differed from the line of approach adopted by our Government to solve a malady which perhaps has no parallel in history, let me assure the House that I fully agree that the supreme need of the houre is the maintenance of peace and security in India. While utmost pressure can and must be put upon the Government of the day to act rightly, firmly and timely to prevent the baneful effects of appeasement and to guard against the adoption of a policy of repression, no

encourgement should be given to create chaos and confusion within our land. If Government is anxious to have another chance – and let us understand it clearly that this is the last chance that it is asking for – by all means, let Government have it. But let not the critics of Government policy be silenced or muzzled. To our misfortune, one of the parties to the Agreement has systematically broken its pledges and promises and we have no faith in its capacity to fulfil its future pledges, unless it shows by actual action that it is capable of so doing. This note or warning sounded by us should not be unwelcome to Government, for it will then act with more keennes and alertness and not permit the legitimate interesrs of India to be sacrificed or sabotaged in any way.

While dealing with the problem of refugees, we will have to consider also the stupendous task of rehabilitation. The present truncated province of West Bengal cannot simply bear this colossal burden. It is a mighty task where both official and non-official elements can work together for the larger good of the country and between Government and its critics there will always be ample room for co-operation in facing a problem which concerns the peace and happiness of millions of people and of the advancement of the entire nation."

(গ)

কেমন করে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করা হল

[১৯৬৪ সালে কাশ্মীরে-হজরতবাল মসজিদ থেকে পয়গম্বরের কেশ অপহরণ কে কেন্দ্র করে পূর্বপাকিস্তানে (বাংলাদেশ) যে বীভৎস হিন্দু–বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল, তার ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। দাঙ্গার পরেও হিন্দুদের আগমন অব্যাহত থাকে। তখন এই বাস্তত্যাগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার বিচারপতি জে.এল.কাপুরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের এক কমিটি গঠন করে। তার অন্যতম সদস্য ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি রেণুপদ মুখার্জী। আমি তার কিছু কাল আগে পূর্ব পাকিস্তানে ভ্রমণে গিয়েছিলাম। আমার চাক্ষুষ ও সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক প্রতিবেদন তৈরী করে–স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিচারপতি মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে পেশ করি। সেটি পাঠ করে বিচারপতি মুখ্যার্জী খুবই আপ্লুত হয়েছিলন এবং প্রতিবেদনটি যথাস্থানে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভারত সরকার কাপুর কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেননি। অদ্যাবধিচেপে রেখেছে—ভারত-পাক শান্তি ও সৌহার্দ্যের অজুহাতে। নপুংসকদের কখনো ছলের-অভাব হয়না। ইতিমধ্যে-পদ্মা-মেঘনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকারের এখনো সে রিপোর্ট প্রকাশের সংসাহস নেই।

এই প্রতিবেদনটি প্রয়াত অধ্যাপক-দেবজ্যাতি বর্মনের সম্পাদিত 'যুগবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে পাঁচ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার থেকেই বর্তমানে গ্রন্থভূক্ত করা হল—লেখক]

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা

আমরা বাঙালী। বড় আন্তর্জাতিকতাবাদী বলে গর্ব করি। বিশ্ব প্রেমের সোল এজেন্ট আমরা। বিশ্বের যেখানেই মানবতা নিপীড়িত পদদলিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধেই আমাদের কণ্ঠস্বর সোচ্চার। হতভাগ্য ভিয়েতনামবাসীদের জন্য আমাদের ছাত্র-শিক্ষক শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের আর্তনাদের শেষ নেই। দুই কোরিয়ার সংযুক্তি করনের আমরা দৃঢ় সমর্থক। আবার দুই জার্ম্মানির একীকরণ সম্পর্কে আমরা অর্থপূর্ণ নীরবতা পালন করি। দক্ষিণ আফ্রিকায় অশ্বেতকায়দের সম-অধিকারের দাবী-দাওয়া নিয়ে দেশে বিদেশে আমাদের অক্লান্ত মৌখিক সংগ্রাম বিশ্ববিদিত। যুক্তরাষ্টের নিগ্রোদের র্দুদ্দশা স্মরণ করে আমরা হাপুস নয়নে কাঁদি। প্যালেস্টাইনের রিফিউজিদের জন্য দরদে আমাদের চোখের পানিতে আরবের মরুভূমিতে ঢল নামে। এই বিশ্বব্যাপী মানবতার তেজারতির কারবারে একটি দেশ কিন্তু সম্পূর্ণ বাদ। সেটি পাকিস্থান। প্রতিবেশি রাষ্ট্রে পিঞ্জরাবদ্ধ হিন্দুদের কথা উঠলেই আমরা চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে মুখে গোদরেজ তালা এঁটে রাখি। রবীন্দ্রনাথের ভাষাকেই একটু হেরফের করে বলা যায়—"ঘর হইতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, দেখি নাই একটু চক্ষু মেলিয়া,তপ্তকটাহে ভর্জ্জিত প্রায় পূর্ববঙ্গের হিন্দু।" স্বাধীনতা আন্দোলনের দধিচি,সংগ্রাম বিমুখ গদি-লোলুপ নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার ও রাজনৈতিক অপরিনামদর্শিতার নিরপরাধ বলি সেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কথাই বলছি। তারা কেন চলে এসেছে, এখনো আসছে ও আসতে চায় এবং বর্তমানে কি অবস্থায় দিনাতিপাত করছে তারই কিছুটা প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরছি। কারণ, তারা আমাদের স্বজন স্বজাতি, স্বধর্মাবলম্বী; একই পরিবারভুক্ত লোকও বটে। ভিয়েৎনাম, র্জামান, কোরিয়ান, প্যালেস্টাইনীদের চেয়ে অনেক অনেক আপন জন। তাদের সঙ্গে আমাদের রক্ত মাংসের সম্পর্ক।

কি অসহনীয় অবস্থা, বিশ বছর ধরে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা ভারতে চলে আসছে তা সম্যক ধারণা করতে হলে বিভক্ত-অবিভক্ত বঙ্গের বর্তমান জীবনের একটা মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া দরকার। না হলে আলোচনা অসম্পূর্ন থাকবে ও বোঝার পক্ষে সহায়ক হবে না।

প্রকৃতি এমনই দানশীল ছিল যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের খুব অল্প জিনিসের জন্যই বাইরে নির্ভর করতে হতো। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উর্বরা পলিমাটিতে তারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিরাট অংশই উৎপাদন করতো। জীবন যাপন সেখানে এত সহজ সরল, সস্তা ও সুখী ছিল যে-শতকরা নব্বুই জনেরও অধিক হিন্দুর শহুরে জীবন, কলকারখানার জীবনের জন্য তেমন কোন আকর্যণ ছিল না। তাই আজও তারা ছেড়ে আসা সেই পদ্মা-মেঘনা-যমুনা ও [illegible] অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিধৌত দেশের জন্য অশ্রুপাত করে, যার জন্য জনৈক কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী পূর্ব্ববঙ্গাগত বাস্তহারাদের তীব্র কটাক্ষ পর্যাপ্ত করেছেন। এটা সম্পূর্ন অসত্য যে, দু চার বিঘা জলা অনুর্বর শুকনো জমি, কয়েক শো টাকার ঋণ-কয় মাস খয়রাতি সাহায্যের আশাতেই তারা সব চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে ভারতে অনিশ্চিত জীবনের পথে পাড়ি দিয়েছে। দেশ ভাগের দরুন তারা যেন এভারেষ্ট শিখর থেকে ভারত মহাসাগরের অতল জলে পতিত হয়েছে। এই পতন এত আচম্বিতে এবং

তড়িৎ গতিতে ঘটেছে যে, তারা তাদের একদা অধিকৃত উচ্চাসনকে দুঃস্বপ্ন বলেই মনে করেন। বিশ বছরের শরিয়তি শাসনে আজ তাদের কাছে আমেরিকার কৃষ্ণকায়দের অবস্থাও স্বর্গতুল্য। সুখ শান্তির আবাস, আনন্দ কোলাহল পরিপূর্ণ পূর্ববঙ্গের হিন্দুবাড়ী ও পল্লীগুলির শ্রীহীন, জীবনস্পন্দন শূন্য ও নিরানন্দময় অবস্থার দিকে তাকালে অশ্রু সংবরণ কঠিন হয়ে পড়ে।

হিন্দুদের অবস্থা ও বাস্তুত্যাগের কারণ অনুসন্ধান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে, কলিকাতাই বাংলা দেশ নয়; এবং 'বন্দে মাতারম্' সঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক অঙ্কিত সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মলয়জ শীতলা বাংলা দেশের বার আনা অংশই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুদের চরম দুর্ভাগ্য যে খুলনা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের মতো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্থানে গেল। আর অন্ধ বাঙ্গালী বিদ্বেষে জর্জরিত অসমিয়া নেতারা শ্রীহট্টের মতো এমন সোনার থালা সদৃশ সুবৃহৎ জিলা—যা কৃষিজ বনজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ—পাকিস্থানের হাতে তুলে দিল। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জিলাতেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও শিক্ষা, সংস্কৃতি ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজনীতিতে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের দান অদ্বিতীয়। এই অঞ্চলের হিন্দু যুবকেরা মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে সব চেয়ে বেশী আত্মদান ও রক্তদান করেছে। এরাই লর্ড কার্জনের—Settled fact কে 'Unsettled' করেছিল। যার ফল—সারা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ জোরদার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃতি। তারা অখন্ড স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের স্বপ্ন দেখেছিল; কিন্তু এক দুর্যোগময় প্রাতঃকালে মানচিত্রের উপর লাল কালির এক নিষ্ঠুর আঁচড়ে তারা বিদেশী রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত নাগরিকে পরিণত হলো। নিজ বাসভূমিতে তারা হলো পরবাসী।

বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের সৃষ্টি তাদের সকল দুর্ভাগ্যের মূল। ভারতীয় নেতারা কেবল দেশ ভাগে সম্মত হন নি; তারা সরকারী কর্মচারী বিনিময়েও স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু যে সংখ্যালঘু সমস্যা সকল নষ্টের গোড়া, সেই সংখ্যালঘু হিন্দু-মুসলমান বিনিময়ে তারা মিঃ জিন্নার ইচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হন নি। বেশীর ভাগ হিন্দুনেতা ও কর্মী দেশ ভাগের সাথে সাথে ভারতে চলে আসে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুরা অনেকটা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। অফিস আদালত, কোর্ট কাছারী, থানা পুলিশ রাতারাতি হিন্দু কর্ম্মচারী শূন্য হয়ে গেল। প্রথম দিকে হিন্দু সমাজ হতভম্ব হয়ে গেল এবং কি করবে না করবে স্থির করতে পারল না। কিন্তু পুনঃপুনঃ দাঙ্গা হাঙ্গামার দরুণ সমাজের প্রতিপত্তিশালী, শ্রদ্ধাভাজন ও শিক্ষিত হিন্দুরাও একে একে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলো। সামাজিক দিক দিয়েও বিশেষ করে গ্রামবাসী হিন্দুরা অভিভাবকহীন হয়ে গেল। হিন্দুদের দুঃখকষ্টের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের চেষ্টা করার কেহ রইল না। তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দয়া ও ভালমানুষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তাদের ভাগ্যের বাঁধা পড়লো মুসলমানের হাতে। হিন্দুরা মুসলমানের "জিম্মি" অর্থাৎ হেফাজতে রক্ষিত হলো। সাদা বাংলায় যাকে বলে হাঁড়িতে তিয়ান কৈমাছ বা খাঁচার মোরগ, তাই আর কি। ইচ্ছা মতো মারা যায়।

এ প্রসঙ্গে ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সম্পর্কে বলা যায় যে, এখানে গভর্ণমেন্ট স্বয়ং

এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও অমুসলমান নেতারা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার সব সময় তৎপর—এমন কি অনেক সময় জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেও। কিন্তু পাকিস্থানের কোন মুসলমান নেতা বা দলই হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে না। আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের সমানাধিকার ও সুযোগ সুবিধার দাবীর সমর্থনে পাশাপাশি আন্দোলন করছে। ভারতেও হিন্দু—মুসলিম ঐক্য স্থাপন এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি ও মৈত্রী প্রচারে নিযুক্ত বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পাকিস্থানে এজাতীয় কোন প্রচেষ্টা কখনো তেমন দেখা যায়নি। ১৯৫০ সনের নরমেধ যজ্ঞের ফলে যখন কাতারে কাতারে হিন্দু শিক্ষক, ডাক্তার, অধ্যাপক, কবিরাজ ইত্যাদি পশিচমবঙ্গে চলে এলো, তখনই কয়জন মুসলমান নেতা পশ্চিমবঙ্গে এসে বিভিন্ন রিফিউজী ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে হিন্দুদের আবার দেশে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিল। কারণ, তখন পর্য্যন্ত মুসলমানরা ডাক্তার, বৈধ্য, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতির জন্য পুরোপুরি হিন্দুদের উপর নির্ভর ছিল। তদুপরি তখন পর্য্যন্ত বিভাগ--পূর্ব্বকালীন কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন যারা সত্যিই হিন্দুদের এরকম দেশত্যাগে ব্যথিত হয়েছিল। কিন্তু আজ চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। সমস্ত পেশাতেই মুসলমানরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমান নেতারাও আর নেই; থাকলেও অতি ক্ষীণ কণ্ঠ বা একেবারে নীরব। পূর্ব্ব পাকিস্থানের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ইতিহাসে কেবলমাএ ১৯৬৪ সনের দাঙ্গা—হাঙ্গামার সময় দেখা গেল ঢাকার কিছু সংবাদপত্র হানাহানির নিন্দা করেছে এবং ছাত্ররা মুক্ত কণ্ঠে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে। সে হাঙ্গামার ব্যাপকতা এবং পাশবিকতা তাদের মনে এমন আঘাত দিয়াছিল যে, তারা পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণকে গুন্ডাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান করেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের অবিরাম দেশত্যাগ বন্ধ করতে বা তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য পাকিস্থান সরকারের উপর চাপ দিয়ে কোন আন্দোলন করতে পারেনি বা করেনি। হিন্দুরা এমন প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছে, যেখানে যুক্তিতর্কের চেয়ে অন্ধ ভাবাবেগ ও জাতি—বিদ্বেষই প্রাধান্য পায়। ভারতীয় মুসলমানদের কারো কারো গোঁড়ামির ও গোঁয়ার্তুমির ফলে মন্দির বা শোভাযাত্রাদির উপর ঢিল নিক্ষোপাদি নষ্টামির জন্য কোন গন্ডগোল হলে, কিংবা কোরবানি ও মহরম উপলক্ষে তাজিয়া শোভাযাত্রায় কোন হিন্দুর হটকারিতায় কোন সাম্প্রদায়িক গোলমাল হলে তার প্রতিশোধের আগুনে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদেরই পুড়তে হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'মনোহর কাহানীয়া' 'রিলিজিয়াস লিডার্স', হজরতের কেশ চুরি' ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক কথায় হিন্দুরা যেন বাজারে ধরা পড়া চোর--যে কেহ দু-চার কিল দিয়ে হাতের সুখ করে নিতে পারে।

১৯৪৬ সালের ও তৎপরবর্তীকালের দাঙ্গাহাঙ্গামা গুলির প্রকৃতি ও ভয়াবহতা

(১) ১৯৪৬ সনের হাঙ্গামা নোয়াখালি জিলার একটা বিরাট এলাকা ও ত্রিপুরা জিলার কিয়দংশে সীমাবদ্ধ ছিল। হাঙ্গামা অক্টোবর মাসে অর্থাৎ "Great Calcutta Killing" এর দুই মাস পরে ঘটে। হাঙ্গামাকারীরা ছিল পাশের বাড়ী ও গ্রামের চির পরিচিত মুসলমান। উস্কানীদাতা ছিল মুসলিম লীগের নেতা ও যন্ডাগুন্ডার দল। মুসলমান কর্মচারী দ্বারা পূর্ণ

পুলিশ প্রশাসন ও বিচার বিভাগ ছিল পক্ষেপাত দুষ্ট। লুটপাট, আগুন দেওয়া, হত্যা, ধর্ষণ ও অপহরণ, ধর্মান্তিরণ ছিল প্রধান অপকর্ম। এর মধ্যে হত্যা,লুন্ঠন অগ্নিসংযোগ ও ধর্মান্তরিতকরণ ছিল ব্যাপক হারে। নারী হরণের ঘটনা ছিল তুলনায় অল্প সংখ্যক। ধর্মান্তরকরণ অর্থহীন। মিলিটারি আসার সঙ্গে সঙ্গে সব হিন্দুই নিজ নিজ ধর্মে ফিরে আসে। মিলিটারীর ঠ্যাঙানির ভয়ে মুসলমানরা নিজেরাই হিন্দুদের নিকট থেকে তাড়াতাড়ি লুঙ্গি-টুপি ফেরৎ নিয়ে নেয়।

২। ১৯৫০-এর দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্রায় সারা পূর্ব্ববঙ্গব্যাপী বিশেষতঃ ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, ফরিদপুর, ফেণী, শান্তাহার, রাজশাহী, ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক হারে নরহত্যা ঘটে। লুটপাট এবং গৃহদাহের সংখ্যা অপরিমিত। নারীহরণের অসংখ্য ঘটনাও ঘটেছে। নোয়াখালি জিলার অভিজ্ঞতার ফলে ধর্মান্তরকরণ আর করা হয় নি। গ্রামাঞ্চলের হাঙ্গামায় অংশগ্রহণকারী সবাই বাঙ্গালী মুসলমান। সহরে বিহারী মুসলমানরা সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করে। মুসলমানরা - লীগের পান্ডারা ও সরকারী উচ্চতম অফিসারগণ এবং পুলিশ সকলেই এই নরকীয় কান্ডে গুন্ডাদের উস্কানি ও সকল রকম সাহায্য দিয়েছিল- -এটা পুরোপুরি প্ররোচিত দাঙ্গা।

৩। ১৯৬৪ সালের খুলনা, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের হাঙ্গামায় নারী—পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হিন্দু হত্যা। বহু পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। লুটপাট অগ্নিসংযোগ যথারীতি চলে। নারী—হরণের ঘটনা অসংখ্য। দূরে নিকটে গ্রাম গ্রামান্তরে বিভিন্ন জেলার হিন্দু মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এক কথায় ১৯৪৭ সালের পশ্চিম পাঞ্জাবের মানব—ইতিহাসের বর্ব্বরতম দাঙ্গাহাঙ্গামারই পুনরাবৃত্তি ঘটে সেবার। নারীদের এমন পাশবোচিত অবমাননা পূর্ব্ববঙ্গের কোন হাঙ্গামাতেই ইতিপূর্ব্বে ঘটে নি। ধর্মান্তরকরণের কোন ঘটনাই ঘটে নি। পশ্চিম পাকিস্থানী ও ভারতত্যাগী মুসলমানরা—বিশেষ করে কলকারখানার শ্রমিকেরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। বিশেষতঃ হত্যা ও নারীহরণে তারা মুখ্য ভূমিকা নেয়।

এসব নারকীয় কান্ডের উদ্দেশ্য

পাকিস্থান সৃষ্টির দাবীকে মদত দেওয়াই ছিল নোয়াখালীর দাঙ্গার মুখ্য কারণ। কলিকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামায় আশানুরূপ লাফল্যলাভে ব্যর্থ প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী তখন কলিকাতার বদলা নিতে বাংলার সবচেয়ে হিন্দু সংখ্যা লঘিষ্ঠ জিলার দুরধিগম্য এলাকা বেছে নিয়েছিল। হিন্দুদের সাবাড় করার নির্দ্দেশ থাকলেও হাঙ্গামা আরম্ভ হতেই তা নতুন দিকে মোড় নিল। অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও তাদের ধূর্ত কর্মচারীরা, সুদখোর মহাজন ও হিন্দু মহাসভায় নেতারাই আক্রমণের সক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। মামলা—মোকদ্দমা ও ঝগড়া—বিবাদের দরুণ ব্যক্তিগত শত্রুতাও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এনে দিল। সাধারণ হিন্দুরা মোটামুটি হত্যাকান্ড থেকে রেহাই পায়। যার ফলে জীবনহানি পরবর্ত্তী কালের বরিশাল—ঢাকার মতো ব্যাপক হয়নি। প্রতিবেশী হিন্দুকে হত্যা ও তাদের ঘরবাড়ী পোড়ানোর চেয়ে গরীব মুসলমান দাঙ্গাকারীরা শীঘ্রই ধান, সুপারী, বস্ত্র, পোশাক ও তৈজসপত্রাদি লুন্ঠনের এবং ধর্মান্তরণেও নগদ টাকা আদায়ে মন দিল।

১৯৫০ সনের দাঙ্গাহাঙ্গামা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। মুসলমানরা তিন বছর পূর্ব্বে তাদের খোয়াবের পাকিস্থান পেয়েছে। হিন্দুরা বিনা ওজরে—যদিও ভারাক্রান্ত মনে তাদের অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে। পাকিস্থান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সংখ্যক উচ্চশ্রেণীরধনী হিন্দু পরিবার আংশিক বা পুরোপুরি ভারতে চলে এলেও শতকরা নব্বই জন হিন্দুই পাকিস্থানে বাস করবে ঠিক করল। মুসলমানরা পাকিস্থান চেয়েছে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে হিন্দু আধিপত্য থেকে রেহাই পাবার জন্য। কিন্তু তারা আশ্চর্য্য হয়ে দেখল যে, কেবলমাত্র সরকারী অফিস ছাড়া হিন্দুরা শিক্ষক,অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ীরূপে দেশের সর্ব্বস্তরেই মুখ্যস্থান দখল করে আছে। ইতিমধ্যে শত সহস্র সামরিক ও বেসামরিক মুসলমান পশ্চিম পাকিস্থান ও ভারত থেকে গিয়ে পূর্ব্ববঙ্গে আনাচে—কানাচে জেঁকে বসেছে। সাম্প্রদায়িকতা বিষে ও হিন্দু—বিদ্বেষে এই সব ব্যক্তির মনপ্রাণ বিযাক্ত হয়েছিল। বিরাট সংখ্যক হিন্দুর উপস্থিতি এবং এমন কি পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় পর্য্যন্ত জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতিপত্তি তাদের নিকট একেবারে অসহ্য ছিল। অপর পক্ষে তারা কি রকম সুন্দরভাবে(?) পশ্চিম পাকিস্থানকে হিন্দু--শিখ শূন্য করে এসেছে—পাকিস্থান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই।

তদুপরি খুলনা ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলা। বরিশালে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়েও ভীষণ প্রভাবশালী ছিল। তাছাড়া খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুরে নমঃশূদ্রের সঙ্গে মুসলমানদের ছিল চির বৈরিতা। এখন সুযোগ এল নমঃশূদ্রদের একহাত দেখে লওয়ার। কেননা থানা পুলিশ এখন তাদের হাতে। সুতরাং অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ভারত থেকে বিশেষতঃ কলিকাতা থেকে আলাদা হয়ে তারা লাভবান হয়নি। যেটুকু হয়েছে তাও পশ্চিম পাকিস্থানীরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। স্বভাবতঃই জনতা মুসলিম লীগ ও শাসকগোষ্ঠীর উপর বিরক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান মুসলিম লীগ নেতা ও পশ্চিম পাকিস্থানী উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীরা মুসলমানদের, হিন্দুদের জমি বাড়ী ও ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে লেলিয়ে দিল। যার ফলে চল্লিশ লক্ষাধিক মধ্যবিত্ত হিন্দু তাদের ঘরবাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশা ছেড়ে ভারতে ছুটে এল। মুসলমানরা আস্তে আস্তে সে সব শূন্যস্থান দখল করে বসল। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বুনিয়াদ সৃষ্টি হল।

১৯৬৪ সালের হাঙ্গামার সঙ্গে উপরে উক্ত দুইটি দাঙ্গার কোনটার সঙ্গেই মিল নেই। প্রথমতঃ খুলনার জনৈক হিন্দু জমিদারের সঙ্গে পাকিস্থানী উজীর সবুর খানের জমি নিয়ে মামলা হয় এবং তাতে উজীর সাহেব হেরে যান। ঠিক সে সময়েই কাশ্মীরে মহম্মদের কেশ চুরির ঘটনা ঘটে—যার সঙ্গে হিন্দুদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই ঘটনাকে সবুর খান আল্লা-দত্ত সুযোগ বলে মনে করল এবং ভাড়াটে গুন্ডা ও মিল-কারখানার শ্রমিকদের বাহ্যতঃ কেশ চুরির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হলেও কার্য্যতঃ হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। তাছাড়া সে সময় পাকিস্থান নির্ব্বাচনের প্রাক—মুহূর্তে বিরোধী মুসলিম নেতা, ছাত্র ও যুবকগণ আয়ুব খাঁ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে লড়বার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিল। জন—অসন্তোষের গভীরতা দেখে এবং আয়ুব—শাসনের প্রতি বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে শাসকগোষ্ঠী ভীত হয়ে পড়ল। সুতরাং যেন-তেন প্রকারেণ একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধান দরকার হয়ে পড়েছিল। কেশ চুরির ঘটনাকেই তারা মোক্ষম অস্ত্ররূপে

গ্রহণ করে খুলনার হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কিছু গোলমাল হল। তারই পাল্টা হিসেবে ফরিদপুর ঢাকা নারায়ণগঞ্জে হিন্দুদের, সরকারী সাহায্য ও সহায়তায়, সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার কাজ সুরু হল। বাড়ীতে, দোকানে, কারখানায়, ট্রেনে বাসে লঞ্চে, নৌকায়, রাস্তা, ঘাট হোটেল মন্দিরে যেখানে পাওয়া গেল হিন্দুদের মাছির মত হত্যা করা হল। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসে এমন পাশবিকতা বর্ব্বরতা। ৫০-এর দাঙ্গার পর দেখা যায়নি।

এই তিনটি বিরাট আকার দাঙ্গাহাঙ্গামার মাঝে মাঝেও মাঝারি এবং ছোট আকারের অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ গোপালগঞ্জ, রাজশাহী ও রংপুর জিলার কোন কোন এলাকা, চৌমুহনীফেণী ইত্যাদি স্থানে। সেসব হাঙ্গামায় হিন্দুরা কোথাও মুসলমানদের বাধা দিতে পারে নি--তারা একতরফা মার খেয়েছে--ধনে জনে মরেছে। কিছু কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান প্রতিবেশী কিছু হিন্দুর প্রাণ রক্ষা করেছে সত্য, কিন্তু এ জাতীয় মুসলমানের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়।

হিন্দুদের উপর দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া

১৯৪৬ সনের নোয়াখালীর দাঙ্গার আগে পর্য্যন্ত হিন্দুরা একথা ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি যে, তাদের প্রতিবেশী পরিচিত মুসলমানরা তাদের জন্তুর মত জবাই করতে পারে—এমন কি ইংরেজ রাজত্বকালে পাবনা, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, রংপুর ও কলিকাতার দাঙ্গার পরেও। পাকিস্থান সৃষ্টির পর সেখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই সমানাধিকার ভোগ করবে—মিঃ জিন্নার এই প্রতিশ্রুতিতেও তারা বিশ্বাস করেছিল। তদুপরি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিগ হলেও পাকিস্থানে হিন্দুদের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থরক্ষার জন্য সকল ব্যবস্থা ভারত সরকার গ্রহণ করবেন—নয়া দিল্লীর কর্তাদের ইত্যাকার ঝুড়ি—ভর্ত্তি আশ্বাসে বোকা হিন্দুরা আস্থা স্থাপন করে পাকিস্তানে বাস করার জন্য তৈরী হলো মনে মনে। কিন্তু ১৯৫০ সনের দাঙ্গার ফলে হিন্দুদের সকল আশা ও বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু যারা সমাজের ভিত ও খুঁটি, তারা একযোগে দেশত্যাগ করল। বাকী হিন্দুরা সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। যারা রয়ে গেল তারা বেশীর ভাগ চাষী, ব্যবসায়ী এবং পৈত্রিক পেশায় নিযুক্ত জাতিসমূহ। ১৯৬১ সনের পাকিস্থানী লোক গণনায় তাদের সংখ্যা ৯০ লক্ষাধিক। হিন্দুরা পাকিস্থানে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হল। তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর তো নয়ই, বরং নাগরিক হিসেবে তাদের যে কোন শ্রেণীই নেই সে সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা হল। সেই থেকে তাদের অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হয়েছে—একমাত্র ১৯৫৪—১৯৫৮ পর্য্যন্ত এই চার বছর ছাড়া অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্ব্বাচনে যুক্তফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের সম্পূর্ণ উৎখাত হওয়া থেকে আয়ুব খানের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত। বিগত ১৯৬৪ সালের নৃশংস নরহত্যা ও নারী নির্য্যাতনের পর পাকিস্থানে বসবাসের শেষ আশা মুছে গেছে। হিন্দুদের প্রতি কথাবার্তায় আচার—আচরণে পাকিস্থাণী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দলীয় চেলা—চামুন্ডার দল স্পষ্ট ভাবে হিন্দুদের জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্থানে হিন্দুদের অবস্থান তারা ভাল চোখে দেখে না।

ভারতে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন পদ্ধতি ও তার সুযোগ সুবিধা পাকিস্থানী হিন্দুদের নিকট মোটেই লোভনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত নয়। ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে যে নিদারুণ দুঃখ কষ্টময় জীবনযাপন করতে হচ্ছে, তাও তারা জানে। তা সত্ত্বেও যদি পাকিস্থান সরকার হিন্দুদের জায়গা-জমি বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী না করতো, তবে আরও ৩০।৪০ লক্ষ হিন্দু ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসত। ভারতে সাহায্যে ও পুনর্ব্বাসনের সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে গেছে; সেখান থেকে জায়গা-জমিছেড়ে এলে কিভাবে এ বঙ্গে অন্নবস্ত্র জুটবে, এই চিন্তাতেই হিন্দুরা সব অত্যাচার অবিচার সহ্য করেও পাকিস্থানে পড়ে আছে। যে ব্যক্তিই গোপনে মুসলমানদের সঙ্গে অলিখিত ভাবে আধা—মূল্যে বা সিকি মূল্যে বিষয় সম্পত্তির কোন ব্যবস্থা করতে পারছে, সেই সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে রাতের অন্ধকারে এপারে পালিয়ে আসছে। একটা সুখী সমৃদ্ধ সমাজের সামনে ওপারে মৃত্যু, ধ্বংস ও অপমান এবং এপারে অনাহারে মৃত্যুর মধ্যে বেছে নেওয়ার মতো কিছু নেই।

হিন্দুদের বর্ত্তমান বাস্তত্যাগের মুখ্য কারণ ঃ-

(১) গ্রাম্য চৌকিদার পোষ্ট অফিসের পিয়ন ও অফিসের বেয়ারা থেকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পর্য্যন্ত সবাই মুসলমান। হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা হাজারে ২।৩ জনও হবে না।

(২) হিন্দুদের চাকুরীর কোন সুবিধা নেই। বর্ণ হিন্দুরা চাকুরী ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য। তপশীলী সম্প্রদায়কে নিম্ন স্তরের ২।৪টি চাকুরিতে মাঝে মাঝে দেখা যায়। নতুন স্থাপিত কলকারখানার ও সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের দরজাও হিন্দুদের নিকট প্রায় বন্ধ। লেখাপড়া শেখার পর শতকরা নব্বইটি হিন্দু-যুবক চাকুরীর সন্ধানে, পরিবার থেকে আলাদা হয়ে, চোরাপথে ভারতে চলে আসে।

(২) ইসলামিক ভাবাদর্শ, চিন্তাধারা ও তমুদ্দিনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থা গঠিত। ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখা। হিন্দু ছেলেরা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছুই জানে না। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলন ও তার নেতাদের নাম-ধাম কীর্তিগাথা সম্পর্কে তাদের তিলমাত্র জ্ঞান নেই। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য হিন্দুদের উপর দোষারোপ। দেশের স্বাধীনতাদের জন্য মুসমিল লীগ দল ও নেতাদের বিরাট অবদানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ। জিন্না প্রভৃতি নেতাদের সংগ্রামশীল জীবনের মোহনীয় বর্ণনা। পাকিস্থান সৃষ্টিতে হিন্দুদের বাধাদানের ফিরিস্তি। আইন অমান্য, লবণ সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড়, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন ইত্যাদি সম্পর্কে ছাত্রদের কিছুই জানান হয় না। হিন্দু ইতিহাস, ধর্ম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে অনুক্তি বা অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি।

(৪) আমদানী—রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য লাইসেন্স পারমিন্ট ইত্যাদি হিন্দু ব্যবসায়ীদের বরাতে জোটে না বললেই চলে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং পৈত্রিক পেশাতেই হিন্দু ব্যবসায়ীরা নিয়োজিত। কিন্তু সেখান থেকেও তারা আস্তে আস্তে উৎখাত হচ্ছে। কারণ কর্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, পানচাষী ও বিক্রেতা, ধুপী প্রভৃতি হিন্দুদের জাত ব্যবসাও মুসলমানরা অতিদ্রুত গ্রহণ করছে। সংখ্যালঘু পাড়াগুলি চারপাশে মুসলমান বেষ্টিত। যতদিন দেশে আইন-শৃঙ্খলা ছিল হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি বাসে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু প্রতিবেশীদের মনে পাকিস্থানী মনোবৃত্তি সৃষ্টি হবার পর থেকেই প্রতিবেশীসুলভ ভদ্রতা,

সমীহভাব ও চক্ষুলজ্জা মুসলমানের মন থেকে মুছে গেছে—বিশেষ করে গ্রামের মধ্যবয়সী ও নবীন মুসলিম সম্প্রদায় থেকে। এখন পাকিস্থান ছেড়ে চলে আসায় অনেক হিন্দু বাড়ীই খালি হয়ে গেছে। আবার কোন বাড়ীর কিছু পরিবার চলে আসায় সেগুলি আংশিক খালি হয়ে গেছে। মুসলমানরা ঐসব বাড়ীর অংশবিশেষ কিনে বা জোর করে দখল করে ঢুকে পড়েছে হিন্দু পল্লী বা বাড়ীর ভিতর। তার ফলে হিন্দুদের ধর্মকর্ম পালন করে এবং মেয়েছেলে নিয়ে সসম্মানে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

(৬) পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু বাড়ীগুলিতে দুই থেকে ১৫।২০টি পরিবার পর্য্যন্ত বাস করত। এখন প্রায় অধিকাংশ বাড়ীরই চার আনা বা আট আনা বা বারো আনা অংশই খালি। হাজার হাজার বাড়ী তো একেবারেই জনশূন্য, এমন কি বহু গ্রামও একেবারে হিন্দু শূন্য হয়ে গেছে। যে সব পরিবার রয়ে গেছে তাদেরও ভগ্নদশা। এমন অসংখ্য হিন্দু পরিবার দেখা যাবে যাদের পিতামাতা পাকিস্থানে শেষ দিন গুনছে; এক ভাই গেছে আসাম, আর একজন আন্দামান, তৃতীয় জন হয়তো দন্ডকারণ্যে। মেয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে বোন হয়তো গেছে উড়িষ্যায়। মামা ভাগিনা, খুড়া জ্যেঠা বা শ্যালক সম্বন্ধীরাও এমনি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা চলে গেছে কোন অজানা জায়গায়। এজীবনে হয়তো আর তাদের সঙ্গে দেখা হবে না—সময়, সুযোগ ও সামর্থ্যের অভাবে। এভাবে সমাজ, সম্প্রদায় ও সম্পর্ক সব ভেঙ্গে চুরে গেছে—সে সঙ্গে গেছে মানসিক সুখশান্তি। গৃহপিপাসু হিন্দুরা গাঙের কচুরিপানার মত যত্র তত্র ছড়িয়ে গেছে ও যাচ্ছে—তাদের সাতপুরুষের ভিটা–মাটি ছেড়ে। একপ্রকার অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা বোধ ও হীনমন্যতা ও না-ঘরকা না-ঘাটকা ভাব তাদের দেহমন আচ্ছন্ন করে আছে এবং তাদের নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ করে তুলেছে—যা মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্ববোধ নিয়ে বাস করার সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

(৭) ভিসা-পাশপোর্ট চালু হবার পর থেকে আস্তে আস্তে তার কড়াকড়ি বৃদ্ধি এবং ভারত—পাক সংঘর্ষের পর থেকে একেবারে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নেহাত যাদের আসা—যাওয়া না করলে নয়, তারা ছাড়া এমনিই কেহ পাকিস্থানে যেত না। কিন্তু এখন তাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পুলিশ মিলিটারীকে ঘুষ দিয়ে দিনে দু'চারজন হয়তো এখন চোরাপথে এদিক ওদিক যাতায়াত করে থাকে—নিতান্ত দায়ে পড়ে।

(৮) মানি-অর্ডার ব্যবস্থা রহিত হওয়ায় বহু হিন্দু চলে আসতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে-—কারণ উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরা অনেকেই ভারতে চাকুরী বা কাজকারবার করে।

(৯) বিয়ের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য পাত্রের অভাব। কারণ, লেখাপড়া শিখে বেশীর ভাগ যুবকই চাকুরীর সন্ধানে ভারতে চলে আসে। কৈশোর উত্তীর্ণ হলেই অনেকে আত্মীয়স্বজনের নিকট মেয়েদের পাঠিয়ে দেয়।

(১০) একশ্রেণীর মুসলমান সব সময়ই হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তির উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, জোট বেঁধে এমন অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে যে, প্রাণ—মান রক্ষার জন্য সেই এলাকার হিন্দুদের ভারতে পালিয়ে না এসে উপায় থাকে না।

(১১) বিয়ে শ্রাদ্ধ শবদাহ প্রভৃতি কাজের জন্য অনেক স্থানেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অভাব।

১২। হাট-বাজারে, শহর-বন্দরে এবং অনেক গ্রাম এলাকাতেই হিন্দুরা জীবন রক্ষার্থে নিজ জাতিধর্ম লুকাবার জন্য নিজেদের জাতীয় পোষাক ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি, পাজামা প্যান্ট ইত্যাদি পরতে বাধ্য হয়েছে।

১৩। পূজার্চ্চনা, বারোয়ারী উৎসবানুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের নিকট অতীতের জিনিস। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল, ত্রিপুরা জিলার মেহার কালীবাড়ীর পূজা, নোয়াখালী জিলার মাইজদী ও চৌমুহনীতে রাম ঠাকুরের উৎসব, লাঙ্গলবন্ধের স্নান, দালালবাজারের ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি বহু বহু উৎসব অনুষ্ঠানই একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। বারো মাসে তের পার্ব্বনের দেশ পূর্ব্ববঙ্গে আজ গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তনের খোলের শব্দ, কবিগানের ঢোলের শব্দ, নীলপূজার ঢাকের শব্দ, বিয়ের বাঁশি সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। 'মেহার কালীবাড়ী' ষ্টেশনের নাম পাল্টে হয়েছে'মেহের'—এই মুসলমান নাম; 'চাঁদপুর কালীবাড়ী' পরিবর্ত্তিত হয়েছে চাদপুর কোর্টে।

১৪। হিন্দু মেয়েদের অপহরণ, ফুসলানো ও শ্লীলতাহানির ঘটনা প্রায়ই ঘটে। দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ না করে পাকিস্থান সরকার ঐগুলি প্রেমঘটিত ঘটনা বলে সাটিফিকেট দিয়ে থাকে। সুশ্রী বয়স্কা মেয়েদের মা-বাবার বুক সব সময় ঢিপ ঢিপ করে কখন কি ঘটে এই আশঙ্কায়।

১৫। হিন্দু মেয়েদের উপর অভব্য ও অসভ্য আচরণকারীরা মুসলমান সমাজে মোটেই নিন্দিত বা তিরস্কৃত হয় না, বরং বাহাদুর আখ্যা লাভ করে। বাপকা বেটা বলে তারা প্রশংসিত হয়।

১৬। পুলিশী শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক। থানায় অভিযোগ করলে তার সময় মত তদন্ত হয় না। দুর্বত্তদের সময় মত গ্রেপ্তার করা হয় না। কুখ্যাত খুনী ও গুন্ডাদের যদিও বা ধরা হয়, কিন্তু তারা অবিলম্বে জামিনে খালাস পায় পুলিশী নিস্ক্রীয়তার দরুণ। গ্রামে ফিরে এসেই তারা হিন্দুদের উপর ধমক এবং আরও কঠোর প্রতিশোধের ভয় দেখায়। নিজ সম্মান ও প্রাণ রক্ষার্থে কোন হিন্দু প্রতিবেশী হিন্দুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সাহস পায় না। আর মুসলমান হয়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া তো হারাম। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের জোর ও বিচারকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও পুলিশের উদাসীনতায় মামলা ফেঁসে যায়। অত্যাচারিত হিন্দুকে পাকিস্থানে বাস করে মুসলমানের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করার দুঃসাহসের প্রারশ্চিত্তস্বরূপ অর্থহানি মানহানি ও ক্ষেত্রবিশেষ জীবনহানি দিয়ে গুনাহগারি করতে হয়।

১৭। সাধারণ মুসলমান ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া এবং গুজবে অতি সহজে উত্তেজিত। ১৯৫০ সনে ফজলুল হকের হত্যা ও ১৯৬৪ সালে আদমজী জুট মিলের ভাইয়ের হত্যাকান্ডের মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল আরও হিংস্রভাবে।

১৮। ধর্ম্মান্ধ মোল্লা মৌলানার দল সব সময় প্রচার করে থাকে যে আল্লাহতালার দুনিয়ায় মুসলিম রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সমস্যা বলে কিছু নেই। এমন কি পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও না-পাক হিন্দুদের কোতল করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্ব্ব পাকিস্থানেই বা তা হবে না কেন? তারা হিন্দুদের 'কাফের' ও ভারতের চর বলে ঘোষণা করে। কি ক্ষমতাসীন, কি ক্ষমতাচ্যুত সব রাজনৈতিক নেতারই একমাত্র মূলধন ভারত বিদ্বেষ তথা হিন্দু-বিদ্বেষ।

১৯। ভারত বিরোধী এবং তার ফলে হিন্দু বিরোধী প্রচার—বিশেষ করে ভারতে মুসলমান হত্যা, মস্‌জিদ ধ্বংস এবং পয়গম্বরের অপমান ইত্যাদি মনগড়া কাহিনীকে রঙ চড়িয়ে বক্তৃতায়, রেডিওতে, সংবাদপত্রে ফলাও করে তুলে ধরা হয়। ভারতকে হাতের কাছে না পেয়ে ক্রুদ্ধ মুসলমানদের সমস্ত আক্রোশের লক্ষ্য হয়ে পড়ে হিন্দুরা।

২০। আইন করে হিন্দুদের জমিজমা বিক্রি বন্ধ করার ফলে হিন্দুদের দুর্ভাগ্যের যোলকলা পূর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশে কারও নিজ বিষয় হস্তান্তরের উপর এমন জংলী আইন চালু নেই—একমাত্র পাকিস্থান ছাড়া। জমিজমা বিক্রি করে পাকিস্থান থেকে মানসম্মান নিয়ে পালাবার পথে তো কাঁটা পড়েছে; তার উপর নিজের প্রয়োজন-যেমন মেয়ের বিয়ে, পিতার শ্রাদ্ধ ও ভরণপোষণের জন্য যে কেউ একটু জায়গা জমি বিক্রি করে দায় উদ্ধার হবে তাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।

২১। পশ্চিম পাকিস্থানীদের দ্বারা অধ্যুষিত ও নিয়ন্ত্রিত বর্তমান পাকিস্থান সরকার হিন্দুদের প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। কেননা, হিন্দুদের সংখ্যার জোরেই পূর্ব-পাকিস্থানের মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবী করছে। হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে না থাকলে দুই পাকিস্থানের লোকসংখ্যাই সমান হত। এত মেরেকেটেও হিন্দুদের পুরোপুরি দেশ ছাড়া করা যাচ্ছে না, তাতে তাদের রাগ আরও বেশী। সুতরাং পাকিস্থানে থাকার মজাটা হিন্দুদের যাতে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়ান যায়, সেই কুমতলবই সব সময় তারা ভাঁজছে।

২২। নোয়াখালী, ঢাকা বরিশাল, খুলনা, সান্তাহার, নারায়ণগঞ্জ ও অনান্য স্থানের নারকীয় ঘটনাবলী এখনও পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে বিভীষিকা জাগায় এবং আবার কখন কোন্ ছুতায় ঐ বর্বরতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে সে চিন্তায় তারা চিন্তিত। পাকিস্থান সৃষ্টির সতের বছর পরেও যে ভাবে তাদের দলবদ্ধ ভাবে কোতল করা হয়েছে, তাতে জন্মভূমি বাসের শেষ আশা ফুরিয়েছে। তার যে পুনরাবৃত্তি হবে না সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা কেহ দিতে পারে না, ও দেয় না। ভবিষ্যতে পুত—নাতির জন্য একটা আম, নারকেল গাছ রোপন করতেও কোন হিন্দুই গত কয়বছর আর কোন উৎসাহ পায় নি। সকলেরই কবে আছি কবে নেই অবস্থা।

২৩। যুক্তফ্রন্টের আমলে হিন্দুরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল এবং শাসন ক্ষেত্রেও মোটামুটি একটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। কিন্তু আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র চালু হবার সাথে-সাথে হিন্দুরা রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। মৌলিক গণতন্ত্রের মূলকেন্দ্রে যৌথ নির্ব্বাচন চালু হলেও কি প্রাদেশিক, কি কেন্দ্রীয় কোন আইন সভাতেই একটি হিন্দুও নির্ব্বাচিত হতে পারে নি। পূর্ব্ববঙ্গের ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর মধ্যে এখানে-সেখানে কয়জন হিন্দু থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদের জন্য কিছু করার বা তাদের হয়ে বলার মত কোন হিন্দু মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা আইন সভায় নির্ব্বাচিত হতে পারে নি। হিন্দুরা যৌথ নির্ব্বাচন চেয়েছিল ঠিকই-কিন্তু তা আয়ুব-মার্কা নয়। আয়ুবী যৌথ নির্ব্বাচনে ৯০ লক্ষ হিন্দু রাজনীতির ত্রিসীমানা থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

২৪। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বেশীর ভাগ মুসলমানই প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্য ভুলে গেছে। অনেকের মনেই প্রভু–ভৃত্য ''রাজার জাত--প্রজার জাত' মনোবৃত্তি মাথাচাড়া

দিয়ে উঠেছে। কিছু সংখ্যক বয়স্ক মুসলমান হিন্দুদের জন্য দুঃখ বোধ করে, কিন্তু তাদের করবার কিছু নেই। মধ্য বয়সী মুসলমানরা (মুসলিম লীগের হিন্দু বিদ্বেষে জর্জ্জরিত দেশ বিভাগকালীন যুবক) হিন্দুরা গেল কি না গেল, তজ্জন্য মাথা ঘামায় না। কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ হিন্দুদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাসের দিকে তাদের প্রবল ঝোঁক। বর্তমানের নব্য মুসলিম যুবকশ্রেণী নিজেদের স্বাধীন দেশে নানা সুযোগ সুবিধার দৌলতে নিজ নিজ জীবন গড়ে তুলতে ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষা দীক্ষায় হিন্দুদের দান, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুদের অতীত গৌরবের কথা, স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু যুবকদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। বরং হিন্দুরা মুসলমানদের হরেক রকমে শোষণ করেছে-এ কথাই তাদের মনে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। হিন্দুদের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে তারা নিতান্তই উদাসীন। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এক শ্রেণীর মুসলমান চায় যে, যেহেতু তথাকথিত অত্যাচারী হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে গেছে; সুতরাং নিরীহ অবশিষ্ট হিন্দুরা যেমন—চাষী, ছোটো ব্যবসায়ী, জেলে, ধোপা, নাপিত-কামার, তাঁতী, ছুতার, প্রভৃতি পৈত্রিক পেশায় নিযুক্ত হিন্দুরা, যারা মুসলমানদেরও সমভাবে কাজে লাগে, তারা পাকিস্থানে থেকে যাক।

২৫। সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানরা, বিশেষ করে গ্রামবাসী মুসলমানগণ একেবারে মূলতঃ খারাপ ছিল না। তারা গরীব, অশিক্ষিত ও ধর্ম্মভীরু। ধূর্ত মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা তাদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাবার সহজ পন্থা গ্রহণ করে। যদি সব মুসলমানই বদ চরিত্রের হতো, তবে আজও দুঃখ কষ্টের মধ্যে হলেও ৯০ লক্ষ হিন্দু পাকিস্থানে থাকতে পারত না। কিন্তু অবস্থার এমনই পরিবর্তন হয়ে গেছে যে, আজ ভাল মুসলমানরা ইচ্ছা করলেও হিন্দুদের দুরবস্থা দূরীকরণে বা তাদের ক্রমান্বয়ে দেশত্যাগের অনর্গল স্রোতকে প্রতিহত করতে পারবে না। কেন না, হিন্দু সমাজের সকল সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনই একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। অনেক সময়ই কোন কোন মুসলমান স্বজাতীয়ের হাতে প্রতিবেশী হিন্দুর নিগ্রহের পরিকল্পনা জানতে পেরে সীমান্ত পর্য্যন্ত পার করে দিয়েছে। কিন্তু এ জাতীয় ঘটনার সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়।

২৬। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের দুর্গত অবস্থার প্রতিকারে কার্য্যকরী কোন পন্থা গ্রহণ না করে ভারত সরকার নিজেদের অস্থিরমতিত্ব, ভুল সিদ্ধান্ত ও অব্যবস্থিত চিত্ততার দ্বারা বরং তাদের সঙ্কটময় জীবনকে আরও দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছে। কাশ্মীর, বেরুবাড়ী, কচ্ছ, আসাম, ত্রিপুরায় মুসলিম অনুপ্রবেশ, খালের জল, ফরাক্কা বাঁধ ইত্যাদি সম্পর্কে কাজে কথায় পূর্ব্বাপর সংগতিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া, জল ঘুলিয়ে খাওয়া, হাতের পাঁচ ছেড়ে দিয়ে পরে হায় হায় করা, নিজের নাক কেটে নিজ যাত্রা ভঙ্গ করাই ভারতীয় নেতাদের রাজনীতি জ্ঞানের নমুনা। গত বিশ বছর ধরে নয়াদিল্লীর নয়া বাদশাদের রাজনৈতিক দৈন্যের শিকার হয়েছে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু উলুখাগড়ারা। প্রথমে আসাম ত্রিপুরায় পাকিস্থানী মুসলমানদের অবাধে প্রবেশ করতে দিয়ে এবং তা অস্বীকার করে, পরে ভারত সরকার কিছু মুসলমানকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করল। তখন তদের প্রতিশোধের লক্ষ্য হল পাকিস্থানী হিন্দুরা। "ভারত থেকে বিতাড়িত রিফিউজী" মুসলমান আখ্যা নিয়ে তারা নোয়াখালি, ত্রিপুরা শ্রীহট্ট ও ময়নসিং এর হিন্দুদের বাড়ী জমি জোর করে দখল করে তাদেরর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাদের

সকল রকম সাহায্য দিচ্ছে পুলিশ, এবং আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের আজব সৃষ্টি ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও তার শয়তান সদস্যবৃন্দ।

২৭। ইচ্ছা করলে একমাত্র পাকিস্থান সরকারই হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার হতে রক্ষা করে নিজ বাসভূমিতে সুখে শান্তিতে বাসের ব্যবস্থা করতে পারে; আর কেহ নয়। কিন্তু হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ বন্ধ করার মত এমন লোকসানের কাজ তারা কখনই করবে না। হিন্দুরা সব সময় একটা অস্থির মানসিকতায় বাস করুক এটাই তাদের ইচ্ছা। যখন তখন কয়েক লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবে, এখানকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বানচালকরবে, সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নিত করবে–তা হলেই পাকিস্থান সরকার ভারত সরকার এবং তার ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে দেশে বিদেশে নিন্দা করে বেড়াতে পারবে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত ধর্মনিরপক্ষে গণতান্ত্রিক দেশ তাদের চক্ষুশূল বিশেষ। ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তাদের মনে দরদ কণামাত্র নেই। আজ যদি ভারতীয় মুসলমানরা কোন অসুবিধা ভোগ করেও থাকেন, তবে তার জন্য ষোল আনা দায়ী পাকিস্থান ও তার নেতারা—কারণ তারাই পাকিস্তান সৃষ্টি করে ভারতীয় মুসলমানদের অসুবিধায় ফেলে পাকিস্থানে গদীর লোভে চম্পট দিয়েছে। নিজেদের অপরাধ বোধকে ঢাকবার জন্যই তারা ভারতীয় মুসলমানদের তথাকথিত দুঃখকষ্টে মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ ও কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করে থকে। যে সমস্ত ভারতীয় মুসলমান ১৯৬৪ সালের হাঙ্গামার পর পাকিস্থানে গিয়েছিলেন তারাই পাকিস্থানী নেতাদের দরদের নমুনা দেখে ভারতে ফিরে এসেছেন। পাকিস্তানী নেতারা যদি সত্যিই ভারতীয় মুসলমানদের দরদী হতো, তবে সেখানে হিন্দুদের উপর এমন মানবোচিত ব্যবহার করত, যার ফলে ভারতে মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার কোন সুযোগই পেত না। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে আর পাকিস্থান সৃষ্টির দরকারই বা কি ছিল?

যাক, পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি সদ্ব্যবহার যে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে সহায়তা করে, এ জাতীয় মহৎ চিন্তা তাদের কল্পনার বাইরে। ভারতে বা পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাদের লাভ ছাড়া ক্ষতির কিছু নেই। তারা বিরাট সংখ্যায় হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গার সুফল লাভ করে। স্থাবর অস্থাবর হিন্দু সম্পত্তি হস্থান্তরিত হয়ে দুশ্চরিত্র লোকদের হাতে পড়ে এবং তারা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত থাকে। এই শাসকগোষ্ঠি এমন নির্লজ্জ ও বর্বর যে, তারা নিজেরাই উস্কানি দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধায়। তারা কখনই হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা করে না বা দুষ্কৃতিকারীদের নিন্দা করে না। যে সমস্ত অফিসার দাঙ্গার সময় নিষ্ক্রীয় থাকে বা তাতে সক্রিয় অংশ নেয়া, তারা চাকুরী জীবনে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

২৮। পাকিস্থানী হিন্দুদের অশ্রু ও রক্তে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার ডজন ডজন মহাভারত লেখা যায়। তাদের উপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনার সঙ্গে একমাত্র হিটলারের হাতে ইহুদী নির্য্যাতিনের তুলনা চলে। ইহুদীরা সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে আজ সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের লাঞ্ছনাময় জীবনের অবসানের কোন সম্ভাবনা অতি দূর ভবিষ্যতেও দেখা যাচ্ছে না। কারণ, কোন মুসলমান রাষ্ট্রেই কেহ নিজ ধর্মরক্ষা করে বাস করতে পারে নি। ভিন্ন ধর্মীদের হয় মরতে হয়েছে, না হয় দেশ ছাড়তে হয়েছে; আর

না হয় ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে প্রাণ রক্ষা করতে হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্ম্মীর বাস—এটা ইসলামের ইতিহাস বিরোধী। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে হিন্দুদের 'মালাউন' বলা হত; এখন তাদের ডেঁড়া'' বলা হয়। হিন্দুরা এর অর্থ বোঝে না; কিন্তু এটা যে বেশ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য সূচক তা তারা সহজেই বোঝে।

পাকিস্থানে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ

পাকিস্থানের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কি? তাদের গৌরবময় অতীত ছিল; কিন্তু বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সামনে শুধু অনন্ত অন্ধকার। বিগত বিশ বছর ভারতবাসীর যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাতে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, নিকট ভবিষ্যতে ভারত-পাক সম্পর্কের্র উন্নতির ক্ষীণতম আশা ও সম্ভাবনাও নেই। দুটি দেশ কবে যে সুজন প্রতিবেশীর মত বাস করবে তা যে কোন ব্যক্তির ধারণা অতীত। ভারত—পাক নাটকের পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের অভিনয় হতে এখনো বাকী আছে। পাকিস্থান সৃষ্টি এবং বিগত বছরের ঘটনাবলী নাটকের অংশ বিশেষ মাত্র। শেষাঙ্কের শেষ দৃশ্যের এখনও রিহার্শেও চলছে। যবনিকা উত্তোলনের পর কি দৃশ্য দেখা যাবে এবং হিন্দুদের ভাগ্যে আর কি ঘটবে, তা কেহ জানে না; কিন্তু সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। আরও অনেক 'রায়ট' হবে। বাস্তুত্যাগ বন্ধ হবে না। আরও অনেক হিন্দু পালিয়ে আসবে। অনেক হিন্দুই আধা মুসলিম আচার—আচরণ গ্রহণ করেছে। অন্যদের পাকিস্থানে থাকতে হলে আস্তে আস্তে মুসলিম জীবনযাত্রা প্রণালী ও সংস্কৃতি গ্রহণ না করে উপায় নেই। তাদের দুরাদৃষ্ট অভিশপ্ত জীবন ও মন্দ ভাগ্যের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতিও সাধ্যাতীত।

যারা দুই-বাংলা বা ভারত-পাক পুনর্মিলনে বিশ্বাসী ও তার স্বপ্ন দেখে তারা মূর্খের স্বর্গেই বাস করছে। ভারত-পাক কন্‌ফেডারেশনের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। আমাদের ভুললে চলবে না যে, বর্ত্তমান বিশ্ব-রাজনীতি সমস্যা সমাধানের নামে দেশ ও জাতিকে ভাঙ্গতে ও ভাগ করতেই জানে; কিন্তু ভাঙ্গা জাতি ও কাটা দেশকে জোড়া দিতে পারে না। দুই জার্ম্মানী, দুই কোরিয়া, দুই ভিয়েতনামের উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। আমাদের আরও মনে রাখা উচিত যে এক ভাষা, এক জাতি, এক ধর্ম্ম ও এক সংস্কৃতি হওয়া সত্ত্বেও ইজিপ্ট-সিরিয়া-ইয়েমেন নিয়ে গঠিত কন্‌ফেডারেশন সৃষ্টির দুই বছরের মধ্যেই ভেঙ্গে দিতে হয়েছে।

১৯০৫ সনে বাঙ্গালী হিন্দুরা সর্ব্বস্ব পণ করে বঙ্গ ভঙ্গ রদ করতে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বাধ্য হয়েছিল Settled fact-কে 'unsettled' করতে। চল্লিশ বছর যেতে না যেতে সেই বাঙালী বঙ্গভঙ্গের তিক্ত বটিকা সেবন করতে বাধ্য হয়েছে—নতশিরে হতমানে নিজ মৃত্যু দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছে।

পাকিস্থানে মুসলমানরা নিজ বাসভূমে নিজ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষানুসারে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ব্যস্ত। বিদেশী বা হিন্দু আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে তারা নতুন জাতি হিসেবে গড়ে উঠছে। তাদের শাসনপদ্ধতি এবং দেশোন্নয়নমূলক কর্ম্মযজ্ঞ আমাদের থেকে কোন অংশেই নিন্দনীয় নয়। আল্লাহ্ পাকের দোয়ায়, ইংরেজের দয়ায় এবং খোদার খুদরতে তারা যে হিন্দু কবলমুক্ত পাকিস্থান পেয়েছে, সেই হিন্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য তারা এগিয়ে

আসবে কোন দুঃখে? যদি হিন্দুরা পাকিস্থানে বাস করতে না পারে বা ভারতে চলে আসে তাতে তাদের কি? বরং ধনে-জনে পাকিস্থানের লাভ বই লোকসান নেই। সকল শ্রেণীর মুসলমানই হিন্দুদের মত সঙ্গতিসম্পন্ন ও শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত একটা জাতি কেন ধ্বংস হয়ে গেল এবং কেনই বা তারা নিজ জন্মভূমি ছেড়ে অর্দ্ধাসনে অনশনে বনে জঙ্গলে মরার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রে ছুটে চলেছে, সে সম্পর্কে একেবারে নিশ্চুপ। খবরের কাগজে তাদের কথা লেখে না। মুসলমান জনতা তাদের কথা ভাবে না। মুসলমান রাজনীতিক তাদের পক্ষে একটি কথা বলে না। কারণ, হিন্দুদের পক্ষ হয়ে কোন কথা বলে নিজ শিক্ষা, চাকুরী ও রাজনৈতিক জীবনে বিপদ ডেকে আনার মতো সৎসাহস তাদের নেই। হিন্দুদের হয়ে কথা বলা মুসলিম রাজনীতি-বিজ্ঞানের বিরোধী; হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কথা বলা শরিয়ৎ বিরোধী, ইসলাম বিরোধী তথা পাকিস্থান সৃষ্টির মূলমন্ত্র বিরোধী। মুসলিম লীগের শাসনকালে হিন্দুদের বিগত জীবন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। হক্-ভাসালী-সুরাবর্দ্দীর যুক্তফ্রন্টের আমলে তারা একটু আশার আলো দেখেছিল। কিন্তু বর্তমান মিলিটারী-মুসলিম লীগ-গুন্ডা মিশ্রিত শাসন ব্যবস্থায় তারা পাকিস্থানী শাসনের সবচেয়ে জঘন্য অধ্যায়ে বাস করছে। এই শাসনে পূর্ব্ববঙ্গের বহু মুসলমানেরই নাভিশ্বাস উঠেছে; সুতরাং হিন্দুদের অবস্থা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য নবযুগের শহরবাসী কিছু সংখ্যক মুসলমান যুবক ও ছাত্রশ্রেণীর মধ্যে ভারতের সঙ্গে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার এবং ভাষা ও আদর্শ বিনিময়ের আন্তরিক ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান পাকিস্তান সরকার ঐ জাতীয় কাজ অত্যন্ত কুনজরে দেখে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভাবগত মিলন ও সহযোগিতা তাদের নিকট মৃত্যুবাণের তুল্য। ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসের লাইব্রেরী ও পাঠাগার মুসলমান ছাত্রদের খুব প্রিয় ছিল। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পত্রপত্রিকা বই আমদানী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উপরও সরকারী আঘাত পড়েছে। এমতাবস্থায় যতদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বপাকিস্থানের নব্য যুবকশ্রেণীর হাতে দেশের শাযন ব্যবস্থা না আসে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীরা দেশের সর্ব্বক্ষেত্রে যে শিকড় গেড়ে বসেছে তা শিথিল না হয়, ততদিন দুই বঙ্গের মধ্যে সম্প্রীতি ও পাকিস্থানী হিন্দুদের অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতিও সুদূরপরাহত। পশ্চিম পাকিস্থানীদের কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে যে দৃঢ় নেতৃত্ব, দুর্জ্জয় মনোবল, অক্লান্ত সংগ্রাম এবং দরকার হলে রক্তাক্ত লড়াইয়ের প্রয়োজন তা দেবার মতো নেতা, দল ও যুবকশ্রেণী গড়ে উঠতে এখনো ঢের দেরী। বাঙ্গালী হিন্দু যুবকদের আত্মত্যাগ ও দেশের জন্য রক্তদানের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। বাঙালী মুসলমানরা সবেমাত্র সেই ব্রতে ব্রতী হয়েছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন উপলক্ষ্যে। তবে তাদের নিজদেশে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে দুর্জ্জয় লড়াইয়ের প্রয়োজন, তা এখনো সুরু হয়নি। তারা মুসলমান হলেও বাঙালী। সুতরাং পাঠান—পাঞ্জাবীর অধীনতাপাশ তাদের একদিন ছিন্ন করতেই হবে। সুতরাং সেই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দূর থেকে চেয়ে থাকাই সার। যারা আমাদের একান্ত আপনজন সেই হিন্দুদের মুস্কিল আসানের কোন পথই খোলা নেই। কোন অনাগত ভবিষ্যতে পরিত্যক্ত, নির্জ্জন, ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দুবাড়ী ও পল্লীগুলি পুনরায় আমোদ আহ্লাদে, আনন্দ কলরোলে ভরে উঠবে

এটা আশা করা শুধু মরীচিকাই নয়, আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। হিন্দুদের যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা লাঘবের মাত্র দুটি পথ খোলা আছে — (১) ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলেয় ও পূর্ব্ব পাকিস্থানের মধ্যে লোক বিনিয়ক, এবং (২) পাকিস্থান থেকে আগত প্রত্যেকটি হিন্দুর বদলা হিসেবে ছয়জন মুসলমানকে পাকিস্থানে পাঠান হবে বলে ধমক এবং তা কার্য্যে রূপদান। কিন্তু ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ভারত সরকারের নিকট এর কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারত সরকার হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণ সন্ধানের জন্য কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু কোন কমিশন বা সাক্ষ্য প্রমাণই হিন্দুদের দুর্দ্দশা লাঘবের কোন পথ নির্দ্দেশ করতে পারবে না। তারা এতপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে যে, তা থেকে তাদের মুক্ত করা স্বয়ং ভগবানেরও অসাধ্য—ভারত সরকার তো কোন ছার! তারা ভারতীয় নেতাদের দেউলিয়া রাজনীতি, মূর্খামি ও গদি লোভের শিকার হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও শাসন সম্পর্কে নেতাদের যদি তিলমাত্র জ্ঞান থাকত, তবে তারা হিন্দুদের এমন অসহায়ভাবে নেকড়ের কবলে ফেলে দিতেন না। আমেরিকা, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক লুপ্ত জাতির মতোই হিন্দুরা আজ সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মীয় দিক দিয়ে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির প্রতিভূস্বরূপ টিকে আছে। তাদের তুলনায় প্যালেষ্টাইনের ও জার্ম্মানীর রিফিউজীদের অবস্থা তো স্বর্গতুল্য।

কোন ব্যক্তির গৃহে আগুন দিয়ে তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে তার গৃহত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করা শুধু হাস্যাস্পদই নয়, চরম নিষ্ঠুরতাও বটে। "বাস্তুত্যাগের কারণ নির্দ্ধারণ" কমিশন গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারতো বন্ধুহীন এই পৃথিবীতে সমস্ত বিশ্ববাসীর সামনে মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়কে তুলে ধরা। পাকিস্থানী বর্ব্বরতার ঢাকনা খুলে তার বীভৎস নগ্ন রূপ বিশ্বের জনগনের দৃষ্টিপথে আনয়ন করা। কিন্তু পাক-প্রেমান্ধ, দুর্ব্বলচিত্ত ও অতি-উদার-ভারত সরকারের, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে রচিত উক্ত কমিশনের রিপোর্টটুকু প্রকাশ করার মতো হিম্মৎ এবং সৎসাহসও নেই। তারা কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেপে গেছেন—অজুহাত, ভারত-পাক সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী। ভারত সরকারের পাক প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার দিন দিন আরো শ্রীবৃদ্ধিশালী হউক—পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা খোদাতালার কাছে এই মোনাজাতই করে!

পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানরা বিনা রক্তপাতে (অবশ্য হিন্দুর রক্তপাত করে) অতি সহজে আজাদী পেয়েছে; হিন্দুদের তথাকথিত অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানীদের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া যে মোটেই তেমন সহজসাধ্য নয়, তা বোধ হয় তারা এতদিনে বুঝতে পেরেছে। জাত-ভাইয়ের কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে যে কি পরিমাণ রক্ত দিতে হবে এবং নিতে হবে সে সম্পর্কে এখনো তাদের তেমন সম্যক চেতনা হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান মন্ত্রীর গদির লোভে সুরাবর্দ্দী তাদের যে সমান প্রতিনিধিত্বের নিগড়ে বেঁধে গেছেন, আজ তারা সে জোয়ালের চাপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছে। সেই জোয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা এবং আঞ্চলিক সার্ব্বভৌমত্ব আদায় করা যে হিন্দু বিতাড়নের মতো সহজসাধ্য নয়, তাও তারা মনে প্রাণে বুঝেছে। সে সংগ্রাম সুরু হতে এখনো দেরী—তবে কিছুটা জাগরণ সুরু হয়েছে বটে।

এ দেশের পত্র-পত্রিকার পাকিস্থান সম্পর্কীয় আলোচনার বিষয়বস্তুই হলো সে দেশের অতীত রাজনৈতিক পাশাখেলার জাবর কাটা অথবা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের জল্পনা-কল্পনা, গতিপ্রকৃতি এবং রাজনীতির গোলকধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামানো। তাতে যে আমাদের কোনই ফায়দা নেই, বিগত কুড়ি বৎসরের নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর আমাদের সে জ্ঞান হওয়া উচিত। আমাদের সকল চিন্তা, আলোচনা ও কর্ত্তব্যের বিষয় যে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে জড়িত হওয়া উচিত, সে চেতনা এখনো আমাদের মধ্যে আসে নি। সেই জন্যই এত কথার অবতারণা।

তথ্যসূত্র ও স্বীকৃতি ঃ

উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে হলে যেসব গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

1946 : The Great Calcutta Killings and Noakhali Genocide – Dinesh Chandra Sinha and Ashoke Dasgupta.

History of Riots in India - Prof. Suranjan Das

দাঙ্গার ইতিহাস — শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

হস্তান্তর — শংকর ঘোষ

নোয়াখালি! নোয়াখালি — শান্তনু সিংহ

ভারত বিভাগ : ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ — সুকুমার সেন

দেশভাগের ইতিহাস : একটি বিনির্মাণ প্রয়াস — অসিত রায়

নোয়াখালীর ইতিকথা — নলিনীরঞ্জন মিত্র

নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে — অশোকা গুপ্ত

নোয়াখালিতে মহাত্মা — সুকুমার রায়

দূরদর্শী রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ — শ্যামলেশ দাস

পাক-ভারতের রূপরেখা — প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

Minorities in Pakistan – P. C. Lahiri

দেশবিভাগ : সংশোধিত ইতিহাসের রায় — অসীম রায়

দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশভাগ দেশত্যাগ— সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কেন পদত্যাগ করেছিলেন?—দেবজ্যোতি রায়

Who is Responsible?—S.P Mookerjee (on Calcutta Riot)

Article of P.S. Mathur on Calcutta Riot in the Illustrated Weekly of India

বঙ্গসংহার এবং সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

দেশবিভাগ : পশ্চাৎ ও নেপথ্যকাহিনী-ভবানী চট্টোপাধ্যায়

দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালী—বিনয় ভূষণ ঘোষ

Tragic story of Partition—H.V. Seshadri

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য : তথ্য ও দলিল

ভারত বিভাজন—যোগেন্দ্রনাথ ও আম্বেদকর—বিপদভঞ্জন বিশ্বাস

Communalism in Bengal—Rakesh Batabyal (From Famine to Noakhali)

ভারত কেন ভাগ হল?—শ্যামলেশ দাস

প্রান্তিক মানব—প্রফুল্ল চক্রবর্তী

নোয়াখালির মাটি ও মানুষ—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ

সাতচল্লিশের ডায়েরী—নির্মলকুমার বসু

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঃ ১৮৮৫-১৯৪৭—অমলেশ ত্রিপাঠী

Dr. S. P Mookherjee's speech in Parliament after resigning from Nehru

Cabinet on East Pakistan issue.
Report of an unofficial Enqury Comittee on 1964 riot in East Pakistan
Five Decades of Ongoing Ethnic Eleansing—CAAMB
Booklet on Migration of Hindus after 1950 riot
Transfer of Power—all volumes.
Picture Album of Gandhi's Noakhali Tour
শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ
সরওয়ারের তরোয়ার — নীলগ্রীব সিংহ
The Price of Partition—Rafiq Zakaria.
আম জানতার দরবারে—শম্ভু ব্যানার্জী
For the Posterity – Sambhu Banerjee
জনগণের সঙ্গে—জ্যোতি বসু
জয়শ্রী : সম্পাদক—বিজয় কুমার নাগ
My Days with Gandhi in Noakhali—Prof. Nirmal Kumar Basu
Mahatma Gandhi : The Last Phase—Pyarelal
My People Uprooted—Prof. Tathagata Roy
Partition Bengal and After:
the Great Tragedy of India—Kaliprasad Mukhopadhyay
Non-Muslims Behind the Curtain of East Pakistan – Prof. Samar Guha

---